* * *

প্রকাশক :
পরেশ চক্রবর্তী
১২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মুদ্রক :
শ্রীপ্রফুল্লকুমার বস্থ
নিউ প্রিণ্টার্স
২০৯-সি, বিধান সরণী,
কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ :
১৬ই জুন, ১৯৫৫

দাম : চার টাকা

পূজনীয়া

বড়দিদিকে—

MALIKA BEGUM

By

Biswa Bandhu Sanyal

Price : 4·00

উত্তরবাহিনী গঙ্গার শ্রান্তধারা এসে আঘাত খায় তার উত্তর-পশ্চিম কোণে। পাক খেয়ে কলকলিয়ে ওঠে। কখন কাছে সবে আসে, কখনও বা পাক খেতে খেতে দূরে সরে যায় নিম্নকণ্ঠের এক কুলু কুলু শব্দ তুলে। ফিসফিসিয়ে কি যেন বলে কালজয়ী দুর্গটির কানে কানে। তারপর আবার উত্তরবাহিনী হয়। দুঃখের রাজ্য ছেড়ে বিশ্বনাথের পায়ের কাছে গিয়ে দিল খোলসা করতে।

যুগাতীত কাল ধরে এই একই রূপে চলেছে গঙ্গা। না কি তার বুকে মুখ লুকিয়ে যুগের পর যুগ ধরে কখন সাপিনীর মত ফুঁসে উঠছে আবার কখনও বা অভিমানিনী আশকীর মত কেঁদে চলেছে কেউ?

আর ঐ যে বিরাটবপু দুর্গ, কালের ইশাদী হয়ে পড়ে রয়েছে তার স্বভাব-সুলভ নির্লিপ্তভাব নিয়ে, তার প্রস্তরে প্রস্তরেও কি গঙ্গা-কথিত এ কাহিনীরই অদৃশ্য লেখা? কিসের কথা, কার কথা আলোচনা করে ঐ সলিল আর সলিল-নিমজ্জিত প্রস্তরখণ্ডগুলি?

একটাত' নয়, ঘটনাবহুল যে ঐ দুর্গের জীবন। ব্যথার ভেতর দিয়ে জন্ম। তারপর থেকে শুধু ব্যথাই পেয়ে এসেছে সে। নেই কোন অধিকার বোধ। ক্রীতদাসের মত হাত ফেরতা হয়ে এসেছে। বলবার কিছু নেই। মালিকের মর্জিই সব। খেয়ালে বা ক্ষমতায় রাখা। না রাখতে পারলেই হস্তান্তর।

সেই হস্তান্তরের সম্বৎসরগুলি পাওয়া যায়। কিন্তু তার অন্দরের কথা? অন্দরতো পাষাণ-প্রাকারের আড়ালে ঢাকা। সে আড়াল যখন ছিল না? যখন ছিল চুণাব নামে কেবল একটি নাতিবৃহৎ

পাহাড় অথবা বৃহদাকার টিলা? সে সময়ের কাহিনীটিও লোকের মুখে মুখে ফেরা এক জনশ্রুতি—

বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ ভর্তৃহরি তখন উজ্জয়িনীর রাজা। ঘরে বাইরে তাঁর শান্তি। যেমন পেয়েছেন প্রজাদের শ্রদ্ধা তেমনি পেয়েছেন পত্নীর প্রেম। সেই সময়েই একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়ালেন রাজসভায়। প্রণাম জানালেন রাজা। আর আশীর্বাদ হিসাবে ব্রাহ্মণ তাঁকে দিলেন একটি দুষ্প্রাপ্য ফল। এমন দুষ্প্রাপ্য জিনিষ পত্নীকে না দিয়ে থাকতে পারেন না রাজা। অংশ না দিলে আনন্দকে যে পুরোপুরি উপভোগ করা যায় না। কিন্তু সে অমৃতও গরলে পরিণত হতে বিশেষ দেরি হয় না। পরদিনই ব্রাহ্মণদত্ত সেই ফল দেখতে পান ভর্তৃহরি অপর একজনের হাতে এবং এও আবিষ্কার করেন যে সেই মানুষটিই হচ্ছে রাণীর গুপ্ত প্রণয়ী। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন বদলে যায় রাজার চোখে। অবিশ্বাস আর জঘন্যতায় ভরা রাজপ্রাসাদে বাস করাও কঠিন হয়ে পড়ে তাঁর পক্ষে। এবং সে কথা তিনি লিখেও যান তাঁর 'সুভাষীতা' কাব্যে। তারপরই গৃহত্যাগ করেন তিনি।

দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর গড়িয়ে চলে। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তখন রাজতক্তে সমাসীন। এমন সময় খবর পাওয়া যায় বিন্ধ্যাচলের পূর্বে চুণার পাহাড়ে আছেন ভর্তৃহরি। সন্ন্যাসীর বেশধারী, মৌনী। তবে আপন দেহখানির ওপরে তাঁর যত আক্রোশ। এমনি কি পাহাড়ের অঙ্গ কেটে যে মন্দিরটি ক'রেছেন তাতেও হাত দিতে দেননি কাউকে। কাজ করতে করতে কতদিন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন, গ্রামের মানুষ এসে সেবা শুশ্রূষা করে ভাল করে তুলেছে। জ্ঞান হতেই লাফিয়ে উঠে বসেছেন, আমার এ উপকারটি কে তোমাদের করতে বলেছিল? আবার ভালও বাসেন। তাদের দুঃখকষ্ট নিজের বলেই মনে করেন। ছুটে গিয়ে

দাঁড়ান যদি কিছুটা তার লাঘব করা যায়।

শুনতে শুনতে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান বিক্রমাদিত্য। এখুনি যাবেন তিনি। নিয়ে আসবেন তাঁর অগ্রজকে। আবার বসাবেন তাঁকে তাঁর পরিত্যক্ত সিংহাসনে।

তবুও দেরি হ'য়ে গেল। গিয়ে পৌছুলেন যখন বিক্রমাদিত্য তখন অত্যাচারে অত্যাচারে নিজেকে শেষ করে এনেছেন ভর্তৃহরি। উত্থানশক্তি রহিত। শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার পূর্বে কেবলমাত্র একটি কথাই বলতে পারেন তিনি অনুজকে, "এই মন্দিরের সোজা গঙ্গার পশ্চিম পারে আমাকে দাহ করো।"

তাই করেন বিক্রমাদিত্য। এবং সেইদিন থেকে চুণার বা তার পার্শ্ববর্ত্তী কোনও গ্রামের মৃতদেহ গঙ্গার পূর্বপারে দাহ হয় না। অলিখিত এ আইনকে শতাব্দীর পর শতাব্দী মেনে চলেছে সেখানকার মানুষ।

অগ্রজের শেষকৃত্য সমাপনান্তেও কিন্তু চলে যান না বিক্রমাদিত্য। চুণার পাহাড় তাঁকে টেনেছে। তার ভৌগলিক অবস্থানটিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন তিনি। আর আছে সন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে পাটা-পাথরের পাহাড়। অতএব দুর্গ নির্মাণ কষ্টসাধ্য হবে না। আদেশ হয়ে গেল মহারাজার। এল কারিগর, শ্রমিক, মিস্ত্রী। জেগে উঠল সমস্ত চুণার গ্রাম।

অবশেষে একদিন শেষ হল সেই দুর্গ নির্মাণ। খৃষ্টপূর্ব ৫৬ অব্দে।

ত্রিভুজাকৃতি বলা যায় দুর্গটিকে, ডিম্বাকৃতিও বলা যায় কিম্বা আরও ভালভাবে বলা যায় একটি বিরাটাকৃতি প্রদীপ। দক্ষিণের শেষাংশে এসে এক 'কোণ'এর সৃষ্টি করেছে। অন্তিম উত্তরে পূর্বমুখী দুর্গদ্বার। ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে। সেই ঢালু পথের মাঝামাঝি হাতী বাঁধবার পাথরের খিলান। দুর্গের উত্তর দিকে দুর্গাধিপের

ঢুটি মহল। পশ্চিমদিকে ভূগর্ভস্থ মালখানা আর তার পাশেই তহশীলখানা। পূর্ব আর দক্ষিণ দিক ঘিরে সিপাহ্ মহল। তার পাশেই একটি সাধারণ কয়েদখানা।

চুণারগড়ের সৃষ্টির এই কিম্বদন্তীর পরেই এক অন্ধকারের আড়াল। পূর্ণ ইতিহাস তার কেউ দেয় না। দেয় শুধু মালিকানার শতাব্দীগুলি। পৃথ্বীরাজ রায় পিথোরা, সাহেবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী, স্বামী রাজা।

তারপরে একটি কালের ঝাঁপ। কেটে গেল কত শতাব্দী।

এরপর জৌনপুরের মহম্মদ শা এই দুর্গের অধিপতি হলেন ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে। এর পরই আবার এক অন্ধকাবের পর্দা। সেই পর্দা ছিন্ন করে সুলতান ইব্রাহিম লোদী তাঁর ধনদৌলতের জিম্মাদার করে পাঠালেন তাজ খাঁকে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আবার স্থান পেল চুণারগড়। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সে সৃষ্টি করতে লাগল তাব নিজস্ব ইতিহাস। যে ব্যথার কাহিনী আজও গঙ্গা ফিস ফিস করে আলোচনা করে দুর্গপ্রস্তরের কানে কানে। আশকী বেগমেব কাহিনী। সে যে সকলকে শুনিয়ে বলবার নয়।

সোজা মানুষ চলা পথে তার আসেনি। এসেছে ভালুকমারীব শ্বাপদ-সঙ্কুল এলাকার ভেতর দিয়ে বিন্ধ্যাচল পর্বত ডিঙিয়ে। লোকালয়কে এড়িয়ে এড়িয়ে। কিন্তু মির্জাপুরের কাছে এসেই মুশকিলে পড়ে যায় তারা। এত মানুষের বাস যেখানে সেখানে গা ঢেকে চলা খুবই মুশকিল। অতএব পরামর্শ সভায় বসে তারা। বয়ঃজ্যেষ্ঠ মীর আহ্মদ তাকায় মেয়েটির দিকে। চোখ ঝলসান রূপ। যে কোন পুরুষ মাথায় করে রাখবে ওকে। তাইত' আরও ভয়। ভাগ্যের ভাঁড়ত' তাদের খালি। সম্বল বলতে আছে কেবল এই

রূপসী ছোট বোনটি। এই হাতের গুটি ছেড়ে দিলে ভিখ্ মাঙা ছাড়া আর কোন রাস্তাই তাদের থাকবে না। বোনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে ওঠে মীর আহ্মদ, "চল্, ঐ পাহাড়ের ধার ঘেঁষে যাই।" দূরের পর্বতমালা দেখায় সে।

"কিন্তু তার আগে কিছু নাস্তার ব্যবস্থা করনা ভাইসাহেব," বলে ওঠে মেয়েটি, "পেটে দানা না পড়লে আর এক পাও চলতে পারব না।"

অতএব উঠতেই হয় মীর আহ্মদকে। কিন্তু কয়েক পাও যেতে হয় না তাকে। চম্‌কে দাঁড়িয়ে যায়। শক্ত মুঠিতে চেপে ধরেছে তার তরোয়ালটি। ওর ঐ দাঁড়িয়ে যাওয়া দেখে উঠে দাঁড়ায় অপর তিনজনও। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। দেখে কয়জন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তারা বোনটিকে মাঝখানে রেখে। অপেক্ষা করতে থাকে চরম মোকাবিলার।

ক্রমে এগিয়ে আসতে আসতে একসময় সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায় ঘোড়া কয়টি। ঘোড়সওয়ার ও পথিক, উভয় পক্ষই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর অশ্বারোহীদের ভেতর থেকে একজন এগিয়ে এসে পরিচয় দেয় তাদের। চুণার দুর্গের মালিক তাজ খাঁ, মালিকের জ্যেষ্ঠপুত্র দবীর খাঁ আর সেনাপতি আব্বাস খাঁ। পরিচয় দেওয়া শেষ করে জিজ্ঞাসা করে লোকটি, "তোমরা কারা?"

এতক্ষণ ধরে তাজ খাঁকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল মীর আহ্মদ। জোয়ার যাবার সময় দাগ রেখে যায় তার কূলে কূলে। কিন্তু কৈ, যৌবনের জোয়ার যাওয়ার দাগতো পাওয়া যায় না দুর্গ-মালিকের চেহারায়। শক্ত, সিকিম দেহে এখনও শক্তির প্রকাশ। মনে মনে খুশিই হয় সে। যথাদস্তুর কুর্ণিশ করে বলে, "হুজুর, আমরা

সুদূর মর্দিন সহর থেকে আসছি। আমার নাম মীর আহ্‌মদ। এরা আমার ভাই, ইশাক আর মীর দাদ। আর এই আমার বোন লড মালিকা।"

কথা শেষ করে মালিকার দিকে তাকায় মীর আহ্‌মদ। দেখে স্থির দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে দবীরের দিকে। আশার যে আলোটা জ্বলে উঠেছিল মনের কোনায় সেটা বুঝি নিভে যেতে চায় নৈরাশ্যের বায়ুহীন আবদ্ধতায়। দবীর খাঁ নওজোয়ান, খুব-সুরৎ। কিন্তু তার চেহারায় সে মরদভাব কোথায়? চোখের তারায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সে জিদ কোথায়? সমস্ত অন্তর যেন ঢুক্‌রে ওঠে মীর আহ্‌মদের—না, না, ও কিছুতেই এই তুর্কী কন্যাকে বশে রাখতে পারবে না। সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিয়ে ওঠে সে, "এই বেওকুফ, হুজুরকে তসলীম্ জানালি না?"

সচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি তাজ খাঁকে সালাম জানায় মালিকা।

মেঘের ছায়াটা এসে পড়েছিল বুঝি তাজ খাঁর মুখের ওপরে। সরে যায় সেটা। হাসি ফুটে ওঠে তার চোখে মুখে। আশান্বিত হ'য়ে ওঠে আহ্‌মদ। প্রার্থনা করবার মত ক'রে হাতদুটি পেতে বলে, "হুজুর মালিক, যদি অনুমতি করেন তাহ'লে চুণার দুর্গে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি।"

"দুর্গ এখান থেকে অনেক দূর," বেশ হাসি হাসি মুখেই বলে তাজ খাঁ, "তোমরা হয়ত' যেতে পারবে কিন্তু তোমাদের এই বহিন্‌তো যেতে পারবে না। তাছাড়া মির্জাপুরের পরে যে জঙ্গলটি আছে, সেটি বড় খারাপ জায়গা।" কথা শেষ করে পশ্চাতে অপেক্ষমান একজন দেহরক্ষীকে ডাক দেয় তাজ খাঁ, হুকুম করে, "মির্জাপুরের তহশীলদার মনসুরের কাছে যা, তাকে বল্ এখুনি একটা—" বলেই হঠাৎ থেমে যায় হুকুমদাতা। কয়েকটা মুহূর্ত্ত। তারপর আহ্‌মদের দিকে তাকিয়ে বলে, "বহুদূর থেকে এসেছ তোমরা। বিশ্রামের

প্রয়োজন আগে। চল, তোমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়ে যাই। তারপর সুবিধামত একদিন গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা কর।”

কথা শেষ করেই অশ্বের মুখ ঘোরায় তাজ খাঁ। সঙ্গে সঙ্গীরাও। ডুল্‌কি চালে এগুতে থাকে চতুষ্পদ কয়টি। তাদের অনুসরণ করে আহ্‌মদরা তিন ভাই আর মালিকা।

মির্জা মনসুরের গৃহে দিন সাতেক ছিল মালিকা। তারপরই তাজ খাঁর গৃহে নূতন বেগম হ'য়ে এসে উঠল সে। সঙ্গে এল তার তিন ভাই। তাজ খাঁর নবনিযুক্ত সহ-সৈনাধ্যক্ষ।

যেখান থেকেই আসুক আর যেভাবেই আসুক, মালিকা ফেলে আসেনি তার নারী-মনকে। দুর্গ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারে যে এখানে সে অনাকাঙ্ক্ষিত। সুদূর যাত্রাপথে যে লড়াই তাকে করতে হয়েছে তা কিছুই নয়। প্রকৃত লড়াই তার সবে সুরু হ'ল। তবুও কেমন ভাল লাগে তার। জীবনে প্রথম ভাললাগা মানুষটিও যে এই দুর্গেরই বাসীন্দা। অবসর সময়ে, বিশেষ ক'রে বৃদ্ধা বাঁদী নাসীনা যখন থাকে না, তখন জাফরির আড়ালে গিয়ে বসে। দিদৃক্ষু দুটি চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে দুর্গের সদর অংশের দিকে।

সেদিনও তেমনি বসেছিল মালিকা। ভিজে চুল শুকায়নি বলে এলিয়ে রেখেছে পিঠের ওপরে। আর তাতে লজ্জারও কিছু নেই। কেননা এদিকে পুরুষ কেউ আসে না। দবীর, তার মা আর ছোট ভাই নকীব থাকে যে অংশে তার সঙ্গে মালিকার অংশের যোজক পথ একটি মাত্র দরজা। কিন্তু সেটা বন্ধই থাকে সব সময়। তাই নিশ্চিন্ত মনেই বসেছিল সে। এমন সময় দেখে মীর দাদের সঙ্গে উত্তেজিত ভাবে কিসব কথাবার্তা বলতে বলতে এসে দাঁড়াল দবীর। চোখ মুখের ভাব দেখে মনে হয় মীর দাদের কথায় বিশেষ

অসন্তুষ্ট হয়েছে সে। একমুহূর্ত্তে শরীরের এলায়িত ভাবটি কোথায় উবে যায় মালিকার। দৃষ্টি হয়ে ওঠে তীক্ষ্ণ। একটু ভয়ও হয় তার। মীর দাদ বড় একটুতেই রেগে ওঠে। ওরকম রাগী স্বভাব হলে পরের দরবারে কাজ করা চলে না। কিন্তু সে ভাবনা পরে করলেও চলবে। বর্তমানে ওদের তকরার কি বিষয়ে সেটাই আগে জানা দরকার। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় সে। নাসীনাকে ডাকতে থাকে। ঠিক সেই সময়ে দ্রুতপায়ে এসে অন্দরে প্রবেশ করে দবীর। প্রবেশ করেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে যায়। পায়ের শব্দ পেয়ে মালিকাও ফিরে দাঁড়িয়েছে। একখানা দোপাট্টাও নেই হাতের কাছে যে মাথার ওপরে টেনে দেবে। নিজের এই বিপর্যস্ত অবস্থায় নিজেকে কেমন একটু অসহায় বোধ করে সে। তেমনি আবার ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসির রেখাও দেখা যায় তার। দবীর যে এত লাজুক, তা তার জানা ছিল না। এসে ইস্তক সেই যে মাটির দিকে চোখ নামিয়েছে, একবারও সে দুটি তুলে তাকাল না তার দিকে। কথাত' বলবে না নিশ্চয়ই। অতএব তাকেই মুখ খুলতে হয় প্রথমে। কিন্তু কণ্ঠস্বরে সে তুর্কী তেজ নেই, নেই মালিকানা ভাব। ফিসফিসানি গলায় জিজ্ঞাসা করে, "কিসের এত তকরার হচ্ছিল তোমাদের ?"

"আব্বাজান কোথায় ?" প্রতিজিজ্ঞাসা করে দবীর।

"আমার জিজ্ঞাসার কিন্তু উত্তর পেলাম না।"

"বলবার মত কিছু নয়। বিশেষ কিছু হলে জানতেই পারবেন। আব্বাজান কি মহলে বেরিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"ও," বলে মাথা নীচু করেই বেরিয়ে যেতে থাকে দবীর।

"শোন।" পিছন থেকে ডাক দেয় মালিকা।

ডাক শুনে কেবলমাত্র দাঁড়িয়ে যায় দবীর। ফিরে তাকায় না

হুকুমদাত্রীর দিকে। মালিকাকেই দু'পা এগিয়ে যেতে হয়।

"মীর দাদ বড় রাগী আর একবগ্গা। ওকে একটু সাবধানে নিয়ে চলো।"

"একজনের খেয়ালে সমূলে ধ্বংস হওয়াটা কোন কাজের কথা নয়।"

"কেন, কি হয়েছে?"

"আর অধিকক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা শোভন হবে না। আমি চলি।"

এরপর মালিকাকে 'দাঁড়াও' বলবার সুযোগটুকুও দেয় না দবীর। আর মাথায় একরাশ চিন্তার বোঝা নিয়ে কাষ্ঠপুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে থাকে মালিকা।

তাজ খাঁ এসে বিশ্রামকক্ষে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে মালিকাও এসে প্রবেশ করে। আলবোলাটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে ফুঁ দিয়ে আগুনটা ভাল ভাবে জ্বালিয়ে দেয়। তারপর মালিকের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে। তাজ খাঁও হাসে।

"কি ব্যাপার? দু'এক টান খাবে নাকি?" রহস্য করে তাজ খাঁ।

"খাব। যখন চুলগুলো সব রুইএর মত সাদা হয়ে যাবে, তখন ঐ দরিয়ার দিকে মুখ করে বসে বসে আলবোলা টানব। আজ কতদূর গিয়েছিলেন?"

"যাইনিত' কোথাও। সমস্ত চুণার একবার ঘুরে দেখে এলাম। কেন?"

"কারণ নেই কিছু। অনেকক্ষণ আপনি দুর্গে ছিলেন না, তাই জিজ্ঞাসা করছি। আমার ভাইরা কিরকম কাজ করছে?"

"মীর আহমদ শুধু সাহসী নয়, সুচতুরও বটে। ইশাককে বুঝতে পারিনি এখনও। মীর দাদ চাপ দিচ্ছে সৈন্য আরও বাড়াতে হবে। কিন্তু মুশকিল কি জান?" বলেই চুপ করে যায় তাজ খাঁ। চোখ পড়ে দরজার দিকে। নাসীনা এসে দাঁড়িয়েছে। তার দিকে তাকাতেই সে সেলাম করে বলে, "বেগমসাহেবা আপনাকে সেলাম জানিয়েছেন।"

"কেন?" ঈষৎ বিরক্তির সুরেই জিজ্ঞাসা করে তাজ খাঁ।

"সে কথা বলেননি হুজুর।"

"আচ্ছা যাব, যাও।"

নাসীনা সরে যায় কিন্তু চলে যায় না। তাজ খাঁর নির্গমনের অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু সে রকম কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না দুর্গাধিপের ব্যবহারে। মালিকার একখানি হাত নিয়ে নিজের শ্মশ্রুমণ্ডিত গণ্ডদেশের ওপরে বুলিয়ে দিতে দিতে পূর্বকথার সূত্র ধরে বলে, "মুশকিল হয়েছে এই যে বাবর ইব্রাহিম লোদী নয়। ইব্রাহিম লোদী বিশ্বাস যাকে করতেন তাকে পরিপূর্ণ ভাবেই বিশ্বাস করতেন। কিন্তু বাবরের বিশ্বাসের সঙ্গে হিসাব মিশিয়ে আছে। তাঁর কাছে প্রতিটি জায়গীরদার, সুবেদার, রাজা বা নবাবের সৈন্যের হিসাব রয়েছে। এই সৈন্য-সংখ্যা বাড়াতে বা কমাতে গেলে বাদশাহের অনুমতি নিতে হবে।"

"উনি জানবেন কি করে?"

"গোপন খবর দেবার লোকেরই যদি অভাব ঘটল তা'হলে আর রাজ্য পরিচালনা করতে হয়না কাউকে। যাই, দেখি উনি কি জন্যে সেলাম জানিয়েছেন," বলে উঠতে গিয়ে দু'হাতে এই নবীনা বেগমকে জড়িয়ে ধরে তাজ খাঁ। নিজের মুখখানি চেপে ধরে মালিকার মসৃণ গণ্ডে। তার প্রতিটি নিশ্বাসে আসঙ্গলিপ্সার উত্তেজনা অনুভব করে মালিকা। কিন্তু নিজের ভেতরে খুঁজে পায়না

কোন জৈব প্রেরণা। মাদকতাহীন এক কর্তব্য সম্পাদন শুধু করে চলেছে সে দিনের পর দিন। মালিককে খুশি রাখবার জন্যে যে ভাবে কাজ করে যায় এক ক্ষুদ্র মোলাজিম।

"আপনি যে কি করেন!" একরকম ঠেলেই তাজ খাঁকে সরিয়ে দেয় মালিকা, "নাসীনা বাইরে অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে।"

"ওটাকে ও তরফে সরিয়ে দেব," বলে উঠে দাঁড়ায় তাজ খাঁ। চোখে মুখে তখনও তার কামোত্তেজনা। বাধা পাওয়ায় কিঞ্চিৎ বিরক্তও বটে। বলে ওঠে, "ওদের কি প্রয়োজন হয়, না হয়, তুমিই দেখবে এবার থেকে। আমি ওদের বলে দেব তোমাকেই সব প্রয়োজনের কথা জানাতে।"

"আর যদি জনাবকেই প্রয়োজন হয়?" কথাটা বলেই ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে মালিকা।

যাওয়ার ছন্দে পা বাড়িয়েও থেমে যায় তাজ খাঁ। কথা নয়, কামনার আগুনটাকে আরও উস্কে দিল যেন। মুখ ফিরিয়ে একবার দেখে সে। তারপরই সাঁ ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়ে দু'হাতে তুলে নেয় তার মানবীকে। আদিম রিপুতাড়িত এক ক্ষিপ্ত পশু যেন।

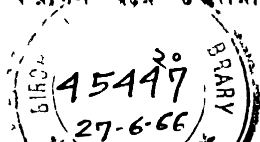
"উঁহু, তা হবেনা," ছটফটিয়ে ওঠে মালিকা, "জনাব কথা দিয়েছেন, আগে বখসিস দেবেন।"

হো হো ক'রে হেসে ওঠে তাজ খাঁ। বলে, "বেশ, কথা দিচ্ছি সোনার পৈছা দেব। বেগম এবার খুশ্ নিশ্চয়ই?"

দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে সবই শোনে নাসীনা, সবই বোঝে। তারপর দ্রুত অথচ নিঃশব্দ পায়ে সরে যায় সেখান থেকে।

ঘরে বসে থাকা অভ্যাস নয় দবীরের। প্রয়োজনের কারণে শুধু একবার করে ঘরে আসা। প্রয়োজন মিটলেই আবার বেরিয়ে

পড়ে তুর্গের বাইরে। সারবন্দী একটানা ছোট ছোট ঘর। মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা। সৈন্যদের আবাস-স্থল। তারই একধারে এক-ফালি ফাঁকা জায়গা। বাজার। বাজারের কিছু পূবে পৃথক একটি বাড়ী। বাড়ীটির সর্বাঙ্গে অবস্থার স্বচ্ছলতার প্রকাশ। সৈনাধ্যক্ষ আব্বাসের গৃহ। তুর্গ ছেড়ে সোজা এইখানেই এসে উপস্থিত হয় দবীর। এমনি নয়। বিশেষ আকর্ষণ কিছু আছে। আব্বাসের অনূঢ়া কন্যা আমিনা। এই তনুজাটিকে নিয়েই যত চিন্তা আব্বাসের। দামাদ হিসাবে দবীর সত্যই লোভনীয়। কিন্তু কন্যা তার মালিকা বেগমের মত রূপবতী নয় যে সেনাপতির ঘর থেকে তুর্গমালিকের ঘরে গিয়ে উঠবে। সে কথা বড় একটা ভাবে না দবীর। শুধু রূপই কি স্নিগ্ধ হয়, অন্তঃকরণ হয় না? বরঞ্চ বড় ঘরে রূপ নিয়ে বহু গোলমাল। তার চাইতে সাদামাটা বৌ থাকলে কারও নজরে পড়বার সম্ভাবনা থাকে না। তাই অবসব মুহূর্ত্তে সে ছুটে আসে এইখানে। সেদিনও আসছিল তাই। সৈন্যদের ছাউনির ভেতর দিয়ে। চিরদিনের অভ্যাস মত গৃহবাসীদের কুশল সংবাদ নিতে নিতে। এমন সময় কিসের একটা গোলমালের শব্দ কানে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে যায় সে। তারপরই একটা ঘরের পাশের সরু একফালি জমির ওপর দিয়ে গিয়ে পড়ে ওধারের রাস্তায়। দেখে বেশ ভিড় জমে গিয়েছে একটা ঘরের সামনে। সেই ভিড়ের ভেতরে তুর্কী বীব মীর দাদ বিশেষ আস্ফালনের সঙ্গে কাকে যেন শাস্তি দিচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ডুকরে কেঁদে উঠছে কে সামনের ঘরটির ভেতরে। দ্রুতপায়ে এগিয়ে যায় দবীর। গিয়ে দাঁড়ায় ভিড়ের একধারে। পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে। লোকটির দৃষ্টি সামনের দিকে নিবদ্ধ। দবীরের দিকে মুখ না ফিরিয়ে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই উত্তর দেয়, "কি আবার হবে? বড়া আদ্‌মির জুলুম। লোকটা কয়দিন ধরে ব্যেমারীতে পড়ে ছিল। আজ



বাজারে গিয়েছিল একটু গোস্ত মোলতে। এমন সময় ঐ ছোটে নবাব চেপে ধরে ওর সামান কোঠিতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। লোকটা বে-তাগদ্ হয়ে পড়ায় হাঁত জোড়ায়। এই গোস্তাকির জন্যে লোকটাকে ধরে নিয়েএসে ওর জরুর সামনে পিটছে নবাব সাহেব।"

এই কাহিনীটুকু শোনবার জন্যেই যেন নিজেকে কোন রকমে ধরে রেখেছিল দবীর। তারপরই ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত লাফিয়ে গিয়ে পড়ে মীর দাদের সামনে।

"মালজান নিয়ে এখান থেকে চলে গেলেই তোমার পক্ষে ভাল হবে মীর দাদ মিঞা। সিপাহ্‌দের ক্ষেপিয়ে দিয়ে নিজের জান নিয়ে পালাতে পারবে না শেষে।"

"সেটা আপনাকে দেখতে হবে না ছোট জনাব। সিপাহ্‌রা আমার অধীনে, আপনার অধীনে নয়।" স্পষ্ট বিদ্রূপের সঙ্গেই বলে ওঠে মীর দাদ।

তার কথাগুলি যেন আগুন ছিটিয়ে দেয় দবীরের সর্বাঙ্গে। সিপাহের সামনে এভাবে অপমান সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে তার পক্ষে। চীৎকার করে ওঠে সে, "দেখতে চাও ওরা কার অধীন? একটা কথার ওয়াস্তা—"

কথা শেষ হয় না দবারের। "কি, হয়েছে কি?" বলতে বলতে ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়ায় মীর আহ্‌মদ। খবরটা ইতিমধ্যেই তার কাছে পৌঁচেছে। অবশ্য মীর দাদের অত্যচারের কাহিনীটুকু শুধু। তাই শুনেই ছুটে এসেছে সে। এসে দেখে ঘটনার স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে আর একমুখো। কিন্তু এ জিনিষকে আর এগুতে দেওয়া সমীচীন নয়। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে মীর দাদের হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে বের করে নিয়ে যায়। দবীরের সঙ্গে এ বিষয়ে কোনও কথা বলবার প্রয়োজন করে না। এতক্ষণে সিপাহ্‌দের মুখ খোলে। একের পর এক

মন্তব্য করে যেতে থাকে। তাদের প্রতিটি কথায় অসন্তোষের সুর। লক্ষ্য করে দবীর আর ভাবতে থাকে এরা কয় ভাই বোন কি তাদের ভাগ্যে দুষ্টগ্রহ হয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে? তাই যদি হয় তাহলে আগে থেকেই সাবধান হতে হবে। জায়গীর, রাজ্য, সাম্রাজ্য সব কিছুই বজায় থাকে এই এক সিপাহ্ শক্তিতে। সে শক্তি হারালে চলবে না। ভাবতে ভাবতে আব্বাস খাঁএর বাড়ীর দিকে চলতে থাকে দবীর। মনে পড়ে কয়েকদিন পূর্বে মীর দাদের সঙ্গে বচসার কথাটা। মীর দাদ সিপাহ্ সংখ্যা আরও বাড়িয়ে তুলতে চায়। তার জন্যে কিছু নওজোয়ান জোগাড় করে এনেছিল সে। কিন্তু দবীরের চোখে পড়ে যাওয়ায় কার্যে পরিণত হয়নি তা। শক্তি বৃদ্ধি করার অর্থই হল রাজরোষের কারণ হওয়া। বিশেষ করে তাজ খাঁর পক্ষে। চুণার বা তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল বা জায়গীর তার পৈতৃক সম্পত্তি নয়। ইব্রাহিম লোদী নিযুক্ত এক জিম্মাদার মাত্র তাজ খাঁ। এই চুণার দুর্গেরই এক ভূগর্ভস্থিত কক্ষে রয়েছে লোদী বংশের প্রচুর ধনরত্ন। সেই ধনরত্নের প্রহরার ব্যবস্থা করবার জন্যেই ক্ষুদ্র এক সৈন্যদল পোষণ করবার অনুমতি আছে তার। আর এইসব কাজের জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন, তারই জন্যে দেওয়া আছে চুণার, মির্জাপুরের জায়গীর। একথা জানে মাত্র কয়েকজন মানুষ। তাজ খাঁ, আব্বাস খাঁ আর সফিদা বেগম। আর জানে দবীর। শোনেনি তার মা সফিদা বেগমের কাছ থেকে। তাজ খাঁও বলেনি কোনদিন। বলেছে আব্বাস খাঁ। তাও খুব বেশিদিন পূর্বে নয়। হয়ত এক বৎসর কি আর কিছু বেশী হবে। অন্যান্য দিনের মত সেদিনও আব্বাসের গৃহে গিয়েছিল দবীর। মনের ভেতরে রাশিকৃত কথা। ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কয়েকদিন ধরে এলাহাবাদে এক আত্মীয় বাড়ীতে বেড়িয়ে এল, দেখে এল কত কিছু, সেগুলি একটি মনের মত

মানুষকে না বলা পর্যন্ত আনন্দটুকু ঠিকমত উপভোগ করতে পারছে না সে। আব্বাসের বাড়ীতে ছুটে গিয়েছিল সেই আশাতেই। আমিনার পাশে বসে একটু একটু করে বলবে সব, আর তুটি বিস্ময় ভরা চোখ তার মুখের ওপরে রেখে 'হাঁ' করে শুনতে থাকবে আমিনা। ভাবতেও ভাল লাগে। মনটাকে সেই সুরে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল আব্বাসের বাড়ীতে। আশা করতে পারেনি যে এই অসময়েও খাঁ সাহেব উপস্থিত থাকবে সেখানে। প্রথমটা একটু হকচকিয়েই গিয়েছিল। কেননা নিজেদের মনের খোঁজ পেলেও আব্বাস কি ভাবে নেবে তাদের এই ভালবাসাকে তা ছিল ওদের তু'জনেরই চিন্তার বিষয়। তাই তু'জনের সাক্ষাতের ব্যাপারটি ঘটত গৃহস্বামী কি গৃহকর্ত্রীর চক্ষুর অন্তরালে। সেদিনও সেইরকমই ইচ্ছা ছিল দবীরের। কিন্তু বাধা পেয়ে গেল ঘরের দোর গোড়াতেই। আব্বাস বসে। শুধু বসে নয়, বিশেষ একটু চিন্তিতও যেন। দবীরের পায়ের শব্দে ফিরে তাকায় আব্বাস। গম্ভীর অথচ শান্ত গলাতেই আহ্বান জানায়, "এস দবীর।"

আহ্বান শুনে ছলাৎ ক'রে উঠেছিল দবীরের বুকের রক্ত। বিদ্রূপ করে কি সম্মান দেখিয়ে ঠিক বুঝতে পারেনি দবীর, এতদিন পর্যন্ত 'ছোট মালিক' বলেই তাকে ডেকে এসেছে আব্বাস। আজ হঠাৎ সেই পরিচিত ডাকটির পরিবর্ত্তে এই নাম ধরে ডাকা, আপনি'র দূরত্ব সরিয়ে দিয়ে তুমি'র নৈকট্যে নিয়ে আসা, কি যেন এক আশ্বাসের বাণী বহন করে নিয়ে আসে তার কাছে। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় সৈনাধ্যক্ষের সামনে।

"বস," বলে নিজে একটু সরে বসে আব্বাস খাঁ।

বসে দবীর। অপেক্ষায় থাকে সে এরপর তাদের সৈনাধ্যক্ষ নয়, আমিনার আব্বাজানের তরফ থেকে কি কথা আসে তাই শোনবার জন্যে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত কোন কথাই বলে না আব্বাস খাঁ। তারপর

একসময় মুখ তুলে তাকায় দবীরের মুখের দিকে। ধীরে ধীরে বলে, "একটা কথা বোধ হয় তুমি জান না দবীর। অনেকেই জানে না। জানি কেবল আমি, তোমার আম্মা আর আব্বাজান। পাছে তুমি কাউকে বলে ফেল তাই তোমাকেও বলা বারণ ছিল।"

"তাহ'লে থাক।"

"থাকলে আর চলছে না। ঘরের পাশে শত্রু জলে শাঁসে বেড়ে উঠছে।"

"আপনি কার কথা বলছেন ? শের খাঁ ?"

"ঠিক তাই। খেয়ালী অত্যাচারী ইব্রাহিম লোদী নজরানার ওজন অনুযায়ী বিচার করতেন।"

আব্বাস খাঁয়ের মুখে কথাটা শুনে একটু আশ্চর্যই হয় দবীর। এই মানুষটির মুখেই একদিন সুলতান ইব্রাহিম লোদীর গুণগান শুনেছিল সে। দবীরের মুখের ভাব দেখে বুঝি সে কথা বুঝতে পারে আব্বাস খাঁ। বলে, "তুমি ভাবছ একমুখে দু'রকম কথা বলছি কেন, তাই না ? সেইদিনটার কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে ? খুব বেশি দিনের কথাত' নয়, বোধ হয় বছর তিনেক হবে।"

ঘটনাটিকে একটু তুলে ধরতেই স্পষ্ট মনে পড়ে দবীরের। চুণার দুর্গের বিশেষ একটি কক্ষে বসে কথা হচ্ছিল তাজ খাঁ, আব্বাস খাঁ আর কয়েকজন লোকের মধ্যে। আলোচনার বিষয়বস্তুর সবটাই ছিল যুদ্ধ সংক্রান্ত। দুর্গাধিপের পুত্র হিসাবে দবীরও উপস্থিত ছিল সেখানে। শুনেছিল সে আলোচনা। ইব্রাহিম লোদী প্রস্তুত হচ্ছে বাবরের সঙ্গে এক চরম মোকাবিলার। জয় পরাজয় সম্বন্ধেও সকলেই সন্দিহান। কেননা বাবর কামানের অধিকারী। ঐ একটি যন্ত্রের সাহায্যে সে কাবুল, লাহোর এবং কিছুদিনের মধ্যে সমগ্র পাঞ্জাব অধিকার করেছে।

"থাকুক কামান," দৃঢ়স্বরে বলে উঠেছিল আব্বাস খাঁ, "সুলতানও যুদ্ধ-বিশারদ। তাছাড়া মানুষের ভালবাসা যে জয় করেছে তাকে জয় করা খুবই মশকিল।"

"ঠিক বাৎ, ঠিক বাৎ," বলে উঠেছিল মানুষ কয়টি।

সেদিনও কেমন যেন অদ্ভুত লেগেছিল আব্বাস খাঁয়ের কথা। ইব্রাহিম লোদী যে জনচিত্ত জয় করেছে, কৈ একথাত, শোনেনি সে কোনদিনও! বরঞ্চ ঠিক উল্টোটিই শুনেছে। তার অত্যাচারের কাহিনী। মনের কথার মীমাংসা সেদিন আর হয়নি। কেননা তারপরই গোপন আলোচনা সুরু হয়, আর বাধ্য হ'য়েই সে কক্ষ ত্যাগ কবতে হয় দবীরকে।

সেদিনকার সেই সুলতান লোদীকে প্রশংসা করবার সূত্র ধরেই বলে আব্বাস খাঁ, "তার একই মাত্র কারণ হচ্ছে যারা এসেছিল তারা সকলেই লোদীর অত্যন্ত নিকটের মানুষ। আর তাছাড়া যুদ্ধের প্রস্তুতি চললেও জয় পরাজয় যেখানে অনিশ্চিত সেখানে হঠকারির মত একটি কথা বলে নিজের ধ্বংসের কারণ হতে চায় কে? পাণিপথের যুদ্ধে বাদশাহ্ বাবর জয়ী না হয়ে যদি ইব্রাহিম লোদী জয়ী হ'ত, তাহলেত' আজও আমাকে তারই অধীনস্থ হয়ে থাকতে হ'ত।"

"আপনি সুলতানের অধীনস্থ ছিলেন?" পূর্বধারণা সবই যেন একে একে পাল্টে যাচ্ছে দবীরের।

"হ্যাঁ," এতক্ষণে আবার পূর্বের মত গম্ভীর হয়ে ওঠে আব্বাস খাঁ, "সেই কথাই আজ তোমাকে বলতে চাই। মনে রেখ, যে কথা জানতাম মাত্র আমরা তিনজন, সেই কথাই আজ তোমাকে বলছি। আল্লার নামে একরার করতে হবে যে সে কথা আর কাউকে বলতে পারবে না তুমি।"

"কেন?" এত বড় শপথের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যায় দবীর।

'তার কারণ কথাটা প্রচার হয়ে পড়লে যেমন বেইমানী হবে তেমনি ভয়েরও কারণ আছে।"

"বেশ, আল্লার নামেই বলছি, কাউকে বলব না সে কথা। অন্ততঃ যতদিন না আপনার অনুমতি পাব।"

শপথ করেছিল দবীর। আর তারপরই এই চুণার ছুর্গের গচ্ছিত সম্পদের গুপ্ত-কথা তাকে বলেছিল আব্বাস খাঁ। শুনতে শুনতে অতীতের সেই দৃশ্যটিই আবার মনে পড়েছিল দবীরের। ইব্রাহিম লোদীর কাছ থেকে যে মানুষ কয়টি এসেছিল তারা তাহ'লে যুদ্ধের প্রয়োজনের জন্যে এই গচ্ছিত ধনেরই কিছু অংশ নিয়ে গিয়েছিল! সেই সঙ্গে এক অপূর্ব পুলক অনুভব করে সে নিজের অন্তরে। না, তফাৎ কিছুই নেই। তাজ খাঁ আর আব্বাস খাঁ, ছু'জনেই সুলতানের অনুগৃহীত। পার্থক্যের ভেতরে জায়গীর। জিম্মাদারীব নোকরীর সঙ্গে সঙ্গে যার অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটবার সম্ভাবনা। এ একরকম ভালই হ'ল, ভাবে দবীর, আমিনার সঙ্গে তার অবস্থার ব্যবধান আর কিছুই রইল না।

"হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলাম," বলে পূর্বকথার সূত্র ধরে আব্বাস খাঁ, "বাবর ইব্রাহিম লোদী নয়। কেবলমাত্র নজরানা তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। সে দেখে শক্তি, যে শক্তি প্রয়োজনে তার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে পারবে। আর সেইজন্যেই শের খাঁ সাসারামের পৈতৃক জায়গীর ফিরে পেয়েছে।"

"একি ঐ আফগান যুদ্ধের ফল?" জিজ্ঞাসা করে দবীর।

"হ্যাঁ। শের খাঁ উচ্চাভিলাষীই শুধু নয়, উঁচুতে উঠতে হলে যখন যে রাস্তায় যাওয়া প্রয়োজন, ঠিক চলে সে।"

মিথ্যা কথা বলেনি আব্বাস খাঁ, অতিরঞ্জিতও নয়। ফরিদ খাঁ সুর থেকে শের খাঁ হওয়া অবধি তার কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফেরে। একটি বালক যেন নিজেকে সম্মানের উচ্চশিখরে নিয়ে

যাবার জন্যে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে আপনাকে। পিতা জায়গীরদার হওয়া সত্বেও নিজের গৃহে শিক্ষার সুযোগ মেলেনি তার। কিন্তু তাই বলে শিক্ষা সংস্কৃতিকে 'নসীবে নেই'এর দোহাই দিয়ে ছাঁটাই করে দেয়নি সে। গৃহত্যাগ করে জৌনপুরে গিয়ে সেই শিক্ষাকে অর্জন করেছে সে। তারপর পিতার আহ্বানে গৃহে ফিরে আসা আর বিমাতার অত্যাচারে গৃহত্যাগ করা, নসীব যেন পরিহাস করতে থাকে তাকে নিয়ে। ইতিমধ্যে হাসান খাঁ সূর ইন্ত্‌কাল হওয়ায় নিজেই সে সাসারামের জায়গীরদার হয়ে বসে। তারপর শোনা যায় সে নাকি বিহারের সুলতান বাহার খাঁ লোহাণীর অধীনে চাকরী নেয়। এই সময়েই একদিন সুলতানের কাজে গ্রামান্তরে যাচ্ছিল ফরিদ খাঁ। সঙ্গে সঙ্গীও ছিল কয়েকজন। পড়ন্ত বেলা। অথচ যেতে হবে একটি জঙ্গল পেরিয়ে। নিষেধ করেছিল গ্রামের লোকজন, সঙ্গীরাও যোগ দিয়েছিল তাদের সঙ্গে। কিন্তু ফরিদ শোনেনি সে কথা। সঙ্গীরা যায় ভাল, না যায়, সে একাই যাবে। গিয়েছিলও তাই। এর কিছুক্ষণ পরেই বনের মধ্যে বাঘের হুঙ্কার শুনতে পাওয়া যায়। শুনে সকলেই ভেবেছিল যে শেরের ভোগ্যদ্রব্যে পরিণত হয়েছে ফরিদ খাঁ। একটু খারাপও হয়েছিল মনটা। হাজার হলেও একটা শিক্ষিত মানুষত'! একটু একটু ক'রে তারই আলোচনায় মশগুল হ'য়ে উঠেছিল সবাই। এমন সময় দূর থেকে ফরিদের হাঁক শুনে চমকে ওঠে সকলে। ছুটে যায় তারা। দেখে এক হাতে রক্তাক্ত তরোয়াল, আর এক হাতে একটি শেরের দীর্ঘ লাঙ্গুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে ফরিদ খাঁ। সর্বাঙ্গ তার রক্তে মাখামাখি। কোথাও কোথাও নখরাঘাতের চিহ্ন।

এই অসমসাহস এবং কৃতিত্বই ফরিদ খাঁকে লোকচক্ষুর সামনে এনে দেয়। বাহার খাঁ দিলেন তাকে 'শের' উপাধি। আর সেই

উপাধিতেই চিহ্নিত হয়ে গেল ফরিদ। পিতৃদত্ত নাম 'ফরিদ' মুছে গিয়ে নতুন নামকরণ হ'ল তার 'শের খাঁ'।

বিশিষ্ট হ'য়ে ওঠাতেই শের খাঁর খবর কাহানী হয়ে ঘুরত লোকের মুখে মুখে। সেইভাবেই শুনেছে দবীর যে এই উপাধি প্রাপ্তিই আবার ভাগ্য বিপর্যয় ডেকে এনেছে শের খাঁএর। তার বিমাতা যেমন সহ্য করতে পারেনি স-পত্নী পুত্রের এই সুনাম তেমনি কয়েকজন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামণীও তার বিরুদ্ধবাদী হ'য়ে দাঁড়ায়। এতখানি আশা করতে পারেনি শের খাঁ। তাই খোস মেজাজেই সেবার ইলাহী-রাত যাপন করবার জন্যে সাসারামে এসেছিল সে। কিন্তু নিজের জায়গীরে প্রবেশ করবারও সুযোগ মেলেনি তার। তার পূর্বেই খবর মিলেছিল এক অনুরক্ত প্রজার কাছ থেকে যে বিদ্রোহী প্রজা আর সৈন্যদল লুকিয়ে আছে প্রতিটি প্রবেশ পথে। শুনে আর সেখানে দাঁড়ায়নি শের খাঁ। অন্তরে আগুনের জ্বালা নিয়ে ফিরে চলেছিল দিল্লীর পথে। ইলাহী-রাত—মহরমের জাগরণ রাত্রি কেটেছিল তার পথের বুকে।

তারপর আবার একদিন ফিরে এল শের খাঁ। সঙ্গে বাদশাহ বাবরের ফরমান এবং দেহরক্ষী সৈন্য। সাসারামে প্রবেশের পূর্বেই বুঝি খবর পেয়েছিল শের খাঁর বিমাতা, তাই তাকে আর দেখা যায়নি। কিন্তু শত্রুর অস্তিত্ব রাখেনি শের খাঁ। বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামণীদের কয়েকজন গুপ্ত আততায়ীর হাতে নিহত হ'তেই অবশিষ্ট কয়েকজন পালিয়েছিল পৈতৃক ভদ্রাসনের মায়া ত্যাগ করে।

"কি ভাবছ?" আব্বাস খাঁ-এর কথায় বর্তমানে ফিরে আসে দবীর।

"ভাবছিলাম শের খাঁর কথা। তার জীবনটা যেন একটা কাহানী।" উত্তর দেয় দবীর।

"কাহানী নয়, তার মূল মানুষটিকে নিয়ে চিন্তা কর। অনেক

তুফান গিয়েছে ওর মাথার ওপর দিয়ে কিন্তু উপড়ে পড়েনি। একটু একটু করে এগিয়েই চলেছে। এখন সে কেবল মাত্র একটি জায়গীরদার নয়। দবীর, বাদশাহ্ বাবর ইনাম দিয়ে গিয়ে বুঝি এক বিরাট ভুল করে ফেলেছেন।" অত্যন্ত চিন্তান্বিত ভাবে একটু একটু ক'রে কেটে কেটে বলে গিয়েছিল আব্বাস খাঁ, "নসীব যখন খারাপ হয় তখন তুফানের সঙ্গে আসে পানি, বিজ্‌লী-কড়ক্, আবার নসীব যখন খোলে তখন দরিয়ায় ডুবে যাওয়া জাহাজের সওদা ভাসতে ভাসতে নিজের ঘাটে এসে লাগে। তাই হ'ল শের খাঁর। নিজের জায়গীর :পেল, সঙ্গে সঙ্গে বাহার খাঁ লোহানীর বেগম দুদুবিবি তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নাবালক পুত্র জালাল খাঁর শিক্ষক নিযুক্ত করল। এখন?"

এখন? এত বলা কওয়ার পরও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি দবীর এতে চিন্তার কি আছে? আমি এখানে আছি, অতএব পাশে আর কেউ বড় হবে না? আব্বাস খাঁর এ ধরণের মনোভাবকে সে যেন ঠিক মেনে নিতে পারে না। তাই উত্তরও দেয় না কিছু। মাথা নিচু ক'রে নিশ্চুপ বসে থাকে।

"তুমি বোধ হয় আমার বক্তব্যটা ঠিক বুঝতে পারনি?" দবীরের চুপ ক'রে থাকা দেখে নিজেই আবার বলতে থাকে আব্বাস খাঁ, "সুলতান বাহার খাঁ নেই। জালাল খাঁ শিশু। তার পেছনে দাঁড়িয়ে শের খাঁই রাজ্য পরিচালনা করছে। এ পরিচালনার অর্থ কি জান? জালাল খাঁর সিপাহ্ শক্তি আজ শের খাঁর হাতের হাতিয়ার।"

এতক্ষণে যেন সিপাহ্-শালারের বক্তব্যটি একটি স্পষ্ট আকার ধারণ করে। মনে মনে আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠে সেও। শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রবল বাসনা জাগা স্বাভাবিক বৈকি। আর সেই ইচ্ছার বশেই যদি কোনদিন চুণার আক্রমণ

করে বসে সে ?

"তাহলে ?"

নিজের মনের প্রশ্নটাই বুঝি মুখ ফুটে বেরিয়ে পড়েছিল তার। আর উত্তর দিয়েছিল আব্বাস খাঁ, "সেই কথাই চিন্তা করছি দবীর। কিন্তু উত্তর এখান থেকে অনেক দূরের পথ।"

"কোথায় ?"

"দিল্লীতে। বাদশাহ্ বাবরের কাছে।" বলে একটা দীর্ঘ-শ্বাসের সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় আব্বাস খাঁ। দবীরও উঠে দাঁড়ায়। আমিনার সঙ্গে এদফে আর দেখা করা হ'ল না। অর্থাৎ আবার দুপুর বেলা আসতে হবে।

তাই আসছিল দবীর। একটু অন্যমনস্ক ভাব। আব্বাস খাঁর চাপিয়ে দেওয়া চিন্তার রেশটা এখনও যায়নি। এমন সময় কার চাপা গলার খিল্‌খিল্ শব্দ কানে যেতে চম্‌কে মুখ তুলে তাকায় সে। আমিনা! সুর্মা আঁকা চোখ দুটিতে দুষ্টুমি আর পেয়ার যেন তাল-তমালের মত জড়াজড়ি করে রয়েছে। দেখে আর চোখ ফেরেনা দবীরের। নিজের হৃদয়খানিই বুঝি রূপ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে।

"হাসছিলে কেন ?" জিজ্ঞাসা করে দবীর।

"শাহানশাহ্‌কে এত চিন্তিত দেখলাম যে ভয় পেয়ে গেলাম, এই বুঝি ঠোকা খেয়ে যায় কিছুর সঙ্গে। তাই হাসির ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলাম।"

"ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি ?"

কুর্নিশ করে আমিনা।

"তোবা তোবা, শাহান্‌শাহ্‌র সঙ্গে ঠাট্টা!"

"তোমাকে আজ কিসে পেয়েছে বলত ?"

বারান্দার ওপরে উঠে আসে দবীর।

"প্রেমে। জাঁহাপনার জন্য একটা খুশ্‌খবর আছে। চল, ঘরে চল।"

বারান্দার লোক-চক্ষুর সম্ভাবনা ছেড়ে ঘরের আবরুতে গিয়েই ঘুরে দাঁড়ায় আমিনা, বলে, "একটা জবর খবর দিতে পারি। কি দেবে বল ?"

"সবই যে দিয়ে রেখেছি। আরত' দেবার কিছু নেই।"

"হায় খোদা, আমার কপালে দেখছি রাজা হর্ষবর্ধণ এসে জুটল !"

"তুমি জান তাঁর কাহিনী ?" উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে দবীর, "কি করে জানলে ?"

"শাহান্‌শাহ্‌ চুণারে থাকেন অথচ তাঁর হিন্দু প্রজাদের সম্বন্ধে কোন খোঁজ রাখেন না দেখছি।"

"তুমি বারে বারে শাহন্‌শাহ্‌ বলছ কেন ?"

অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বর দবীরের। বুঝতে পারে আমিনা। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চটুলতা তার কোথায় উবে যায়। কাজল-কালো দুটি চোখ দবীরের চোখের ওপরে রেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে সে তার আশকের সামনে। ধীর নম্র গাঢ়স্বরে বলে, "মনইত' মানুষের রাজা, তারও ওপরে যে রাজা তাঁকেইত' বলে শাহান্‌শাহ্‌।" বলে আর এক পা এগিয়ে আসে সে, দবীরের প্রশস্ত বুকের ওপরে মাথা রেখে ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে, "আমার রাজা হর্ষ।"

বহুবার এসেছে, বহু কথা বলেছে কিন্তু এমনভাবে এই অঙ্গনাটিকে একবারও কাছে পায়নি দবীর। দু'হাতে তার মুখখানি সযত্নে তুলে ধরে বলে, "কৈ, তুমি হর্ষবর্ধণের কথা কোথা থেকে জানলে বললে না ?"

"শুনবেই তাহলে ?" দবীরের বুকের কাছ থেকে এক পা সরে এসে স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকায় আমিনা, "চুণারের দক্ষিণে গিয়েছ কোনদিন ?"

"তুমি এমনভাবে প্রশ্ন করছ যেন আমি পর্দার আড়ালে বসে থাকি আর তুমি ঘোড়ায় চড়ে সারাটা জায়গীর ঘুরে বেড়াও।" কৌতুকে উচ্ছল হয়ে ওঠে দবীরের চোখমুখ।

"আহা, তাই বলেছি নাকি ?" দু'চোখে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ পায় আমিনার, আবার তখুনি সরল হ'য়ে ওঠে সে, "তা নয়। সেখানে যাওয়ার একদিন কারণ ঘটেছিল। গিয়েছিলাম আমরা তিনজনেই। বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের যে অংশটা চুণারে এসে শেষ হ'য়েছে, তার একটু আগেই আছে একটি গিরিপথের মত জায়গা। সেখান দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেলেই দেখা যায় একটা গুহা। সেই গুহা থেকেই একদিন ডাক এল আব্বাজানের। যে লোকটা এল খবর নিয়ে, সে হিন্দু। অতএব যে আব্বাজানকে ডেকে পাঠিয়েছে সেও নিশ্চয়ই হিন্দু। রেগে আগুন আব্বাজান। কার এমন সাহস যে একজন সিপাহ্‌শালারকে ডেকে পাঠায়! আম্মা কিন্তু ভারি অদ্ভুত কথা বলল।"

"কি বললেন ?"

"আম্মা বলল, যিনি ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁর ডাকবার ক্ষমতা আছে বলেই ডেকেছেন। চল, আমিও যাব।"

"অদ্ভুত সাহস !"

"তা, একটু আছে। আম্মা বলে, নিজের ওপরে বিশ্বাস যেদিন হারাব সেইদিন আমার সাহসও যাবে। যাক্, ওদের দু'জনের সঙ্গে আমিও গেলাম। গুহার বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ওমর আব্বাজানেরই মত, কি কিছু বেশী হবে। দাড়ি গোঁফে মুখখানি প্রায় ঢাকা। জায়গায় জায়গায় পাক ধরেছে।

আব্বাজানকে দেখেই বললেন—আয়, একটা কথা বলবার জন্যে তোদের ডেকে পাঠালাম। এগিয়ে গিয়ে একটা পাথরের ওপরে বসলেন তিনি। আমাদেরও বসতে বললেন। আমরা বসলাম। সে পাথরে নয়, পাশের আর একটা পাথরে। আমরা বসতেই তিনি বললেন—চুণারের ভাগ্যে ঝড় উঠে আসছে। তোরা সৎ, তাই বলছি, যদি পারিস অন্য কোথাও চলে যা।"

"এর সঙ্গে হর্ষবর্ধণের সম্বন্ধ কোথায় ?"

"তিনিই কথায় কথায় রাজ্যবর্দ্ধণ, হর্ষবর্দ্ধণ আর রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মার কথা বললেন। হর্ষবর্দ্ধণ কেন অত বড় আর গ্রহবর্মা কেন অত অল্প বয়সেই শেষ হ'য়ে গেলেন, তাও বললেন। এলেমদার মানুষ। সহজ সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর বলবার কথা। তারপর আমাকে বললেন—" বলেই লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে আমিনা। কথা থেমে যায় তার।

"বল, বলতেই হবে," আমিনার হাত দুটি চেপে ধরে দবীর।

"কি যে বল, সে কথা বলা যায় নাকি ?" হাত দুটি ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে আমিনা।

"বেশ," হাত ছেড়ে নিজেকে সরিয়ে নেয় দবীর, "আমি জানতাম না যে এতখানি পর মনে কর তুমি আমাকে।"

"বাস্, অমনি জাঁহাপনার অভিমান হ'ল !" ছুটে সামনে এসে দাঁড়ায় আমিনা, "বলছি বাপু। সরম ব'লে কিছুত' আর আমার রাখলে না ! উনি বল্লেন, দেখ্ মা, পেয়ার সওদা নয়। ওটা রশি। ঐ পেয়ারের রশি দিয়েই অন্যের পেয়ার বাঁধতে হয়। তাই করিস, সুখী হবি।" লজ্জার রাঙা আবীর ছড়ান মুখখানি আর তুলতে পারে না আমিনা। তুলে ধরে দবীর, "আমি যে পেয়ারের দামেই পেয়ার সওদা করতে এসেছি।"

কিন্তু সে কথার উত্তর দেবার আর অবসর মেলেনা আমিনার।

অন্দর থেকে ওর মায়ের ডাক শোনা যায়।

"এইরে, আম্মা উঠে পড়েছে। আমি যাই।" তাড়াতাড়ি বলে ওঠে আমিনা।

"কিন্তু কি একটা খুশ্‌খবর আছে বলছিলে যে?" বাধা দেবার চেষ্টা করে দবীর।

"আমাদের ছাগ্‌লীটার তিনটে বাচ্চা হয়েছে," বলেই অন্দরের দরজা দিয়ে পালিয়ে যায় আমিনা। 'খুশখবর' দেবার আর সুযোগ মেলেনা তার।

দুর্গে প্রবেশের মুখেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে যায় দবীর। খোশ-মেজাজে নেমে আসছে যে সৈন্যটি তাকেই একটু আগে মারছিল না মীর দাদ? এরই ভেতরে তার মেজাজ সরিফ হওয়ার কি এমন কারণ ঘটল? দাঁড়িয়েই থাকে সে। গড়গড়িয়ে নেমে আসে লোকটি। দুর্গদ্বারের কাছে এসেই আটকে যায়। আ-ভূমি কুর্ণিশ করে একগাল হেসে বলে, "বখসিস মিলেছে জনাব।"

"কে দিল?"

"নয়া বেগম হুজুরান্‌। খবর শুনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। যেতেই বল্লেন, কিছু মনে করিস্‌ না, মীর দাদ যা বলে করিস্‌, আমি তোদের বখসিস্‌ দেব।" বলেই লোকটা তার কামিজের ভেতর থেকে গোটা দুই রূপোর আসরফী বের করে দেখায়। হেসে হেসে বলে, "ছোট হুজুরানের খুব দয়ার শরীর জনাব। এমনটা এর আগে দেখিনি কখনও।"

"তা হবে," বলে আবার ওপরের দিকে উঠতে থাকে দবীর। মাথার ভেতরে তাল পাকিয়ে উঠছে একরাশ চিন্তা। চুণারের ভাগ্যাকাশে ঝড়ের মেঘ ঘনিয়ে আসছে। তার পূর্বাভাস পাওয়া

যাচ্ছে একটু একটু করে। কিন্তু মেঘের রংটা শুধু ধরা যাচ্ছে না। কালিমাখা মেঘ হলে এতক্ষণে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তা নয়, অথচ ঝড়ও হবে। তা হলে এর রূপ কী? ভাবতে ভাবতে ওপরে উঠে যায় দবীর। নিজের ঘরের দিকে যেতে থাকে। এমন সময় একটি বাঁদী সামনে এসে কুর্নিশ করে। দাঁড়িয়ে যায় দবীর। একেত' কোনদিন দেখে নাই সে!

"ছোট মালিকান্ আপনাকে খুঁজছিলেন জনাব।"

'কেন' জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও থেমে যায় দবীর। বাঁদীর ওষ্ঠপ্রান্তে সূক্ষ্ম একটুকরো হাসির রেখা দেখা যাচ্ছে না! ওটা কিসের? বিদ্রূপ? রহস্য?

"একটু কষ্ট করতে হবে জনাব।" তাগাদা আসে বাঁদীর তরফ থেকে। সঙ্গে আর একটি কুর্ণিশ।

বাধা পায় চিন্তা। 'চল' বলে মালিকার মহলের দিকে যেতে থাকে দবীর।

মালিকার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই ঘরের ভেতর থেকে হুকুম আসে, "তুই এখন যেতে পারিস ওয়াহিদা।"

পায়ের শব্দ বাঁদীর এর পূর্বেও পাওয়া যাচ্ছিল না, এবারেও পাওয়া গেল না। শুধু মনে হ'ল ছায়ামত একটা কিছু সরে গেল পিছন থেকে। আর তারপরই মনে হ'ল তার, যেন এক অকূল সমুদ্রে পড়েছে সে। এগুবে? কিন্তু কোনদিকে? আশার রেখাত' কোথাও দেখা যায় না। শুধু অনুভব করা যায় তার অতলতা। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে দবীর।

"কৈ, ভেতরে আসবে না?"

স্বর আর সুর, এই দু'য়েইতো মনের প্রকাশ। ঘরের ভেতরের ঐ ডাক যেন একটু আগে আর একজনের বলা 'আমার রাজা হর্ষ' এর সুরেই এসে কানে বাজে দবীরের। ঘরের দরজায় এসেছে.

কিন্তু পা বাড়িয়ে ভেতরে ঢুকবার সাহস খুঁজে পাচ্ছে না। ঐ সুর, ঐ আহ্বানের মাঝে কিসের একটা মৃদু ঝংকার উপলব্ধি করা যায় যেন! দ্বিধায় পড়ে দবীর, কি করবে সে এখন?

কিন্তু অধিকক্ষণ এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না তাকে। দরজার ওধারে মৃদু খস্ খস্ শব্দ। তারপরই সূক্ষ্ম রেশমী ওড়নায় মুখ ঢেকে সামনে এসে দাঁড়ায় মালিকা। এমনিতেই সে রূপসী। গোলাপী ওড়নার অন্তরালে থেকে হয়েছে সে অপরূপা। ঠোঁট দুটির ওপরে মৃদু হাসির ঝিকিমিকি খেলা। দু'চোখের তারায় সাদর আহ্বান। কিন্তু সে আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না দবীর। মুহূর্ত্তের জন্যে একবার সেই ওড়না ঢাকা মুখখানির দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নেয় সে। জিজ্ঞাসা করে, "আমাকে ডেকেছিলেন?"

"বলব বলেইত ডেকেছি! কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলবে তুমি?" একটু বুঝি কাতরতা ফুটে ওঠে মালিকার গলার স্বরে।

"আমার ওপরে কি হুকুম আছে বলুন।"

"ওকি কথা?" ছটফটিয়ে ওঠে মালিকা, তারপরই আবার শান্ত হ'য়ে যায়, "হুকুম নয়, বল প্রার্থনা। কোন দূর দেশ থেকে এসে একটু আশ্রয় পেয়েছি তোমাদের কাছে, এখন তোমরা যদি আমাদের আপনার বলে না ভাব তাহ'লে কোথায় যাব বল?"

"দুর্গাধিপের বেগম যিনি তাঁর মুখে একথা শোভা পায় না।"

"বেশত' বেগমই যদি হই, তাহ'লে আমার হুকুম শোন, মীর-দাদের কোন কাজের প্রতিবন্ধকতা করবে না তুমি।"

একি স্বর! ক্ষণপূর্ব্বের সেই বিনম্র ভাবটিতো খুঁজে পাওয়া যায় না এর ভেতরে! চমকে মুখ তুলে তাকায় দবীর। ওড়নার আড়ালে দুটি চোখ থেকে যেন বিদ্যুত বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মনে মনে হাসে দবীর। ভুল জায়গায় আঘাত হানবার চেষ্টা করেছে নয়া বেগম। তবুও নিজেকে স্ব-বশে রাখবার চেষ্টা করে দবীর। পূর্ব্বের মতই ধীর গলায়

বলে, "হুকুমটা মনে রাখবার চেষ্টা করব।" বলেই সে কুর্নিশ করে মালিকাকে। এই প্রথম। তারপরই ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে থাকে। একবার ফিরে তাকিয়েও দেখে না যে হুকুমদাত্রীর বিদ্যুতে ভরা চোখ দুটি ইতিমধ্যেই আবার জলে ভরে উঠেছে।

চাঁদের আলোয় পাহাড়টাকে মনে হয় যেন একটি বিরাটদেহী সরীসৃপ। সমতলের বুকে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। এক নিস্তব্ধতার রাজ্য। হিংসা, দ্বেষ, অসূয়া-মনোবৃত্তির ক্লেদাক্ত বাতাস থেকে দূরে সরে এসে আপনাতে আপনি বিভোর হয়ে রয়েছে সে। ধ্যান মৌন অদ্রি।

চিরদিনের এই প্রশান্তি নাড়া খেয়ে যায় সেদিন। অশ্বক্ষুর-ধ্বনিতে সেই অপার নিস্তব্ধতাকে জাগিয়ে তুলে গিরিপথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে ইশাক। লোকালয় পিছনে ফেলে আসায় নিশ্চিন্ত মনোভাব। এই পার্বত্য অংশটুকু পেরিয়ে যেতে পারলে হয়, তাহলেই সে অশ্বমুখ পূর্বদিকে ঘুরিয়ে তীব্র বেগে ছুটে যেতে পারে।

"কে যায়?" দরাজ গলার হঠাৎ ছিটকে আসা প্রশ্নে চম্‌কে যায় ঘোড়া। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শিস্‌-পা হয়ে। ইশাকের মনের নিশ্চিন্ততাও বিপুলভাবে নাড়া খেয়ে যায় ঐ এক প্রশ্নে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিক ওদিকে তাকায় সে। ঐত' গুহার ওদিক থেকে কে একজন এগিয়ে আসছে এদিকে। চাঁদের আলোয় মানুষটিকে দেখেই চিনতে পারে ইশাক। ব্রহ্মচারীজী। চুণারের হিন্দু বসতিগুলির দিকে প্রায়ই দেখা যায় তাঁকে। ইশাকও লক্ষ্য করেছে তা এবং ভেবেছে মানুষটি মুসলমান বিদ্বেষী। তাই এই মানুষটির ওপরে বিশেষ শ্রদ্ধা নেই তার। বরঞ্চ ওঁর সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণেরই ইচ্ছা আছে। আজ এতদিনে মিলল বুঝি

সেই মওকা। লাফিয়ে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে পড়ে ইশাক। কোষ-বদ্ধ তরবারিটা ঝপাং করে এসে পড়ে তার জানুর ওপরে। ঝণাৎ ক'রে একটি কঠিন ধাতব শব্দ ওঠে। কঠীনতার আভাস পাওয়া যায় ইশাকের মুখমণ্ডলেও। স্থির দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে অগ্রসরমান মানুষটির দিকে। গুহা থেকে বেরিয়ে কয়েক হাত মাত্র সমতলভূমি। তারপর কয়েক ধাপ উঠলে তবে এই গিরিপথ। সমতলভূমির শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়ান ব্রহ্মচারীজী।

"কোথায় চলেছ ইশাক সাহেব?" ব্রহ্মচারীর দরাজ গলার স্বর পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে গম্‌গমিয়ে ওঠে।

"তাতে তোমার প্রয়োজন?" কুটিল হ'য়ে ওঠে ইশাকের চোখ তুটি।

"প্রয়োজন আমার সামান্য। চুণারের শান্ত বাতাস নাড়া খেয়ে না ওঠে, এইটুকুই শুধু চাই।" ব্রহ্মচারী বলেন।

"সেটা যাদের দেখবার কথা তারাই দেখবে।"

"দেখছিলেনও এতদিন। কিন্তু এখন দেখছি আকাশে মেঘ। ঝড় উঠলে গরীব প্রজারা কোথায় যাবে বল?"

"সে কথা জায়গীরদারকেই জিজ্ঞাসা কর।"

"মালিক জানে আর নিশীথ রাতের ঘোড়সওয়ার জানে না, এটা কি একটা কথা হ'ল? তা এ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ কেন? এটা ঘুর পথ। পাহাড়ের উত্তর দিক দিয়ে গেলে অনেক সহজ হ'ত যাওয়া।"

"কোথায় যেতে?"

"কেন, সাসারাম। সেটাইত' তোমার গন্তব্যস্থল।"

ব্রহ্মচারীর কথা শুনে চমকে ওঠে ইশাক। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় তার, এ মানুষকে জীবিত অবস্থায় পিছনে রেখে সাসারাম যাওয়া আর নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করা একই কথা। যেমন মনে

হওয়া অমনি একলাফে এগিয়ে যায় সে কোষমুক্ত তরোয়ালটি নিয়ে।

"খবরদার!"

হুঙ্কার দিয়ে এক পা পিছনে সরে যান ব্রহ্মচারী। কাপড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা দীর্ঘ কৃপাণখানি তাঁর চাঁদের আলোয় চক্‌মকিয়ে ওঠে। ইশাকও যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। তরোয়াল দেখে পশ্চাদপদ হওয়া শেখে নাই সে। পায়ে পায়ে এগিয়েই চলে সে। নামে ধাপে ধাপে। তীক্ষ্মদৃষ্টি স্থাপিত ব্রহ্মচারীর মুখের ওপরে। এতক্ষণ ইশাককে নামবার সুযোগ দিয়েছিলেন ব্রহ্মচারী। সমতল ক্ষেত্রটির ওপরে সে নেমে এসেছে দেখেই আক্রমণ করেন তাকে। নিস্তব্ধ পাহাড়ের বুকে জাগে দুটি ইস্পাত ফলার সংঘর্ষণের শব্দ। শক্তি বা কৌশলে কেউ ছোট নয়। তবুও মনে হয় ইশাকের যে ঐ প্রৌঢ়ের শক্তি কেবলমাত্র তার দেহেই নয়। আরও শক্তি তার নিশ্চয়ই আত্মগোপন করে আছে কোথাও। নৈলে স্বয়ং চুণারাধিপতির সহ-সৈনাধ্যক্ষের সঙ্গে অস্ত্র পরীক্ষায় নামবার দুঃসাহস তার হ'ত না।

ইশাকের একটি আঘাত সুনিপুণভাবে প্রতিহত করবার সঙ্গে সঙ্গে তার বাহুমূলে একটি অস্ত্র চিহ্ন রেখে আসে ব্রহ্মচারীর তরোয়াল। ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হয়ে ওঠে ইশাক। এতক্ষণ ধরে চেষ্টা করে সে যা পারেনি তাই করল কিনা এই স্থবির মানুষটি! প্রথম অস্ত্রাঘাতের গৌরব অর্জন করল সে! মরিয়া হ'য়ে আক্রমণ চালায় ইশাক। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আগুন জ্বলে ওঠে দুটি ইস্পাতের দন্ত-ঘর্ষণে।

"তোমার ভুল হচ্ছে ইশাক, উর্দ্ধ-বক্ষের পর নিম্নকোটি করতে গেলে তামেচার এক আঘাতেই তুমি শেষ। সাবধান!" বলতে বলতে প্রতিপক্ষের শরীরে আবার একটি অস্ত্রলেখা এঁকে দেন ব্রহ্মচারী।

তারপরই নিজেকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে বলেন, "তুমি যাও ইশাক। চুণারের ভাগ্য বিরূপ। তোমাকে মেরে সে ভাগ্যকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। তবে এটাও জেন যে তোমরাই হচ্ছ চুণারের অশুভ গ্রহ।"

কথা শেষ করে আর সেখানে দাঁড়ান না ব্রহ্মচারী। গুহামুখ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ না ক'রে তার পাশ দিয়ে চলে যেতে থাকেন। শুভ্র দেহখানির ওপরে স্বেদ-কণাগুলি চাঁদের আলোয় চিকচিক করতে থাকে। যেন শত শত উর্ণনাভ-অক্ষি বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ইশাকের দিকে।

চিরদিন শান্ত উদাত্ত অজান্ধ্বনিতে ঘুম ভাঙে দবীরের। সেদিন ঘুম ভেঙে গেল তার ব্যতিক্রমে। কতকগুলি মানুষের উত্তেজিত মিলিত কণ্ঠস্বর যেন ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিল তার। উঠে পড়ে দবীর। চোগাটা গায়ে চাপিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। দেখে মীর আহ্মদ আর মীর দাদের সঙ্গে উত্তেজিত ভাবে কি সব আলোচনা করছে তাজ খাঁ। ওদিকে মালিকার মহলে বর্ত্তিকার ঔজ্জ্বল্য দেখে বোঝা যায় উত্তেজনা সেখানেও কিছু কম নেই। এরই ভেতরে ওয়াহিদা এসে কুর্ণিশ করে তাজ খাঁকে। ভাষায় প্রকাশ করতে হয় না তাকে কেন এ কুর্ণিশ। তার মুখের দিকে মুহূর্ত্তের জন্যে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয় তাজ খাঁ। মীর আহ্মদের দিকে চোখ রেখে বলে, "চল যাচ্ছি।" তারপর স্পষ্টভাবে মীর আহ্মদকে হুকুম জানায়, "দাঁড়াও, এখুনি আসছি।"

মালিকার মহলের দিকে চলে যায় তাজ খাঁ। দবীরও ফিরে যেতে থাকে নিজের ঘরের দিকে। মাথার ভেতরে এক অশুভ আশঙ্কা। একটা কিছু যে হ'য়েছে তা সুনিশ্চিত। দুর্গের পূর্বদিকে কিছু সৈন্যকেও

সুসজ্জিত দেখা গেল। কিন্তু সৈনাধ্যক্ষ আব্বাস খাঁকে দেখা যাচ্ছে না কেন? তাহ'লে কি এখন থেকে মীর আহ্‌মদরা নিজেরাই সৈন্য পরিচালনা করবে? কথাটা চিন্তা করতে নিজেকেই কেমন অসহায় মনে হয় তার। ঘরের ভেতরেও তেমন স্বস্তি পায় না। বাঁদীদের ঘরের পাশ দিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় দুর্গের উত্তর-প্রান্তে। গঙ্গার বুকে পাল তুলে দিয়ে চলেছে সওদাগরী নৌকাগুলি। কেমন নিশ্চিন্ত ওদের জীবন! দস্যু তস্করের ভয় একেবারে যে নেই তা নয়। কিন্তু সেই ভয়ের রাস্তাটুকু কোন রকমে পেরিয়ে যেতে পারলেই আবার গা মেলে দেওয়া যায় নিশ্চিন্ততার বাতাসে। আর তাদের? রাজনীতির কুটিল আবর্ত প্রতিমুহূর্তে ক্ষইয়ে নিয়ে যাচ্ছে পায়ের নীচেকার মাটি। সতত সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় ঘটে যেতে পারে বিরাট বিপর্যয়। ভাল লাগে না এসব। আর যা ভাল লাগে, তাজ খাঁর পুত্র হয়ে তা কাউকে বলবার নয়। একখানি শান্তির ঘর আর দুটি পরিশ্রমের ফসল। কিন্তু তা যে আর হওয়ার নয়! একটা টানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দবীর।

সেই দীর্ঘশ্বাসকে ব্যঙ্গ করেই বুঝি খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে ওঠে কে। চম্‌কে ফিরে দাঁড়ায় দবীর। ওয়াহিদা। সেও এসে দাঁড়িয়েছে প্রাচীরের কাছে। দবীর ফিরে তাকাতেই কুর্ণিশ করে বলে, "ছোট মালিকের ঘুমের ব্যাঘাত হল আজ।"

অন্য সময় হ'লে হয়ত' ওয়াহিদার ওপরে রেগেই যেত দবীর। কিন্তু ঐ বাঁদীটিকেই যেন এখন এই মুহূর্তে পরম আকাঙ্খিতা বলে মনে হয় তার। জিজ্ঞাসা করে, "কি হ'য়েছেরে?"

"সে অনেক কাণ্ড। নতুন বেগমের ঘরে যান না, উনিই বলবেন আপনাকে।"

"কেন, তুই বলতে পারিস্ না?" একটু অসন্তুষ্ট ভাবেই বলে ওঠে দবীর।

"বলতে মানা করেছেন যে।" বলে একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসে বাঁদী, "আপনারত' আর ওখানে যেতে বারণ নেই।"

"কি বলছিস তুই?" চোখ দুটি জ্বলে ওঠে দবীরের।

ওয়াহিদাও বোঝে এই কঠিন মানুষটির মনে তার ছলাকলা কোন প্রলোভনই জাগাতে পারবে না। উপরন্তু মালিকের কানে উঠে এক বিশ্রী আকার ধারণ করবে। তাই সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে যায় সে। হাত জোড় ক'রে বলে, "আমি সত্যি কথাই বলেছি ছোট মালিক। আমরা বাঁদী, আমাদের ওপরে যেমন হুকুম থাকবে তেমনিত' বলব।"

সত্যিইত, ওদেরই বা দোষ কি? চিন্তার মোড় ঘোরে দবীরের, মালিক যদি তার মর্যাদা না রাখে, বাঁদী নোকরে আস্কারা পাবেই।

মনের ভাষা পড়বার ক্ষমতা স্ত্রীলোকদের জন্মগতভাবেই পাওয়া। ওয়াহিদাও পড়তে পারে দবীরের মনের অনুতাপকে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে সে। জিজ্ঞাসা করে, "দরিয়ার পানি বড় ঘোলা, না ছোট মালিক? আর মাঝে মাঝে পাক?"

উত্তর দেয় না দবীর। দরিয়ার পানি ঘোলা হতে পারে কিন্তু তার বুকে যারা বাস করে তারা অনেক সহজ সরল। প্রাচীরের আবদ্ধতা দিয়ে ওদের ঐ মুক্ত বাতাসকে ভারি করে তোলা হয়নি। লোক দেখান মিথ্যা আড়ম্বরেও ওরা নেই। আর এরা? একবার ভেবেও দেখেনা যে কতবড় ঠুনকো জিনিষের ওপরে পাতা ওদের সিংহাসন কিছুই নেই। যতক্ষণ এই জিম্মাদারীর নোকরী ততক্ষণই এই জমজমাটি। তারপর বাদশাহের হুকুম-নামা নিয়ে আর একজন জিম্মাদার এলেই ফুৎকারে নিভে যাবে সমস্ত রোশনাই। ধ্যেৎ, আর ভাল লাগছে না এখানে। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে চোখ পড়ে ওয়াহিদার দিকে। স্থির দৃষ্টিতে তারই মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মেজাজের সুরটা আবার একটু চড়ে যায়।

"কি দেখছিস্ ?"

দবীরের গলার স্বরে ঈষৎ কাঠিন্য প্রকাশ পেলেও তা গায়ে মাখে না ওয়াহিদা।

"মালিক সাঁতার জানেন ?" মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করে সে। "ভরা দরিয়ায় সাঁতার দিয়ে দেখেছেন কখনও ?"

অসহ্য! নাসীনারও অনেক রকম দোষ ছিল। কোথায় কি ঘটছে সেদিকে ছিল তার প্রখর দৃষ্টি। আর সেই খবরগুলি সে ফিসফিসিয়ে বেড়াত সকলের কানে কানে। মালিকা আর তাজ খাঁ সম্বন্ধেও ঐ রকম এক ঘটনার কথা বলেছিল তার আম্মাজানের কাছে। ইচ্ছা না থাকলেও শুনে ফেলেছিল সে। আর তারপরই ছুটে গিয়েছিল মায়ের ঘরে ঐ বাঁদীটিকে উচিত শিক্ষা দেবে বলে। কিন্তু কিছুই করতে হয়নি তাকে। তার মা বেশ শান্তভাবেই কাজ থেকে ইস্তফা দিয়ে দিয়েছিল তাকে।

কিন্তু সে ছিল এক রকম। আর এই ওয়াহিদা ? কি যে ও চায় ঠিক বোঝা যায় না। কোথা থেকে এত সাহসই বা পেল সে ? ভাবতে ভাবতেই আবার অন্যমনস্ক হ'য়ে যায় দবীর। ওধারে যে উত্তেজনাটা লক্ষ্য করেছিল সে তার প্রকৃত কারণটি এখনও জানা হ'ল না ত' ! তাড়াতাড়ি আবার ওধারের প্রাঙ্গনের দিকে চলে সে।

ফাঁকা প্রাঙ্গনের ওপরে এসে দাঁড়ায় দবীর। মীর আহ্মদ, মীর দাদ আর ওধারের সিপাহ্ কয়জন নেই। কোথায় চলে গিয়েছে তারা। অতএব জানবারও উপায় নেই, কি এমন বিশেষ ঘটনা ঘটেছে এই চুণারের বুকে যার জন্যে দু'জন নায়েবে-সিপাহ্শালারকে সিপাহ্ নিয়ে ছুটতে হয়েছে। চিন্তা-উর্ণনাভটা ব্যর্থভাবে তার জাল বুনবার চেষ্টা করে চলেছে। পারছে না। অবস্থান ক্ষেত্রটি ছাড়া

আর সবদিকেই এক বিরাট শূন্যতা। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলতে থাকে সে। জেগে উঠেছে দুর্গ। দুর্গমধ্যে অবস্থানকারী সিপাহ্‌রা তাদের নিত্যকর্মে ব্যস্ত। একটু অবাক হয় তারা তাদের প্রভু-পুত্রকে এধারে আসতে দেখে। এ যেন এক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে গেল আজ। দুর্গের দক্ষিণাংশে বড় একটা যায় না দবীর। ভাল লাগে না তার। হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায় সে। তারপরই ঘুরে দাঁড়িয়ে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে যেতে থাকে দুর্গের প্রবেশ পথের দিকে।

আব্বাস খাঁর বাড়ীর সামনে এসে যখন দাঁড়ায় দবীর তখন রোদের গায়ে আঁচ ধরেছে। বাড়ীর পাশেই বট গাছটার গায়ে টিয়া আর চন্দনার কুজন-কোলাহল। বারান্দার ওপরেই দাঁড়িয়েছিল আব্বাস খাঁ। দবীরকে আসতে দেখে অর্দ্ধোচ্চারিত আহ্বান জানায়, "এস দবীর।" এতদূর থেকে সে শব্দ স্পষ্ট শুনতে পায় না বটে দবীর কিন্তু সেটা যে প্রত্যাখ্যান নয় তা বেশ বুঝতে পারে। তাহ'লেই হ'ল। নিজেরও মনের এমন অবস্থা যে একটু আশ্রয় না হলে আর চলছে না তার।

এগিয়ে এসে দাঁড়ায় আব্বাস খাঁর সামনে।

"শুনেছ সব ?" জিজ্ঞাসা করে সিপাহ্‌শালার।

"কিছুই না।" ক্ষুব্ধ স্বর দবীরের।

"বলবেও না। আমি জানতাম। আমাদের নসীবের খুঁটি নড়ে উঠেছে।"

"ঘটনাটা কি ?"

"ঘটনা যে কি ঠিক জানি না। তবে এইটুকু শুনেছি যে ইশাক আহত হয়েছে। এবং আততায়ী হচ্ছেন পর্বতের গুহায় যে ব্রহ্মচারী থাকেন, তিনি।"

"হঠাৎ ?"

"কি ক'রে বলব, বল ? যে সিপাহ্‌টি খবর দিয়ে গেল সে তো

পুরোপুরি কিছুই বলতে পারল না। শুধু শেষকালে বলল যে মীর আহ্‌মদ আর মীর দাদ কয়েকজন সিপাহ্ নিয়ে গিয়েছে ব্রহ্মচারীকে ধরে আনতে।" কথা শেষ করেই হঠাৎ প্রশ্ন করে আব্বাস খাঁ, "তোমার আব্বাজানের মতামত কিছু জান?"

ভালভাবেই জানে দবীর। কিন্তু সে কথা বলবার নয়। তাই উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে, "আপনি এখন কি করবেন?"

"আমিনার সাদী পর্যন্ত," বলেই থেমে যায় আব্বাস খাঁ, স্থির দৃষ্টিতে দবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, "তোমার বোধহয় দিল্লীর দববারে গিয়ে কোন কাজ নেওয়াই ভাল হবে দবীর। যদি যাও, আমিও কিছু সাহায্য করতে পারি।"

"কেমন করে? ইব্রাহিম লোদী আপনাকে চিনতেন। কিন্তু বাদশাহ্ বাবরতো আপনাকে চেনেন না।"

"তা চেনেন না। কিন্তু দিল্লীর এক বিশিষ্ট ব্যক্তি, উম্‌রাহ্ আজম আলী আমাকে চেনেন। যাবে তুমি?"

"যাওয়াই উচিত। তবুও কয়েকটা দিন চিন্তা করে নিই। চলি এখন।"

মাথার ভেতরে এক চিন্তা নিয়ে এখানে এসেছিল। যাবার সময়ে আর এক চিন্তা নিয়ে ফেরে দবীর।

চিন্তার কারণটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে শের খাঁর। কে যে মন্ত্রণা দিচ্ছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না অথচ প্রতিটি কাজেই কিছু না কিছু প্রতিবন্ধকতা এসে উপস্থিত হচ্ছে। এবং সেটা আসছে জালাল খাঁএর আম্মাজানের কাছ থেকে। যাকে অমান্য করতে পারছে না সে, আবার অন্তর থেকে মেনে নিতেও পারছে না। পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরেই বিশেষ অনুরোধ করেন তিনি।

প্রতিনিরত করেন শেরকে তার আরব্ধ কাজ থেকে। সেই রকমই একটি ঘটনা সম্প্রতি ঘটে গিয়েছে। শের খাঁর দূরদৃষ্টি বলে সিপাহ্‌দের কুচ্‌ করবার জন্যে সিধা সড়ক চাই। এর অভাব মানেই প্রকৃষ্ট সময় এবং সুযোগ হারানো। তাই সড়ক নির্মাণ আরম্ভও করেছিল সে। দ্রুত এগিয়েও গিয়েছিল সেই নির্মাণকাজ। শোন্ নদীকে পূর্বে রেখে সোজা উত্তরমুখী সেই সড়ক গিয়ে পৌঁচেছিল আরা'র কাছাকাছি। এমন সময় এসে গেল সেই চিরাচরিত প্রতিবন্ধকতা।

পর্দার আড়াল থেকে এল এক বিশেষ অনুরোধ, "আপনার জায়গীরের সীমানার বাইরে সড়কটা এসে পৌঁচেছে। এতে অসন্তুষ্ট হ'য়ে উঠেছে অনেকে। অনেক কথা বলাবলিও করছে। তাই আমার অনুরোধ, আপনি বাদশাহের হুকুম নিয়ে এসে সড়কটা নির্মাণ করে ফেলুন। তাহ'লে কেউ আর কিছু বলতে পারবে না। আশা করি, আপনি কিছু মনে করবেন না।"

মনে করলেও বলবার কিছু নেই। বুঝতে পারে শের খাঁ, তার প্রতিটি কাজের ওপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রয়েছে কিছু সংখ্যক লোকের। অনুমানও করতে পারে তাদের কয়েকজনকে। কিন্তু এখুনি, এই মুহূর্তে তাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় না সে। তার পূর্বে নিজেকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে।

সেই চিন্তাই করছিল শের খাঁ, এমন সময় তার খাস নোকর এসে খবর দেয় একজন লোক এসেছে দেখা করতে। একজন নয়, তিনজনের আসবার কথা আছে। প্রত্যেকেই তারা আসবে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢেকে। চিন্তা করে শের খাঁ, তাদের ভেতরে কে আসতে পারে এসময়ে। নিশ্চয় রসদ্‌দার সৈফুদ্দীন। পূর্বাহ্নেই কাজ সেরে যেতে চায়। কথাটা মনে হ'তেই দীর্ঘগুম্ফের আড়ালে একটুকরো হাসির রেখা ফুটে ওঠে তার। আওরতে অরুচি নেই

সৈফুদ্দীনের। নিজের তিনটি বেগম থাকা সত্ত্বেও উপরন্তু কিছু তার চাই-ই। শতেক কাজ হাতে থাকলেও তার ভেতর থেকে একটু সময় সে এই 'উপ'টির জন্যে করে নেবেই। বললে হাসে হ্যা হ্যা করে। বলে—জনাব, মেজাজ শরিফ রাখবার ঐতো একমাত্র জায়গা। বাড়ীতে কি আব মেজাজ ঠিক থাকে? সেখানেত' শুধু ঝগড়া আর আর অশান্তি। আর খুব বাড়াবাড়ি হ'লে ধরে পিটুনি।

এ হেন মরদ সৈফুদ্দীন যে সকলের আগে এসে কাজের কথা সেরে যাবে সেটাই স্বাভাবিক। তা সে যেই আগে আসুক, কাজের কথা বলবার জন্যে যখন ডেকেছে তখন পরে আসতে বলা চলবে না। নোকরকে ইঙ্গিতে জানায় লোকটিকে পাঠিয়ে দিতে।

কিন্তু যে লোকটি এসে ঘরে ঢোকে তাকে দেখে একটু অবাকই হয়ে যায় শের খাঁ। অপরিচিত দীর্ঘদেহী একটি পুরুষ। ছাঁটা গোঁফ দাড়িতে মুখভাবকে কঠিনতর করে তুলেছে। চোখের দৃষ্টি শস্ত্র-ব্যবসায়ীর মতই সতত সতর্ক। দীর্ঘ একটি কুর্ণিশ করে লোকটি বলে—"জনাবের সঙ্গে কিছু গোপনীয় কথা ছিল।"

"নাম, মোকাম না জানলেত' কথা বলতে অসুবিধা হবে।"

"নাম ইশাক। আসছি—"

"বলতে হবে না। চুণার একটি রক্ষিত অঞ্চল। স্বয়ং বাদশাহের অধীন।"

"জনাব সবই জানেন।" উত্তর দেয় ইশাক, "কিন্তু আমার মনে হয় জনাবের শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্যে চুণারের মত দুর্গের প্রয়োজন।"

"কেবলমাত্র দুর্গ হলেত' হবে না। তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে যথেষ্ট সিপাহ্ আর অর্থও চাই।"

"হয়ত' তারও অভাব হবে না।"

"কি রকম?"

"আমার খবর যদি ঠিক হয় তাহ'লে বলতে পারি ঐ দুর্গের কোথাও না কোথাও প্রচুর ধনরত্ন আছে।"

"আরও খবর নেবার চেষ্টা কর।" বলে উঠে দাঁড়ায় শের খাঁ। একটা থলিতে কিছু আসরফি নিয়ে এসে দিতে যায় ইশাককে। কুর্ণিশ করে তা বিশেষ বিনয়ের সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করে ইশাক।

"আসরফির লোভে এতদূর ছুটে আসিনি জনাব। আমার লোভ আরও বড়। সময়ে বলব। আর একটা কথা জনাব, হিন্দুদের আবার মাথা তুলে দাঁড়াবার ইচ্ছা দেখা যাচ্ছে।"

"সম্ভব নয়। সময়, শক্তি, অর্থ, কোনটাই তাদের অনুকূল নয়।"

"তাহ'লে আর বিশেষ কিছু বলবার নেই আমার। তবে সাসারাম থেকে একটা সড়ক যদি চুণারের দিকেও তৈরী হ'ত তাহলে বোধহয় যাতায়াত আরও সহজ হ'ত।"

"মনে থাকবে কথাটা।"

"তাহ'লে আসি জনাব।"

আর একদফা কুর্ণিশ জানিয়ে বিদায় নেয় ইশাক। শের খাঁর মাথায় তখন ইশাকের একটি কথাই পাক খেয়ে ফিরছে—চুণার দুর্গের কোথাও না কোথাও প্রচুর ধনরত্ন আছে।

কামনার তৃষ্ণা যেন কিছুতেই আর মিটতে চায় না! দুর্গের এই চৌহদ্দীর ভেতরে যেমন আছে আগ তেমনি তার নজদিকেই আছে পানি। কিন্তু সে পানি যে এখানে প্রবেশের পথ পায় না। দুর্ভেদ্য এক পাষাণ প্রাচীর মাঝখানে। দবীরের সংযমী মন। মাঝে মাঝে ওয়াহিদার ওপরে খিঁচিয়ে ওঠে মালিকা—"তোকে এবার বরখাস্ত্ করব।"

তসলিম জানায় বাঁদী। বলে, "বরখাস্ত্ করলে নোক্‌রী যাবে কিন্তু আমি আবার মালিকানের কাছে দরখাস্ত্ করব।"

"কেন?"

"মালিকানের মনের শান্তি না দেখলে যে আমি স্বস্তি পাবনা।"

"তোর কপালে পয়জার আছে।"

"পয়জারইতো বখসিস্ আনে।"

নাঃ, এ বাঁদীর সঙ্গে কথা বলে পারবার উপায় নেই। গির্দায় গা এলিয়ে দেয় মালিকা। বলে, "দেখে আয়তো কি করছে।"

"দেখেছি। আসমানের তারা গুণছে।"

"এই দিনের বেলায়?" কৌতূহলের ঠেলা খেয়ে উঠে বসে মালিকা, ঝুঁকে পড়ে বাঁদীর দিকে, "মহব্বৎ হয়েছে নাকি কারও সঙ্গে?"

"হয়নি। তার আগের লক্ষণ। চারদিক ফাঁকা, বড় একা একা মনে হয়।"

কথাগুলি অভিনয়ের সঙ্গে এমনভাবে বলে ওয়াহিদা যে হেসে গড়িয়ে পড়ে মালিকা। হাসতে হাসতেই বলে, "সত্যি, যা না, একবারটি দেখে আয় না।"

"যাই।" উঠে যায় ওয়াহিদা।

মালিকাও ওঠে। প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে দুই নারী একাকী থাকলে যে অসম্বৃত ভাবটুকু থেকে যায়, তাড়াতাড়ি তার সংশোধনে মনে দেয় সে। বলাত' যায় না, যদি ওয়াহিদার সঙ্গে এসে উপস্থিত হয় মানুষটি। শিসার বুকে মুখখানি একবার দেখে নেয়। বেকায়দা শোওয়ায় একটু পাশে সরে যাওয়া কাঁচুলিটি টেনে ঠিক করে দেয়। দেখে নেয় তার উরসিজাগ্রভাগ ঠিক ফুটে উঠেছে কিনা। পায়ের গুল্‌ফে আঘাত করে দেখে গুঞ্জরিপঞ্চমে ঠিক বোল উঠছেত'! তারপর ওড়নাটি মাথার ওপর দিয়ে এমনভাবে ফেলে যাতে যত

না লজ্জা তার চাইতে বেশি যেন সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। তাবপর অপেক্ষায় থাকে কখন ফিরে আসবে বাঁদী তার কামনার মানুষটিকে সঙ্গে করে।

কিন্তু একটু একটু ক'রে সময়ই কেটে যেতে থাকে শুধু। ফিরে আসে না ওয়াহিদা। ব্যর্থতার আক্রোশে ক্রমেই রক্তিম হ'য়ে উঠতে থাকে নয়া বেগমের গণ্ডদেশ। শুভ্র বদনে প্রকাশ পায় কাঠিন্যের লক্ষণ। ওড়নাটি ছুঁড়ে ফেলে দেয় দূরে। দামী পহ্‌রাণটা পড়্‌পড়্‌ ক'বে টেনে ছিঁড়ে নামায়। স্তনাবরণেব আড়ালে উন্নত বক্ষ দুটি ঘন ঘন ওঠা নামা করতে থাকে। খেয়াল নেই তার যে নিজেকে পরিপূর্ণভাবেই বে-আবরু ক'রে ফেলেছে সে। সেই অবস্থাতেই বসে পড়ে পায়ের গুজরিপঞ্চম খোলবাব চেষ্টা করতে থাকে। এময় সময় দরজাব বাইরে কার হাসির খিল্‌খিল্‌ শব্দ শুনে চম্‌কে তাকায় সে। দেখে অন্দরে প্রবেশ করতে গিয়েই চলে যাবাব জন্যে পা বাড়িয়েছে দবীর। মরিয়া হ'য়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় মালিকা। ছুটে গিয়ে দু'হাতে জাপটে ধরে দবীরকে। কামনার আবেগে কান্না-জড়ান গলায় বলে ওঠে, "না, যাবে না তুমি।"

"ছিঃ। একি করছেন আপনি?" মুখ না ফিরিয়েই বলে ওঠে দবীর, "আমাকে ছেড়ে দিন, আমি যাই।"

"না, কিছুতেই ছাড়ব না," দবীরের পিঠের সঙ্গে মুখ ঘষতে থাকে মালিকা, "কেন তুমি সেদিন আমাকে জোর করে নিজের করে নাওনি, তাহলেত' এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হ'ত না আমাকে? আমি তৃষ্ণার্ত্ত দবীর, আমার পিয়াস তুমি মেটাও। আমার যা আছে, সব তোমাকে দেব। তোমাকে এই চুণারের জায়গীরদার বানাব। বিনিময়ে কেবলমাত্র তোমার একটু মহব্বৎ—তাকাও না, তাকাও—" বলে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে দবীরের মুখখানি নিজের দিকে

ফেরাবার চেষ্টা করে সে।

এতক্ষণ পর্যন্ত তবু সহ্য করেছিল দবীর। কিন্তু এবারে আর পেরে ওঠে না সে। এক ঝট্‌কায় নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বলে, "আমার দুর্ভাগ্য যে আপনার মত একটি কদর্য চরিত্রের আওরৎকে বেগম বানিয়েছেন আব্বাজান। আমার হাজার কুর্ণিশ রইল এখানে, আর কোনদিন ডাকবেন না আমাকে।"

হন্ হন্ ক'রে চলে যায় দবীর। একবার ফিরে তাকিয়েও দেখে না যে ক্ষণপূর্বের কামিনী একমুহূর্ত্তে সাপিনীতে পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে। দু'চোখের দৃষ্টিতে তার শুধুই হলাহল।

কার্যের সফলতায় শরীরের সমস্ত ক্লান্তি এক মুহূর্ত্তে দূরীভূত হয় আর বিফলতায় তা গজদেহ পরিমাণ ভার নিয়ে চেপে বসে মনের ওপরে। সেই অবস্থাই ব্রহ্মচারীর। যমুনার পশ্চিম উপকূল ধরে দিনের পর দিন এগিয়ে গিয়েছেন। পূর্ব উপকূলের এলাহাবাদ আগ্রাকে তাঁর ভয়। এইসব সহরের ওপর দিয়ে বিজয় অভিযানে ছুটে গিয়েছে সুলতান, বাদশাহেরা। আর অভিযান শেষে ফিরে এসে বিশ্রামও করেছে এইসব সহরে। ফলে এগুলি হয়ে উঠেছে প্রধাণতঃ মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল। তাই এইসব অঞ্চলকে সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন ব্রহ্মচারী। কেননা পদব্রজে চলা মানুষের খবর আসওয়ারের মুখে হয়ত পূর্বাহ্ণেই পৌঁছে গিয়েছে এইসব জায়গায়। এবং বিপদ তার বর্শা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই উদ্ধত কাফেরকে সমুচিত শাস্তি দেবার আশায়। ব্রহ্মচারী তাই যমুনার পশ্চিম উপকূলকেই নিরাপদ বলে মেনে নিয়েছিলেন। আরও একটা কারণ ছিল তার। এই দেহাতী হিন্দু বাসীন্দাদের যদি এক সূত্রে গেঁথে তোলা যায়, যদি গড়া যায় একটি সবল দল, তাহ'লে যমুনার

পশ্চিম উপকূল থেকে আরম্ভ ক'রে এক বিস্তীর্ণ হিন্দু অধ্যুষিত ভূখণ্ড রাজস্থানের সঙ্গে যুক্ত করে বাদশাহের সম-শক্তি রাজ্য গঠন আবার সম্ভব করা যেতে পারে। কিন্তু কয়েকটা দিন বৃথাই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ালেন তিনি। ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি এমনভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে যে বৃহৎ স্বার্থের কথা চিন্তাই করতে পারে না তারা। এ যেন মাটির দোষ। একে অপ যকে সহ্য করতে পারে না। যার জন্যে ভগবান তথাগতকেও একদিন বলতে হয়েছিল—সহাবস্থান শিক্ষা কর। শান্তি আন। তবুও পারেনি কেউ। 'পারবেও না কেউ', ব্রহ্মচারীর কথা শুনতে শুনতে বলে উঠেছিল বৃদ্ধ গ্রাম-প্রধান হরবন্‌স্‌, "এরা পরের কাছে মাথা নীচু করবার লোভে নিজেব ভাইএর বুকে ছুরি বসায়। এদের কাছ থেকে কি আশা করবি বাবা? অথচ ওদের মধ্যে দেখ আফগান, তুর্কী, মোগল, পাঠান কত কিসিম রয়েছে, কিন্তু যেই এক হিন্দু রাজার সঙ্গে লড়াই বাধল অমনি সব একাট্টা হ'য়ে গেল।"

কথা বলতে বলতে বৃদ্ধের তামাক-পাতা চিবোন মুখে জল এসে গিয়েছিল। প্যাচ্‌ ক'রে সেটা দূরে নিক্ষেপ করে আবার বলতে থাকে, "যা না, একজনকে বল মদৎ দিতে, সে অমনি বলবে—ঠিক আছে, আমি যে হররোজ যমুনার উস্‌পারে বিশ ঢেবুয়ার আনাজ বেচে আসি, সেটা তুমি মোলে লাও।"

মিথ্যা বলেনি হরবন্‌স্‌। অর্থ-স্বার্থ আজ দেশের স্বার্থের চাইতেও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কি, না দুটো গাই ছিল, তিনটে হবে, পায়ে ভঁইষের চামড়ার পয়জার হবে, লোকে বলবে অমুকে বড়লোক হয়েছে। এতেই খুশি সে। এর বেশি কিছু ভাবতে চায় না, বুঝতে তো চায়-ই না।

অতএব আর বৃথা কাল হরণ না ক'রে আবার উত্তরমুখী হন ব্রহ্মচারী। ভারাক্রান্ত মন। কিছুই হল না, কিছু হওয়ারও নয়।

ভারতবর্ষের ভাগ্যের আকাশে কালি ছিটিয়ে দিয়েছে জয়চাঁদ। এ কালি আর উঠবার নয়।

শ্লথগতি, ভারাক্রান্ত দেহ মন নিয়ে একসময়ে দিল্লীর মাটিতে গিয়ে পা দেন ব্রহ্মচারী। চলতে থাকেন চকএর দিকে। কৈরালা প্রসাদকে তাঁর দরকার। কিন্তু পথ কি ভুল হচ্ছে তাঁর? স্মৃতির নক্সার সঙ্গে ঠিক যেন মিল খাচ্ছে না এর রাস্তাঘাট। কমদিনের কথা নয়, প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে একবার এই দিল্লীতে আসবার প্রয়োজন হয়েছিল তাঁর। হ্যাঁ, তা বিশ বৎসর হবে বৈকি। সিকান্দর লোদী তখন দিল্লীর সিংহাসনের মালিক। বিদ্বান ও গুণী জনের সমাদর কর্ত্তা, আগ্রা সহরের প্রতিষ্ঠাতা সিকান্দর। নাম শুনে তাকে মনের উচ্চ আসনেই বসিয়েছিলেন ব্রহ্মচারী। কিন্তু হোঁচট খেয়েছিলেন রাজধানীতে গিয়ে। বস্ত্র ব্যবসায়ী হরদেও প্রসাদের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারই পুত্র কৈরালাপ্রসাদ। প্রায় সমবয়সী দু'জনে। মিলও হয়ে গিয়েছিল দু'জনের অতি সহজেই। সেদিন কৈরালার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে যমুনার ধারে চলে গিয়েছিলেন ব্রহ্মচারী। যমুনার নীলজল আকর্ষণ করেছিল তাঁকে। আসবার সময়েও দেখেছিলেন। স্নান এবং পান উভয়ের জন্যেই ছিল যমুনা। সেই নীল জল দেখে আবার অবগাহন স্পৃহা জেগে ওঠে তাঁর। কিন্তু সে কথা কৈরালাকে বলতেই চম্‌কে উঠেছিল সে। চোখদুটি বড় বড় করে বলেছিল—"খবরদার, যমুনার জলে ভুলেও নেম না।"

"কেন?" আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন ব্রহ্মচারী, "আসবার সময়েত' নেমেছি।"

"কোনও মুসলমান সে সময়ে তোমাকে দেখতে পায়নি বলেই বেঁচে গিয়েছ।" বলেই গলা নামিয়ে নিয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ করে

বলেছিল, "সিকান্দর লোদী ভীষণ হিন্দু বিদ্বেষী। হিন্দুরা যমুনার জলকে পবিত্র বলে ভাবে। তাই তাঁর হুকুম, কোন হিন্দু যমুনার জলে নামতে পারবে না।"

সেই সিকান্দর লোদীর ইন্‌তকাল হয়েছে। তাও সে অনেক বছরই হ'ল। তারপর সিংহাসনে বসলেন তাঁর পুত্র ইব্রাহিম লোদী। আর তিনিই সমূলে উৎপাটিত করলেন ব্রহ্মচারীকে। বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতই এসে পড়েছিল সে হুকুম আর তার সঙ্গে সুলতানের সিপাহ্। আজ কত বৎসর হয়ে গেল! একটা টানা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ব্রহ্মচারী। সঙ্গে সঙ্গে সুদূর অতীত থেকে আবার বাস্তবের দিল্লীতে ফিরে আসেন তিনি। নূতন নূতন সরণি আর গলির ধাঁধার ভেতরে একটি পুরাতন রাস্তার নিশানা খুঁজতে থাকেন।

রাস্তা নয়, স্বয়ং কৈরালা প্রাসাদেরই দেখা মিলে যায়। বয়স কিছু মেদ সঞ্চয় করিয়ে দিয়েছে দেহে। কাকপক্ষ দুটির পাশে ঈষৎ শ্বেতরেখা। তাহলেও চিনতে কষ্ট হয় না ব্রহ্মচারীর। হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে গিয়ে চলমান দেহটির সামনে দাঁড়ান। থম্‌কে দাঁড়িয়ে যায় কৈরালা।

"চিনতে পার?" একমুখ হেসে জিজ্ঞাসা করেন ব্রহ্মচারী।

একটু সময় নেয় কৈরালা স্মৃতির পৃষ্ঠাখানি ধূলোঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে নিতে। তারপরই দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার একদার বন্ধুকে।

"কবে এলে?" জিজ্ঞাসা করে কৈরালা।

"এই আসছি।"

"এই আসছ?" বলে কি যেন চিন্তা করে কৈরালা, অস্ফুটে বলে, "দোকানে একটু কাজ ছিল—"তারপরই মনস্থির করে ফেলে বলে, "তাহ'ক, চল, তোমার স্নানাহারের ব্যবস্থা করে আসি আগে।"

আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়ীর দিকে চলতে থাকে কৈরালা।

কৈরালা নয়, মূল ব্যবসার চাবিকাঠি এখনও হরদেও প্রসাদের হাতে। ছেলে বসে গদিতে। কিন্তু আসল ব্যবসার স্থানগুলিতে এখনও হরদেওকেই যেতে হয়।

আমীর, ওম্‌রাহ্‌, জ্ঞানী, গুণীদের হাভেলীতে। ক্রেতাতো প্রকৃতপক্ষে তারাই। আর হরদেও জানে আসর বুঝে সুর ধরতে, মন বুঝে কথা। ব্যবসার মূলমন্ত্র। আসরই যদি জমল তাহ'লে কার্যসিদ্ধির আর বাকী থাকল কি? কর্ণসুবর্ণের রেশম তখন মসলিনের নামে কেটে যায়। কিন্তু তা কখনও করেনা হরদেও। গাছ কেটে ফল খায় না সে। মরশুমে মরশুমে গাছে ঝাঁকি দিয়ে ফল পাড়ে। এই সব কারণে মুসলিম রাজত্বকালেও সে সমাদৃত।

কথাটা শেষ পর্যন্ত সেই হরদেও প্রসাদের কাছেই পাড়তে হয় ব্রহ্মচারীকে। প্রস্তাব শুনে কিছুক্ষণ পর্যন্ত কোনও কথা বলে না বৃদ্ধ ব্যবসায়ী। বাদশাহের সঙ্গে শুধু দেখা করা নয়, গোপনে দু'চারটে কথা বলবারও সুযোগ করে দিতে হবে। চিন্তার কথা বৈকি। বিশেষ ক'রে ১৫২৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন বাদশাহ্‌ তাতে করে হিন্দুদের তিনি বিশেষ সন্দেহের চোখেই দেখেন। সে কাহিনী শুনেছে হরদেও প্রসাদ। বাদশাহের বিরুদ্ধে রাণা সংগ্রাম সিংহের সেই বিরাট অভিযানের কথা। রাজস্থানের সমস্ত হিন্দু যেন কাঁধে কাঁধ দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল খানুয়ার ময়দানে। সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছিল সুলতান সিকান্দর লোদীর এক পুত্র মাহ্‌মুদ লোদী। বিপুল সে সৈন্য বাহিনী দেখে নিজেকে কেমন দুর্বল বোধ করেছিলেন বাবর। সুদূর ফরগণা থেকে একের পর এক কাবুল, লাহোর, সম্পূর্ণ পাঞ্জাব ও পরে দিল্লীর সুলতানকে জয় করবার পথে যার মনে এতটুকু কিন্তু-ভাব জাগেনি, আজ তারই চোখে কিনা আশঙ্কার ভাব, মনে দ্বিধা। না, সে দ্বিধা-ভাব স্থায়ী হয়নি। ভয় তাঁর জন্যে নয়। উন্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে

পড়েছিলেন ঐ বিপুল বাহিনীর ওপরে। ছিল রণ-কৌশল আর ছিল উস্তাদ আলী ও মুস্তাফা। বাদশাহের তুই হস্ত যেন তারা। গোলন্দাজ বাহিনীর তুই নায়ক।

পারেননি সংগ্রাম সিংহ। রাজস্থানের ঘরে ঘরে কান্নার রোল তুলেও শেষরক্ষা করতে সক্ষম হননি। আহত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু বাবর জানেন খানুয়ার যুদ্ধে প্রকৃত যুদ্ধ যদি কেউ করে থাকে, সে হচ্ছে তাঁর কামান। বাহুবলকে তুচ্ছ করে দিয়েছিল যন্ত্রশক্তি। আজও ভুলতে পারেননি সে কথা। হাস্য পরিহাসের ভেতর থেকে কখন কখন ছিট্‌কে আসে বিহ্বলকারী সেই স্মৃতির টুকরো কথা। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে হিন্দুস্তানের এই হিন্দুদের সংঘ-শক্তিকে তুচ্ছ করবার মত মনোবল আর পেতেন না বাবর। যারা এক কথায় চিতোর, আজমীড়, গোয়ালিয়র, চন্দৌসী প্রভৃতি রাজ্যকে টেনে নিয়ে এসে নামাতে পারে যুদ্ধের প্রাঙ্গনে, তারা অবহেলার নয়।

আর সেইখানেই কিনা যেতে চান ব্রহ্মচারী! চিন্তায় পড়ে যায় হরদেও প্রসাদ। দিল্লীর তা'বড় তা'বড় জান পহ্‌ছান্‌ আদমীর মুখগুলি চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যায় তার। হঠাৎ থেমে যায় একটি মুখ। দাঁত বের করে হাসছে যেন হরদেওএর দিকে তাকিয়ে। গুলাম আশ্‌না। নিজেই নিজের নামকরণ করেছে। প্রথম যেদিন হরদেওএর দোকানে আসে সেদিন ওর নাম শুনে চমকে গিয়েছিল সে। 'একি নামরে বাবা! একে গোলাম তার ওপরে আবার অবৈধ প্রেমিক! হরদেও এর চম্‌কানি দেখে হেসেছিল গুলাম আশ্‌না। বলেছিল, "যে নাম আমাকে খেতে দেয়, সেই নামই ভাল। আব্বাজানত' ছেলেকে বানিয়েছিল আমীর, কিন্তু তু'বেলা রুটি দূরের কথা একমুঠো চনক্‌ও জুটতনা। জীবনে ঘেসেড়া থেকে আরম্ভ করে সব কাজই করেছি। অবশ্য ছোট কাজ।

করেছি আর মনে মনে হেসেছি নিজের আখিরের কথা ভেবে। তারপর হঠাৎ একদিন আখির পালটে গেল।"

"কি রকম?" জিজ্ঞাসা করেছিল হরদেও।

"তখন আফগান লড়াইএ চলেছিলেন বাদশাহ্। সিপাহ্‌রা কুচ্ করবে। এমন সময় কয়েকজন সিপাহ্ চেপে ধরল আমাকে —চল্ আমাদের সঙ্গে। নাচ গান করবি, গপ্ বানাবি। আমরা তোকে খেতে দেব। বাস্, চললাম তাদের সঙ্গে। একটা বরবাদী ঘোড়া ছিল, তারই পিঠে চড়ে। যাই আর মজার মজার কথা বলে সিপাহ্‌দের হাসাই। সব গপ্ই আশ্‌নাইএর। আমিও সেই সময় আব্বাজানের দেওয়া নামটা বদলে নিজের নাম রাখলাম গুলাম আশ্‌না। ক্রমে বাদশাহ্ও শুনলেন আমার নাম। তলব করলেন সেখানেও জমাটি গপ্ শোনালাম। বাদশাহ্ খুশী। আমারও হিল্লে হ'য়ে গেল।"

এই হ'ল গুলাম আশ্‌নার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ইতিহাস। কিন্তু এছাড়া আরও কিছু আছে তার চরিত্রে। কোনও প্রকার কুটিলতার ভেতরে সে নেই। সহজ সরল মানুষ। তাই ভালবাসাও সে অর্জন করেছে সকলের। বাদশাহেরও বিশেষ স্নেহের পাত্র।

সেই গুলাম আশ্‌নার কথা মনে পড়তে একটা যেন পথের রেখা দেখতে পায় হরদেও প্রসাদ। ঐ মানুষটি ইচ্ছা করলে নয়কে হয় করতে পারে।

"তাহলে আজ বিকেলে একবার বেরুতে হয় আমাকে," ব্রহ্মচারীর প্রস্তাবের উত্তর দেয় হরদেও প্রসাদ, "দেখি, কোনও রাস্তা মেলে কিনা।"

প্রস্তাব শুনেই রেগে উঠেছিল গুলাম আশ না। তার সদা-হাস্যময়

মুখখানাকে গম্ভীর ক'রে বলেছিল, "দেখ, এই দিল্লী সহরের প্রতিটি মোকামে রাজনীতি আর তার প্রতিটি পাথরে রক্তের ছাপ। ও জিনিষ দুটি তোমার মোকামে নেই তাই তোমাকে আমার এত ভাল লাগত।"

"নেই এখনও," তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়েছিল হরদেও প্রসাদ, "আমার বহু পুরানো খরিদ্দার আর খুব ভাল লোক, তাই তার একটা অনুরোধ ফেলতে পারছিনা। তবে এটুকু আমি বলতে পারি যে তিনি লড়াই-সংক্রান্ত কোন কথা বলবেন না। হয়ত' নিজের কোনও প্রয়োজন আছে বাদশাহের কাছে।"

হরদেওএর কথা শুনে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে গুলাম আশ্‌না। হয়ত' তার মুখের ভাষার সঙ্গে অন্তরের ভাষাটি ঠিক মিলছে কিনা তারই হদিস্ করবার চেষ্টা করে। তারপর বলে, "দেখি চেষ্টা করে। তুমি যাও। কাল বিকেলে খবর পাবে।"

আর সে খবর পাঠিয়েও ছিল গুলাম আশ্‌না। বাদশাহ্ পরদিন সকালে দেখা করতে রাজী হ'য়েছেন। খবরটা শুনে অবধি ভেতরে ভেতরে বেশ কিছুটা উত্তেজনা বোধ করেন ব্রহ্মচারী। সুলতানী আমলে যে ভাগ্য বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর, বাদশাহী আমলে তার শেষ হবে কিনা কে জানে। যদি তা নাও হয়, যদি বাদশাহ্ এইটুকু প্রতিশ্রুতি দেন যে তাঁর সাম্রাজ্যের হিন্দু প্রজারা যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে তার ব্যবস্থা তিনি করবেন, তাতেও খুশি তিনি।

রাজধানীর রাত। যে রাজধানীতে ভাগ্যের চাকা অতি দ্রুত ঘোরে। তাই তার বাসীন্দারাও জীবনের এই উপরি পাওনার দিনগুলির এতটুকু সময়ও অপচয় করতে চায় না। চায় না যে, তার সুর রাজধানীর রাত্রির এই মধ্যযামেও ঘরে শুয়ে শুনতে পাচ্ছেন ব্রহ্মচারী। সুর ও যন্ত্রসঙ্গীত। আর মাঝে মাঝে

উচ্ছসিত উল্লাস। উল্লাস, না ডুকরে ওঠা! নিজেদের ভবিষ্যতের ভয়ে। ভাবতে ভাবতে একসময়ে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি।

প্রত্যুষে জাগরণ চিরদিনের অভ্যাস তাঁর। সেদিনও তাই জাগেন। ঘর থেকে বেরুতেই দেখেন হরদেও প্রসাদ যমুনায় স্নান সেরে বাড়ীতে ঢুকছেন।

"স্নান হ'ল ?" জিজ্ঞাসা নয়, স্রেফ সৌজন্য প্রকাশ ব্রহ্মচারীর।

"হ্যাঁ বাবা। সারাদিন ম্লেচ্ছ নিয়ে কারবার। এই স্নানটুকু করলে মনটা শান্তি পায়।" উত্তর দেয় হরদেও প্রসাদ। তারপরই বলে, "তোমাকেওত' এই সকালেই যেতে হবে বাবা। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নাও।"

"হ্যাঁ, এই নিই।" বলে প্রস্তুত হওয়ারই তদ্বিরে লেগে যান ব্রহ্মচারী।

বহুদিন, প্রায় যুগাতীত কালের এক পুরাতন মামলার ফয়সালা করবার সুযোগ এসেছে জীবনে। কি হবে তা জানা নেই তাঁর, ধারণা করবারও ক্ষমতা নেই। কিন্তু সুযোগের অপব্যবহার করা চলবে না। স্নায়ু তাঁর দুর্বল নয় কোনদিনই। বাদশাহের প্রাসাদে প্রবেশ করেও তাই স্থির পদক্ষেপে খোজা প্রহরীর সঙ্গে এগিয়ে চলতে থাকেন। একটি প্রকোষ্ঠের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় প্রহরী। নাম হাঁকে। একটু পরেই বেরিয়ে আসে একজন লোক। পোষাকে উচ্চপদস্থ কর্মচারীর পরিচয় পাওয়া যায়। একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে ব্রহ্মচারীর দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, "কার কাছ থেকে আসছেন ?"

"দোস্ত্ গুলাম আশ্না।" উত্তর দেন ব্রহ্মচারী। 'দোস্ত্' কথাটি বলবার জন্যে সে-ই বলে দিয়েছিল।

"আস্থন।"

পিছন ফিরে ঘরের ভেতরে ঢুকে যায় কর্মচারীটি। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারীও যান। বাইরের আলো থেকে এসে এই প্রায়ান্ধকার কক্ষে প্রথমটা কিছুই দেখতে পান না। তাই দরজার কাছ ছেড়ে বেশীদূর এগিয়েও যান না। দৃষ্টিটা একটু সহজ হ'য়ে এলে সম্মুখদিকে তাকিয়ে দেখেন অদূরেই একটি পালঙ্কের ওপরে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছেন বাদশাহ্ বাবর। পালঙ্কের একপাশে নিশ্চল মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে সেই কর্মচারীটি। সামনেই কয়েক ধাপ সিঁড়ি বুঝতে পারেন ব্রহ্মচারী এটি বাদশাহের তয়খানা। এগিয়ে যান তিনি। তসলিম জানান বাদশাহ্কে।

"বল।" আর্জি পেশ করতে আদেশ করেন বাবর।

"হুজুর মালিক," বলতে আরম্ভ করেন ব্রহ্মচারী, "আপনার অধীনস্থ চুণার দুর্গের কথা নিশ্চয়ই জানেন?"

"জানি," বলেই দণ্ডায়মান কর্মচারীটিকে জিজ্ঞাসা করেন বাবর, "সেখানে জিম্মাদার কে আছে যেন?"

"তাজ খাঁ, জাঁহাপনা।"

বাদশাহের খবর রাখবার কৃতিত্বকে কুর্ণিশ জানান ব্রহ্মচারী, "শাহান্শাহ বাদশাহের খবর সাচ্চা। কিন্তু একটুখানি, গোস্তাকি মাফ করবেন মালিক, অন্যায় আছে এর ভেতরে।"

"অন্যায়?" টগবগিয়ে ওঠে আরবীয় রক্ত। টান্টান্ হ'য়ে বসেন বাদশাহ্।

"গোস্তাকি মাফ হয় মালিক। আপনার পূর্বে সিকান্দার লোদী ও পরে ইব্রাহিম লোদী করেছিলেন সে অন্যায়।"

"কি রকম?"

"চুণার দুর্গের অধিপতি ছিলেন শিবপ্রসাদ আর তিনিই ছিলেন ঐ অঞ্চলের জায়গীরদার। সিকান্দার লোদীর সহ্য হয়নি যে

বিহার অঞ্চলের কাছাকাছি একটি দুর্গ থাকবে একজন হিন্দুর অধীনে। তাই রাতারাতি হুকুম হ'য়ে গেল তাঁর। সুলতানের সিপাহ্ গিয়ে হাজির হ'ল ফরমান নিয়ে। শিবপ্রসাদ হলেন উচ্ছেদ।"

"তারপর ?"

"শিবপ্রসাদ আশা করেছিলেন যে সিকান্দার লোদীর পরে যিনি সুলতান হবেন তিনি হয়ত' সুবিচার করবেন। কিন্তু সে সুবিচার পাওয়া গেল না ইব্রাহিম লোদীর কাছ থেকে। তাজ খান হলেন জায়গীরদার। শোকে দুঃখে শিবপ্রসাদ ও তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন।"

"তবে আর কি। বাদী যখন নেই, মামলাও তখন খতম্।"

"তাঁরা নেই। কিন্তু তাঁদের একমাত্র পুত্র এখনও জীবিত।"

"কোথায় সে ?"

"আপনার সম্মুখে জাঁহাপনা।"

"ও, তাহলে তুমিই জীবন প্রসাদ ? কিন্তু তাজ খাঁত কোনও কসুর করেনি।"

"জাঁহাপনার অধীনে হিন্দু মুসলিম প্রজারা শান্তিতে থাকতে চায়। কিন্তু সেটা বোধ হয় আর সম্ভব হবে না।"

"কেন ?"

"প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় সমর্থন যোগ্য নয়। তার ওপরে সে যদি অপরের শক্তিকেও হস্তগত করবার চেষ্টা করে—"

"কার কথা বলছ ?" ব্রহ্মচারীর কথায় বাধা দেন বাবর।

"শের খাঁ।"

নামোচ্চারণ শেষ হওয়ার পূর্বেই হো হো করে হেসে ওঠেন বাদশাহ্। যেন এমন হাসির কথা আর পূর্বে কখনও শোনেননি তিনি। হাসির ধমক কমতেই বলে ওঠেন, "শেরের কথা বাদ

দিয়ে বল। তাকে তোমার চাইতে ভাল চিনি আমি। তোমার কি চাই তাই বল।"

"আমি চাই শান্তি। জাঁহাপনার রাজত্বে হিন্দু প্রজারাও যাতে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারে তাই আমার একমাত্র আর্জি।"

"যদি না হয়?"

"না হয়, পারে তারা মাথা তুলে দাঁড়াবে, না পারে অত্যাচার সহ্য করবে।"

"বেশ, দেখি চিন্তা করে," বলেই কর্মচারীটিকে হুকুম দেন, "এর থাকবার ব্যবস্থা করে দাও।" তারপর আবার ব্রহ্মচারীর দিকে তাকিয়ে বলেন, "আমার হুকুম ছাড়া দিল্লী ত্যাগ করবে না তুমি।"

এ আদেশের অর্থ যে কি তা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারেন ব্রহ্মচারী। সাশ্চর্যে বলে ওঠেন, "আমাকে বন্দী করলেন জাঁহাপনা?"

"না, বন্দী নয় ঠিক। তবে দিল্লীর বাইরে যেতে হলে আমার অনুমতির প্রয়োজন হবে।"

"বেশ, তাই থাকব। কিন্তু আমার আর্জি?"

"সে দেখব আমি।" বলে কর্মচারীটির দিকে তাকান বাদশাহ্।

ইঙ্গিত বুঝে সে এসে দাঁড়ায় ব্রহ্মচারীর পাশে। ব্রহ্মচারীর মনও এই অন্ধকার মন্ত্রণালয় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ছটফট্ করছিল। অভিবাদন শেষ করে তিনিও যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হন।

মনের ভেতরে তুষের আগুন জ্বালিয়ে এই কয়টি দিন কাটিয়েছে মালিকা। চেয়েছে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠে সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে দিতে। কিন্তু পেরে ওঠেনি। অবলম্বন করবার

মর্ত বস্তুই যে ছিল না হাতের কাছে। আজই তার দিল্লী থেকে ফিরে আসবার কথা। আর এও জানে সে যে আসঙ্গলিপ্সায় অস্থির হয়েই তার কাছে এসে উপস্থিত হবে তাজ খাঁ। নিজের আব্বাজানকে দেখেছিল মালিকা, জীবনের শেষ কয়টিদিন যেন ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠেছিল সে। এমন কি নিজের ছেলেমেয়েদের খাবার চুরি ক'রে খেতেও ইতস্ততঃ করেনি। তাজ খাঁও হয়েছে ঠিক তেমনই। যৌবন উপান্তে এসে সম্ভোগ-স্পৃহা যেন তার শেষ আহার্য গ্রহণের জন্যে সর্বদাই লালায়িত।

তাই চায় মালিকা। নারীত্বের এই শক্তি দিয়েই তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে হবে। দবীরের ঐ উঁচু মাথাটিকে যদি দাবিয়েই না দিতে পারল তা'হলে নারী না হয়ে নপুংসক হওয়াই তার উচিত ছিল।

নিজেকে তাই অপরূপা করে সাজাতে থাকে মালিকা। পাশে বসে সাহায্য করে ওয়াহিদা। এই বাঁদীটিও লক্ষ্য করেছে তার মালিকানের রূপে তীব্রতা বড় জোর। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, দেয়। এ দাবানলকে শেষ করতে হয় জলধি নয়ত' হিমালয়ের চাপ দরকার। কিন্তু সে কথাত' আর সে বাঁদী হয়ে বলতে পারে না। তাই ঠোঁটে ঠোঁট চেপে যা বলে মালিকান তাই করে যায়। তবে হ্যাঁ, ছোট মালিকের ঐ শক্ত সিকিম দোহারা চেহারা—উঃ, মানুষটা যেন পাথরে গড়া। অমন অবস্থায় কোন আওরৎকে যে কোন পুরুষ প্রত্যাখ্যান করতে পারে এ না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। হঠাৎ এই দুইটি নারীর চিন্তায় ছেদ টেনে দেয় হাতীর গলার ঘন্টি। ফিরে এল বুঝি তাজ খাঁ। তাড়াতাড়ি ওড়নাটা ঠিক করে নেয় মালিকা। তারপর বাঁদীকে হুকুম করে, "গোসল-খানায় সব ঠিক আছে কিনা দেখে রাখগে যা।" উঠে যায় ওয়াহিদা। গির্দা হেলান দিয়ে পা দুটি মুড়ে পেছন দিকে রেখে নিজেকে আরও তীক্ষ্ণ আর তীব্র

করে তুলতে চেষ্টা করে মালিকা।

"কেমন আছ নয়া বেগম ?" দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় তাজ খাঁ। সুর্মা আঁকা দুটি চোখে কামনার ইসারা।

"জনাব বহাল তবিয়ৎ ?"

"বহুৎ খুব। একদিন বিশ্রাম নিয়েছি তো মির্জাপুরে।" পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে তাজ খাঁ। মালিকার গায়ের কাছে। একটু সরে বসে মালিকা। চোখের কৃত্রিম ভর্ৎসনা।

"বাঁদী।"

"ও," বলে সরে যায় তাজ খাঁ। তারপরই হন্ হন্ ক'রে গিয়ে ঢোকে গোসল-খানায়। ঢুকেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে যায়। ওয়াহিদা পানিতে খশবু মেশাচ্ছে মালিকের জন্যে। কোঁকড়ান চুল-গুলি গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে নেমে এসেছে। কিছু বা গালের ওপর দিয়ে, কিছু বা ঘাড়ের পাশ দিয়ে ঝুলছে তার কুচযুগকে আড়াল করে। মুহূর্তে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে রক্তের কণিকাগুলি। কার্যাকার্য জ্ঞানকে ছাপিয়ে যায় সেই নিঃশব্দ আহ্বান। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় তাজ খাঁ। বুঝতে পারেনি বুঝি ওয়াহিদা। কিম্বা বুঝেও বোঝে নি। একবার ফিরেও তাকায় না তার মালিকের দিকে। নিষ্পিষ্ট অবস্থায় একবার মাত্র ফিস্ ফিস্ করে বলে, "নয়া বেগম সাহেবা ঘরে রয়েছে।"

"ঘরে নয়, দরজার কাছেই আছি।"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত এক ঝট্‌কায় নিজেকে মুক্ত করে নেয় ওয়াহিদা। দু'হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকে। তাজ খাঁরও দারুভূত অবস্থা। কেবলমাত্র মালিকারই চোখে ক্ষণে ক্ষণে ভাবের পরিবর্তন হ'তে থাকে। রাগ, প্রতিহিংসা, কুটিল রহস্যময়। মহম্মদ নাকি এই গোসল-খানাকেই নরক বলেছিলেন। আজ সেই স্থানটিই বিশিষ্ট হ'য়ে ওঠে মালিকার জীবনে। রহস্যময় হাসিটি মুখে করেই

ফিরে চলে সে নিজের ঘরের দিকে। আর উন্মুক্ত দরজা জুড়ে প্রবল বাধাটি দাঁড়িয়ে নেই দেখে ছুটে পালিয়ে যায় ওয়াহিদা।

গোসল-খানা থেকে বেরিয়ে এসে গদিতে বসে তাজ খাঁ। একটু দূরেই মালিকা বসে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে তার শওহরকে। বুঝতে পারে তাজ খাঁ। কিন্তু আপনা থেকে কোন কথা বলতে পারে না। অপেক্ষায় থাকে, যদি ও-পক্ষ থেকে কোনও কথা বলে।

কিন্তু শুধু সময়ই কেটে যেতে থাকে। নিঃশব্দ প্রতীক্ষা আর সফল হয় না তাজ খাঁর। মনে মনে একটু বিরক্তই হয়ে ওঠে সে। দু'হাতে ভর দিয়ে নেমে পড়তে যায় গদি থেকে।

"কি কথা হ'ল বাদশাহ্‌র সঙ্গে ?"

নামা হয় না। এমন একটা প্রশ্ন শোনবার জন্যে প্রস্তুত ছিল না তাজ খাঁ। আশঙ্কা করেছিল গুরুগর্জন আর বর্ষণের। তার কিছুই না হয়ে এক গুরুভার প্রশ্ন শুধু ? অবাক হ'য়ে এই নহলী যৌবনাটির দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

"খুব অবাক হয়ে যাচ্ছেন, না ?" মুচকে হাসে মালিকা, "বাদশাহ্‌কে দেখবার সৌভাগ্য তো করিনি তাই তাঁর কথা শুনেই সে আশা মেটাতে চাই। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি—" বলেই তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকায় তাজ খাঁর দিকে।

লুকিয়ে নয়, বড়ই স্পষ্ট সে তীক্ষ্ণতা। দুর্গাধিপের দৃষ্টিও এড়ায় না। মনে মনে একটুখানি কেঁপেই ওঠে সে। তারপরই সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে সহজ হ'য়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গেই ঘনিয়ে ওঠে দুটি চোখের দৃষ্টি। নিজের অজান্তেই প্রসারিত হ'য়ে যায় হাত দুটি। মালিকাও ধরা দেয়। আপন দেহখানি টেনে নিয়ে যায় তার বুকের কাছে। সুর্মা আঁকা দুটি চোখ তার চোখের ওপরে রেখে বলে, "আমার নজরানা ?"

"ভুল হয় না কখনও, না ?" খুশিতে ভরপুর তাজ খাঁর কণ্ঠস্বর, "দিল্লী থেকে এনেছি হীরা বসান বাজু-বন্দ্। দাঁড়াও, এখুনি আনছি।"

মনের আবেগে পরিপূর্ণ যুবকের মতই লাফিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তাজ খাঁ। দেখে মনে মনে হাসে মালিকা। পুরুষ শক্তি কি এতই দুর্বল আওরৎদের শক্তির কাছে! তখুনি আবার মিলিয়ে যায় সে হাসির রেখা। নিজেকে ভিখমাঙা তৈরী করেও ত' দুর্বল করতে পারেনি একজনকে। বড় অহঙ্কার দেখিয়ে হাজারো কুর্ণিশ রেখে গিয়েছিল এখানে। তার সেই হাজারো কুর্ণিশকে লাখো কুর্ণিশ বানাতে হবে। দু'হাত পেতে সে-ই আবার ভিখমাঙার মত এসে দাঁড়াবে এখানে, তবেই না সে মালিকা বেগম।

বাজু-বন্দের নক্সাদার আধারটি নিয়ে ঘরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে যায় তাজ খাঁ। আওরৎ সে বহু দেখেছে। কিন্তু এমন ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদল তার চোখে পড়েনি। আশ্চর্য। যৌবন যার সবে কথা বলতে শিখেছে তারই যদি এই চেহারা হয়, পরে যে এর থৈ পাওয়া যাবে না!

মালিকা কিন্তু এর ভেতরেই সামলে নিয়েছে নিজেকে।

"কৈ, দেখি কেমন বাজু-বন্দ্?" বলে এগিয়ে গিয়ে তাজ খাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। অলঙ্কার দুটি তুলে নিয়ে দেখতে থাকে। পরে। তারপর সোহাগভরা দু'হাতে দুর্গাধিপতির গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "আপনি এর আগে যে সব গহনা দিয়েছেন তার চাইতে এগুলি অনেক ভাল।" বলেই গলা ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ায়, "কি ভুল হয়ে গিয়েছে! এলেন অতদূর থেকে, অথচ তসলিমটিই জানানো হয়নি এখন পর্যন্ত।" কথা শেষ করে বিশেষ শ্রদ্ধার ভঙ্গী সহকারেই কুর্ণিশ করে মালিকা।

কুর্ণিশত' নয়, সম্মুখে দণ্ডায়মান মানুষটির রক্তের প্রতিটি

কণিকাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া। ছুটে এসে দু'হাতে তাকে নিষ্পেষিত করবার মত করেই জাপটে ধরে তাজ খাঁ। তবুও মালিকা মালিকাই। পুরুষ-আলিঙ্গনেও বিস্মৃত হয় না তার কূটবুদ্ধি।

"বাদশাহ্‌র নজর নেইত' আমাদের দুর্গের দিকে ?" ফিস্ ফিস্ ক'রে জিজ্ঞাসা করে সে।

"আরে না না, আমি সে জিম্মাদার, সেই জিম্মাদারই আছি।" আবেগের সঙ্গে বলে চলে তাজ খাঁ, "বাদশাহ্ শুধু হিসাব নিলেন, ইব্রাহিম লোদির কত গহনা আর আসরফি জমা আছে এই দুর্গের গর্ভে।"

"আছে নাকি ? কৈ বলেননিত' কখনও ?" চোখের তারাদুটি চিকচিকিয়ে ওঠে মালিকার।

"বলবার কথা নয়, সেইজন্যেই বলিনি। বাদশাহের নিষেধ আছে। জানতাম কেবলমাত্র আমরা তিনজন—আমি, দবীরের আম্মা আর আব্বাস খাঁ। আর আজ জানলে তুমি। একথা যেন কাউকে বল না। বাদশাহের কানে উঠলে গর্দান যাবে।"

সে কথা বুঝি কানেও যায় না মালিকার আবার প্রশ্ন করে, "কোথায় আছে সে সব ধনরত্ন তা বললেন না ত' ?"

প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে তাজ খাঁ। এক পা পিছনে সরে গিয়ে ভীতকণ্ঠে বলে ওঠে, "তুমি দেখছি ফাঁসাবে আমাকে !"

"ও, আমার ওপরে আপনার এতই অবিশ্বাস ?" অভিমানে ভার হয়ে ওঠে মালিকার মুখ, "বেশ, তাহলে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করব না। আমি জানি, এখনও আপনার মন জুড়ে রয়েছে সফিদা বেগম।"

"নাগো, না," এগিয়ে এসে সস্নেহে মালিকার মুখখানি তুলে ধরে তাজ খাঁ, "আমার মনের সবটাই জুড়ে রয়েছে এই নহলী বেগম, আর যা তা সবই হচ্ছে চাটনী। শুধু একটু রকমফের করা।"

"চাটনী ভাল," দৃষ্টিটা একটু বক্র হয়ে ওঠে মালিকার, "তবে বাঁদীর পাত থেকে তুলে খাওয়াটা—"

"ই, কি যেন," গলা খাঁকারি দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে তাজ খাঁ, "কোথায় রেখেছি সে সব, না? ঐ যে তোশাখানা, ওর ভেতরে একটি ছোট্ট ঘর আছে। সে ঘরের একটিমাত্র কুঞ্জি, আমার কাছেই থাকে। ঐ ছোট্ট ঘরের ভেতর দিয়ে নীচে নামবার সিঁড়ি দুর্গের মাটীর তলার একটী ঘরে গিয়ে পৌচেছে। সেই ঘরেই সিন্দুকে সিন্দুকে রয়েছে সব ধনরত্ন।"

"হায় আল্লা, এত ক'রে তবে পরের জিনিষ রাখতে হয়? না রাখলে ক্ষতি কি?"

"না রাখলে চুণার, মির্জাপুরের জায়গীর যায়। আর আমার নহলী বেগমকে খুশ্ রাখবার উপায়ও থাকে না।" হাসতে হাসতে বলে তাজ খাঁ।

"খুশ যা আছি তা আর বলবার নয়। যাক্ গিয়ে, ওসব কথা না শোনাই ভাল। বসুন, কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন?"

মালিকাকে ছেড়ে দিয়ে গিয়ে বসে পড়ে তাজ খাঁ। একটু চিন্তিত ভাবে বলে, "তুমি মেজাজটাই পালটে দিলে আমার। কি হয়েছে বলত'?"

"হয়নি বিশেষ কিছু। আর এসব সাংসারিক কথা আপনার—"

"তাহ'ক, তুমি বল।"

"ঐ যে বড় তবফে আপনি যা দিতে বলেছিলেন মাসে মাসে, তাতে নাকি ওঁদের কুলোচ্ছে না। দুদিন এসে কথা শুনিয়ে গিয়েছে দবীর।"

"বন্ধ করে, দাও," লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় তাজ খাঁ, "এতদূর পর্যন্ত আসবার সাহস হয় যার তার জন্যে কোন সাহায্যই মিলবে না আমার জায়গীর থেকে।"

"সে আপনার যেমন ইচ্ছা সেইরকমই হবে," বলতে বলতে তাজ খাঁর সামনে দিয়ে ঘুরে পিছনে গিয়ে দাঁড়ায় মালিকা, দু'হাতে জাপটে ধরে এই ক্ষিপ্ত মানুষটাকে, পিঠের ওপরে পরম সোহাগভরে মুখ ঘষতে ঘষতে শেষ বিষটুকু ঢেলে দেয়, "তাছাড়া তার ইঙ্গিতও বড় কদর্য।"

"কি, কি বললে তুমি ?" সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ায় তাজ খাঁ।

"কি হবে আর বেশি রাগারাগি ক'রে ?" শান্ত করবার ভঙ্গিতে বলে যায় মালিকা, "কথায় বলে, পেটের মার দুনিয়ার বার। ঐ এক শাস্তিতে হাতী কাহিল হয়, দবীর তো একটা লেড়কা। আপনি বসুন দেখি, বসুন।" হাত ধরে টেনে বসায় তাজ খাঁকে। কোলের ওপরে বসে পড়ে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে হেলে পড়ে। মুখে মদির হাসি। চোখে তীব্র আহ্বান। এতক্ষণে তার বিলিয়ে দেবার সময় হয়েছে।

কয়টীত' মাত্র মানুষ এই গৃহে, কিন্তু কারও মুখের দিকে তাকাতে পারে না দবীর। আম্মাজান আর নকীবের উপবাসক্লিষ্ট মুখ দুটী যেন অহরহ পিছু ধাওয়া করে ফিরছে তাকে। এইত' একটু আগেই দেখে এসেছে কাঁদছিল নকীব। দেখে আর স্থির থাকতে পারেনি সে। ছুটে যাচ্ছিল তাজ খাঁর বিশ্রামকক্ষের দিকে। কিন্তু শেষ অবধি আর গিয়ে পৌছুতে পারেনি। তার আগেই এক প্রবল ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হয়েছিল তাকে। একটী দরাজ গলা আর একটী মিহিসুরের মিশ্রিত হাসির শব্দ প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছিল তার বুকে। ব্যথায় ঘৃণায় কুঁকড়ে গিয়েছিল তার মুখখানা। তারপর মাথা নীচু ক'রে ফিরে এসেছিল সেখান থেকে।

ঘরে ঢুকতেই সফিদা বেগম জিজ্ঞাসা করে, "হ্যাঁরে, গিয়েছিলি

তোর—”

কথাটী আর শেষ করতেও হয় না তাকে। তার পূর্বেই ঝাঁকি মেরে বলে ওঠে দবীর, “কার কাছে যাব ? দেখগে যাও—”

মাঝ পথেই থেমে যায় তার কথা। ছোট ভাইএর দিকে চোখ পড়তে লজ্জার কথাটি আর শেষ করতে পারে না সে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ভাইটির দিকে। কিশোর বয়স। জীবনে কোনদিন কষ্ট সহ্য করতে হয়নি তাকে। আজ এই দুটি দিনের অনাহারে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। বসে যাওয়া চোখদুটিতে রাজ্যের কাতরতা। বুকের ভেতর থেকে কান্নাটা ঠেলে উঠে আসতে চাইছে দবীরের। কোন ক্রমে সেই উদ্গত কান্নাকে ঠেলে ভেতরে নামিয়ে দিয়ে আবার ছুটে বেরিয়ে যায় সে।

একছুটে গিয়ে দাঁড়ায় তোশাখানার দরজায়। জীবনে একবার নয়, বহুবারই এসেছে সে। এসেছে, যখন যা প্রয়োজন নিয়ে গিয়েছে। বাধা দেয়নি কেউ। দেবার ক্ষমতাও হয়নি। বরঞ্চ দরজায় প্রহরারত সিপাহীর সেলামই পেয়েছে বরাবর। কিন্তু গত দু'দিন থেকেই দুনিয়াটা হঠাৎ যেন পালটে গিয়েছে। সেলাম দূরের কথা, সিনা টান ক'রে সামনে এসে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় সিপাহ্‌টি। ঢুকতে দেবে না তোশাখানার ভেতরে।

গতদিন আচম্বিতে বাধা পেয়ে রুখে উঠেছিল সে, “এতদূর স্পর্দ্ধা !”

“হুজুর মালিক,” বিনয়ের সঙ্গেই বলেছিল সিপাহ্‌, “আমরা হুকুমের নোকর।”

“কার হুকুম ?”

“ছোট মালিকান্ হুজুর।”

এরপর আর কথা বলতে পারেনি দবীর। কথা আসেনি তার। আওরৎএর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি যে এমন চরমে উঠতে পারে তা এই

প্রথম প্রত্যক্ষ করল সে। আবার ভাবে, না, তারই বা দোষ কি? ক্ষমতা না দিলে এরকম হুকুম দিতে পারত কি সে?

পূর্বদিনের মত আজও তোশাখানার ভেতরে ঢোকা হয় না তার। আরক্ত মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ ছুটতে থাকে সে দুর্গের ফটকের দিকে।

মনের যে অবস্থাটি নিয়ে দুর্গ থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়েছিল দবীর, ক্রমেই থিতিয়ে যেতে থাকে সেটা। কেমন একটা লজ্জার জড়তা এসে যায় মনে। আব্বাস খাঁর গৃহাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েও ভাবতে থাকে এত বড় লজ্জার কথাটা কি ক'রে সে বলবে। ভাবতে ভাবতেই এগিয়ে গিয়ে বারান্দায় ওঠে। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কাউকে দেখা যাচ্ছে না কেন? তবে কি এদেরও ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে কিছু? কান্নার বেগটা আবার ঠেলে উঠে আসতে চাইছে। বটগাছটার ঐ টিয়া আর চন্দনাগুলো বড় অযথা চীৎকার করে। কিসের যে এত আনন্দ ওদের বুঝে পাওয়া যায় না।

পায়ে পায়ে ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢোকে দবীর। গালিচা পাতা চৌকিটার ওপরে গিয়ে বসে পড়ে। আবার তখুনি ছটফটিয়ে ওঠে, নকীবের জন্যে যাহ'ক একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই বসে পড়ে আবার। আমিনা ঘরে ঢুকছে। দবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে চম্‌কে ওঠে আমিনা। ছুটে সামনে এসে দাঁড়ায়।

"কি হ'য়েছে তোমার?"

অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা এক জিজ্ঞাসা। কিন্তু কি উত্তর দেবে দবীর? এ অপরিসীম লজ্জার কথা যে কাউকে বলবার নয়। নির্লজ্জ চোখ দুটি বারে বারেই ছলছলিয়ে ওঠে। ডুক্‌রে

উঠে সহানুভূতি চায় অপরের। প্রাণপণে ঠোঁট কামড়ে ধরে দবীর। আমিনার দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে মুহূর্তের অন্যমনস্কতার ভেতর দিয়ে সহজ ক'রে নিতে চায় নিজেকে। আমিনাও ছাড়তে চায় না। দবীরের ব্যথা যেখানে সেখানেই যে তার বিশেষ প্রয়োজন। প্রয়োজন সহানুভূতি আর সান্ত্বনার, কথায় আর হাসিতে সহজ ক'রে তুলবার।

"কৈ, বললে না ?" তাগাদা দেয় আমিনা।

"কি বলব ?" হাসবার এক ব্যর্থ চেষ্টা করে দবীব। নিজের ব্যথাটাকেই আরও প্রকট ক'রে তোলে সে হাসিতে।

"নিশ্চয়ই কিছু হ'য়েছে তোমার। আমি জানতে চাই।"

এতবড় দাবীকে অবহেলা করবে কি ক'রে দবীর! এ যে নিজের হৃদয়কেই অস্বীকার করা। মাটি আর গাছের একাত্মতা। এ সম্বন্ধকে যে অস্বীকার করে সে তো আলোক-লতা। বন্ধনহীন। না, তা নয় আমিনা। সে মাটিরই মানুষ। বন্ধনেই তার আনন্দ, তার শান্তি। তাই দাবীও তার হৃদয়ঢালা।

তবুও বলতে পারে না দবীর। কে যেন দু'হাতে গলা টিপে ধরে তার। একবার মাত্র আমিনার মুখের দিকে তাকিয়েই নামিয়ে নেয় মুখ। মাথা নীচু ক'রেই জিজ্ঞাসা করে, "আব্বাজান নেই ?"

"না, সিপাহ্‌দের ভেতরে কি গণ্ডগোল হয়েছে, তাই দেখতে ছুটেছেন।"

"ও। তাহ'লে আমি যাই।"

উঠে পড়ে দবীর। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়। পিছন পিছন আমিনাও আসে। দবীরের লক্ষ্যে পড়ে না তা। দৃষ্টি ওর ঐ বটগাছটির দিকে। প্রাণপণে চেঁচিয়ে চলেছে পাখীগুলি। স্বাধীনতার আনন্দে। জীবিকার জন্যে ওরা কারও মুখাপেক্ষী নয়। এই কথাটাই বুঝি ওরা চীৎকার ক'রে জানিয়ে দিতে চাইছে। আর

ও যদি আজ একমুঠো চনক্ও পায় তাহ'লেও ছোট ভাইটাকে বাঁচাতে পারে। ফোঁস ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার।

"কোন কথা না বললে তার প্রতিকার করা যায় না। ঐ আব্বাজন আসছে।"

পেছন থেকে বলে ওঠে আমিনা। তার কথা কানে যেতে ঘুরে রাস্তার দিকে তাকায় দবীর। সত্যিই আব্বাস খাঁ আসছে। কিন্তু মুখভাবটা একটু বেশীরকম গম্ভীর।

ক্রমে কাছে আসে আব্বাস খাঁ। এসে দাঁড়ায় দবীরের সামনে। বলে ওঠে, "ব্রহ্মচারীর কথাই বুঝি সত্যি হ'তে চলেছে এতদিনে। হঠাৎ খবর পেলাম, একদল সিপাহ্ গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টায় আছে। ছুটে গেলাম সেখানে। গিয়ে দেখি দু'দলে মারামারি বাধবার উপক্রম। থামাবার চেষ্টা করি। একটি দল থেমে যায়। কিন্তু আর একটি দল কিছুতেই থামতে চায় না। চীৎকার করতে থাকে—মীর আহ্মদকে সিপাহ্শালার করতে হবে।"

"সিপাহ্শালার?" ভয়ে আতকিয়ে ওঠে দবীর।

"অন্য সময় হ'লে ভীষণ শাস্তি হ'ত তাদের। কিন্তু আজ আর তা সম্ভব নয়।" বলে দবীরের মুখের দিকে চাইতে এতক্ষণে যেন তার উপস্থিতির কথা মনে পড়ে। জিজ্ঞাসা করে, "তারপর তুমি কতক্ষণ এলে? একা একা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে?"

একা একা? পিছনের দিকে তাকায় দবীর। নেই। আব্বাস খাঁকে আসতে দেখে কোন সময়ে পালিয়েছে আমিনা।

"এসেছিলাম আপনার কাছে। দিল্লীতে একটা কোন কাজের ব্যবস্থা করে দিন আমাকে।" অনুনয় ঝরে পড়ে দবীরের গলা থেকে।

"বুঝলাম।" উত্তর দেয় আব্বাস খাঁ, "কিন্তু তাতেওত' কিছু সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু তার আগে একটা কাজের কথা—

আচ্ছা, সে তোমার আব্বাজানের সঙ্গেই—"

"না", বাধা দিয়ে বলে ওঠে দবীর, "আমার কাজ সম্বন্ধে আমার সঙ্গেই কথা বলতে পারেন, কিম্বা আম্মার সঙ্গে।"

তার দৃঢ়স্বরে একটু অবাকই হ'য়ে যায় আব্বাস খাঁ। যে কথা সে বলতে চায় তা সামাজিক। সংসারের কর্তার অনুমতির অপেক্ষা রাখে। কিন্তু দবীর দৃঢ়ভাবেই সেই কর্তাকে বাতিল করে দিল কেন? একটা কোন গোলমাল নিশ্চয়ই হয়েছে। প্রয়োজন হয়নি বলে কয়েকটা দিন দুর্গের দিকে যায়নি আব্বাস খাঁ। এরই ভেতরে সেখানে আবার কি গোলমাল হ'ল? সিপাহ্‌শালার হিসাবে খবর তার পাওয়া উচিত ছিল। ঘুরে আবার বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ায় আব্বাস খাঁ। এমন সময় একটি লোক ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হয়। এতটা রাস্তা দৌড়ে আসায় বেশী রকম হাঁফিয়ে পড়েছে। ভালভাবে তার বক্তব্য বিষয়টি বলতেও পারছে না। কথা বলতে গেলেই ধমকে ধমকে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে মুখ থেকে। তবুও তার ভেতর থেকেই আসল কথাটুকু বুঝতে পারে দবীর যে নকীব খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে। কথাটি শুনে আর দাঁড়াতে পারে না দবীর। 'চল যাচ্ছি' বলে সেও ছুটতে থাকে।

ফুরিয়ে যাওয়া দম নিয়ে ঘরে এসে উপস্থিত হয় দবীর। ফলে না পারে কথা বলতে, না পারে কিছু ভাবতে। মনে হচ্ছে দেহের ভেতরটা সবই ফাঁকা। আর রক্ত-মাংসের এই খাঁচাটা কাঁপছে থরথর করে। বুঝি এখুনি পড়বে হুড়মুড়িয়ে। দরজাটা দু'হাতে চেপে ধরে কিছু সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সে। একটু সুস্থ্য বোধ করতেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। আম্মার ঘরে গিয়ে ঢোকে।

নকীবের মাথার কাছে বসেছিল সফিদা বেগম। তাকিয়েছিল মুমূর্ষু সন্তানের মুখের দিকে। দবীরের পায়ের শব্দে একবার

মুখ তুলে তাকিয়েই ডুকরে কেঁদে ওঠে। মায়ের কান্নামাখা মুখখানির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের ভেতরে এক নূতন শক্তি অনুভব করে দবীর। একটা বেপরোয়া মনোভাব। মরিয়া, দুর্মদ। ছুটে বেরিয়ে যায় সে ঘর থেকে। সোজা গিয়ে ঢোকে মালিকার মহলে। বিশ্রম্ভালাপে মশগুল তখন তাজ খাঁ। মালিকার দিকে একবার ফিরেও তাকায় না দবীর। দৃঢ় পায়ে গিয়ে দাঁড়ায় তাজ খাঁর সামনে।

"নকীবের খুব অসুখ, হেকিমকে ডাকতে হবে এখুনি। আর খানা চাই সকলের জন্যে।" অনুনয় বিনয় নয়, রীতিমত দাবীর সুর দবীরের গলায়।

"আচ্ছা সে পরে চিন্তা করা যাবে, যাও।" কঠিনভাবে উত্তর দেয় তাজ খাঁ।

"অতটুকু একটা ছেলে দুটো দিন শুধু পানি খেয়ে রয়েছে—"

"বেরিয়ে যা উল্লু।" চীৎকার ক'রে ওঠে তাজ খাঁ।

"তাই যাচ্ছি। তবে নকীবের যদি কিছু হয় সে হবে আরও ভীষণ, এও বলে গেলাম।"

বলেই হন্‌হন্‌ ক'রে চলে যায় দবীর।

"অত্যন্ত বেয়াদব বেতরিফৎ লেড়কা," এতক্ষণে ফুঁসিয়ে ওঠে মালিকা।

ছুটে দুর্গের বাইরে গিয়েই মুশকিলে পড়ে যায় দবীর। মানসিক উত্তেজনায় খেয়ালই করেনি যে কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছে আকাশ। এখন ঝম্‌ঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে আসায় না পারে এগুতে, না পারে পেছুতে। কিন্তু সেই দ্বিধাভাবও বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'তে পারে না। মনের সেই কঠিনতা আবার ফিরে পায় সে। দেখতে হবে এর

শেষ কোথায়। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই চলতে থাকে হেকিমের বাড়ীর দিকে। বুকের খাঁচাটার ভেতরে এক অবরুদ্ধ দৈত্যের আক্রোশ বয়ে নিয়ে।

কিন্তু চাওয়া মানেই পাওয়া নয়। যুদ্ধ করা অর্থে জয়ী হওয়া নয়। আসতে পারেননি হেকিম সাহেব। এমনকি একটু দাওয়াইও দিতে পারেননি। প্রথমটায় এই মানুষটিকে দেখে আশ্চর্যই হয়ে গিয়েছিল দবীর। এই কি সেই স্নেহ-মায়া-মমতায়-ভরা সদা হাস্যময় হেকিম সাহেব, না অপর কেউ? ব্যঙ্গ করে বলেও উঠেছিল, "তাত' বটেই। যাবেন কি করে? আমার যে কিছুই দেবার ক্ষমতা নেই।" বলেই ঘুরে চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল।

"না, ছোট মালিক, না." একটা ডোকরানি উঠে এসেছিল হেকিম সাহেবের অন্তর থেকে, "আমি কোন কথাই বলতে পারছি না। আল্লা মেহেরবান যেন নকীবকে ভাল ক'রে দেয়।"

অবাক হ'য়ে গিয়েছিল দবীর এই শেষের কথাটি শুনে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিল বক্তার মুখের দিকে। দেখেছিল শুভ্র গণ্ডদুটির ওপরে দুটি চোখের ধারা তাঁর হৃদয়ের ছবি এঁকে চলেছে। তবে? এর ভেতরেও কি কারও কুটিল হস্তক্ষেপ আছে? কে সে? ওস্তাদ খেলোয়াড়ের মত পাঁচ চাল এগিয়ে চিন্তা করে চলেছে?

"কে সে?" ঝক্‌ঝকিয়ে ওঠে দবীরের চোখ দুটি, "আমাকে তার নামটি শুধু বলুন।"

"পারব না, পারব না," হু হু করে কেঁদে উঠেছিলেন বৃদ্ধ হেকিম সাহেব, "তুমি যাও দবীর। আজ যাও। শুধু এইটুকু জেনে যাও, যদি কোনদিন নিজের শক্তিতে দাঁড়াতে পার তাহ'লে এই হেকিম সাহেব সকলের আগে ছুটে যাবে তোমার কাছে।"

বোঝা যায়, কিন্তু জানা যায় না। চারিদিক থেকে যেন এক বিরাট ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছে তাদের কয়টি প্রাণীর বিরুদ্ধে। এর প্রয়োজন কি? তাদের নিঃশ্বাস কি দুর্গের বাতাসকে এতই ভারি ক'রে তুলেছে যে এইভাবে দুনিয়ার বুক থেকে সরে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে? অবিশ্রান্ত ধারার মত চিন্তারও ছেদ নেই। পায়ে পায়ে আবার দুর্গের দিকে এগিয়ে চলে দবীর। চিন্তার ভারে মাথাটা ঝুলে পড়েছে। সোজা রাস্তায় বাঁচবার জন্যে যতদূর চেষ্টা করা সম্ভব তার সবটাই করেছে সে। এখন আর দুটি মাত্র রাস্তা খোলা তার সামনে। একটি অস্ত্রের সাহায্য, অপরটি ভিক্ষা। না, সম্ভব নয়। একা সে অস্ত্র নিয়ে কার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে? আর ভিক্ষা? তার চাইতে এই অনশনেই যেন শেষ হয়ে যায় সে। চিন্তার ভেতর দিয়ে কখন যে রাস্তাটি শেষ হয়ে গিয়েছে, খেয়ালই হয়নি তার। খেয়াল হয় দুর্গে ঢোকবার ঢালু রাস্তাটিতে এসে। জলের স্রোত বয়ে চলেছে রাস্তার ওপর দিয়ে।

এতক্ষণে অসুস্থ নকীবের চিন্তাটি আবার অস্থির করে তোলে তাকে। অনেকক্ষণ সে ঘরছাড়া। কেমন আছে সে, কে জানে। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে ফটক পার হ'য়ে ওপরে উঠতে থাকে সে। নিত্য যাতায়াতের এই পথটুকু ঠেলে উঠতেই দম ফুরিয়ে যায়। হাঁফাতে হাঁফাতেই গিয়ে ঢোকে ঘরে। এক অজানিত ভয় পাষাণ চাপ নিয়ে চেপে বসেছে বুকের ওপরে। দাঁড়িয়ে যায় দবীর। মানুষের সাড়ার আশায় কান খাড়া করে থাকে। কিন্তু কোন শব্দই পাওয়া যায় না কোথাও থেকে। পরিত্যক্ত বাড়ীর মত খা খা করছে ঘরখানি। তোলপাড় করছে বুকের ভেতরে। এগুতে

গিয়েও আবার পিছিয়ে যায় সে। আবার তখুনি মনে হয় ভালমন্দ সব কিছুর মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়াতে একমাত্র সেই যে আছে এই ক্ষুদ্র সংসারটিতে। তারত' এত দুর্বল হ'লে চলবে না। দৃঢ় পদক্ষেপে কয়েক পা এগিয়ে যায়। তারপর কেমন আপনিই থেমে আসে পা। কোন একটি মানুষের কণ্ঠস্বরও এখন এই মুহূর্তে পরম আকাঙ্খিত বলে মনে হয় তার কাছে। কিন্তু সে আশা মিটবার নয়। নিজের অবস্থা বুঝেই আবার এগিয়ে চলে সে। গিয়ে ঢোকে মায়ের ঘরে।

নকীব শুয়ে। স্তিমিত প্রদীপ শিখায় তার মুখখানা আরও পাণ্ডুর দেখাচ্ছে। বোধহয় ঘুমুচ্ছে। মাথার কাছে মা বসে। দুটি হাত নকীবের ঠিক মাথার ওপরে দোয়া-মাঙার ভঙ্গীতে প্রসারিত। একবার মাকে ডাকতে যায় দবীর। ডাকে না। আল্লার দয়াই এখন একমাত্র দাওয়াই নকীবের। এ সময়ে কি সে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে! ডাকুক। সমস্ত অন্তর দিয়ে। ও শুধু একবার জানতে চায় কেমন আছে এখন নকীব। নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে যায় দবীর। নকীবের কপালের ওপরে হাত রাখে। ধ্যান ভেঙে যায় সফিদা বেগমের। চম্‌কে তাকায় দবীরের দিকে। তারপরই ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে।

"কোথায় ছিলি তুই এতক্ষণ, একবার হেকিম সাহেবকেও ডেকে আনতে পারিস্‌নি?"

কি উত্তর দেবে দবীর? সমস্ত দেহ যেন অবশ হ'য়ে আসছে তার। মনে হচ্ছে এখুনি পড়ে যাবে। সবলে ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজেকে খাড়া করে রাখবার চেষ্টা করে সে।

"খিদের জ্বালায় কি যে খেয়ে এল, সেই খাওয়াই ওর শেষ খাওয়া হ'ল।"

ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকে সফিদা বেগম। শুনতে

শুনতে মাথার ভেতর দিয়ে আগুন ছুটতে থাকে দবীরের। দু'চোখের দৃষ্টিতে প্রতিহিংসার প্রতিজ্ঞা। আহত সিংহের মত মরিয়া। ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে সে। দরজার পাশে দেওয়ালে টাঙান ছিল নিজের অতি প্রিয় হাত-কুঠারটি। সেটাকে তুলে নিয়েই আবার ছুটতে থাকে। আকাশের গর্জন আর বর্ষণ তখনও সমান ভাবে চলেছে। প্রহরী আর সিপাহীর দল আশ্রয় নিয়েছে তাদের ঘরে। বাধাহীন অবস্থায় ছুটে গিয়ে মালিকার মহলে উপস্থিত হয় দবীর। বন্ধ দরজার গায়ে সজোরে লাথি মারতে থাকে।

বর্ষা ঝরা রাতের মদিরতা বয়ে চলেছে তাজ খাঁর স্নায়ুতে স্নায়ুতে। অজগরের দেহালিঙ্গন দিয়ে সে নিষ্পিষ্ট ক'রে ফেলতে চায় তার কামনার নারীটিকে। কিন্তু ক্ষিপ্রগতি মালিকা বারে বারেই পিছলে যাচ্ছে। উপচে পড়া যৌবনের তরঙ্গ তুলে, খিল্ খিল্ হাসির লহরী ছিটিয়ে আর দু'টি চোখের শায়কে তাকে বিদ্ধ ক'রে। জ্বলছে তাজ খাঁ। আর জ্বালাচ্ছে মালিকা, দুর্গাধিপের কামনার আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে। তেমনি একবার ধরা পড়তে পড়তেও কোন রকমে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে মালিকা। কিন্তু পালাবার আর পথ পায়নি। ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে মহলের সদর দরজার কাছে। বাইরে ঐ বৃষ্টির ভেতরেই বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছা তার। এতদিন ধরে যে সুযোগের অপেক্ষা করছিল সে, আজই এসেছে সেই শুভ সময়। খেলতে হবে চরম খেলা। তারপর আসঙ্গলিপ্সার আগুনে দাউ দাউ ক'রে যখন জ্বলতে থাকবে ঐ মানুষটি, তখন, ঠিক সেই শুভমুহূর্ত্তে হুকুম-নামা লিখিয়ে নিতে হবে ওকে দিয়ে। আব্বাস খাঁএর পরিবর্ত্তে মীর আহ্‌মদ হবে সিপাহ্‌-শালার। পূর্বাহ্ণে লিখিত সে হুকুম-নামা যথাস্থানেই আছে। উপযুক্ত সময় বুঝেই সেটি মালিকের সমনে উপস্থিত করবে

মালিকা।

কিন্তু বাধা পড়ে গেল। কে যেন প্রবল বেগে ধাক্কা দিচ্ছে দরজার ওপরে। ঘুরে দাঁড়ায় মালিকা। মুখের ওপরে অসন্তুষ্টির ছাপ এসে পড়ে।

"কে দরজা ধাক্কাচ্ছিস ?" বলতে বলতে গিয়ে খুলে দেয় দরজা।

তাজ খাঁর পরিবর্তে মালিকাকে দেখে একমুহূর্তের জন্যে বুঝি হক্‌চকিয়ে যায় দবীর। তারপরই সর্ব অনিষ্টের মূল এই স্ত্রীলোকটির ওপরে বিজাতীয় ঘৃণায় মুখখানি বেঁকে ওঠে তার। সাঁ করে হাত-কুঠার ধরা হাতখানা ওপরে উঠে যায়। এক মরণ-চীৎকার দিয়ে লাফিয়ে পিছিয়ে আসতে যায় মালিকা। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সক্ষম হয় না। বিদ্যুতবেগে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুঠারখানা। শুধু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ায় মালিকার বাহুর কিছুটা মাংস নামিয়ে নিয়ে যায়। চীৎকার ক'রে ছুটে ঘরের ভেতরে গিয়ে দু'হাতে তাজ খাঁকে জাপ্‌টে ধরে মালিকা। ছিন্ন কামিজের ভেতর থেকে গল্‌গল্‌ ক'রে রক্ত বেরিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে হাতার অংশ। সেদিকে একবার মাত্র তাকিয়ে দেখেই দু'হাতে ঠেলে তাকে সরিয়ে দেয় তাজ খাঁ। ছুটে গিয়ে দেয়ালের গায়ে রক্ষিত তরোয়ালখানা টেনে নেয়। তীরবেগে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। চীৎকার করে ওঠে, "এই উল্লু!"

ফিরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছিল দবীর। আওরতের গায়ে আঘাত করবে এ বুঝি ভাবতেও পারেনি সে। অনুতপ্ত মন এরই ভেতরে নরম হয়ে এসেছিল তার। কিন্তু আবার তা জ্বালিয়ে দিল তাজ খাঁ। উল্লু ডাক শুনে দবীর ফিরে দাঁড়াতেই গালাগাল দিয়ে উঠল তাজ খাঁ, "রাণ্ডীর বাচ্চা—"

একমূহূর্তে মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল দবীরের। স্থান কাল পাত্র ভুলে ঐ কটু সম্ভাষণের উত্তর দেবার জন্যে হাতটা একবার ওপরে তুলেই ছুঁড়ে মারল কুঠারটা তাজ খাঁর বুক লক্ষ্য করে।

অব্যর্থ লক্ষ্য। এড়িয়ে যাওয়ার অবসরও মেলেনি তাজ খাঁর। বুকের পাঁজর ভেঙ্গে গেঁথে গেল কুঠারখানা। কয়েকবার নিশ্বাস নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করল দুর্গাধিপতি। তারপরই এলিয়ে পড়ল মাটিতে। আর নিশ্বাস নেবার কোনদিনই প্রয়োজন হবে না তার।

এখন? এক জ্বালা নেভাতে গিয়ে যে আর এক জ্বালা জ্বলে উঠল। দ্রত চিন্তা করবার চেষ্টা করে দবীর। পারে না। সব কিছুই যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। মুক্ত জলস্রোতের সঙ্গে মিশে যাওয়া কাদামাটির মত। মাটির সে অংশটাকে যে আর কিছুতেই পৃথক ক'রে ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না! থিতিয়ে গেলে? হ্যাঁ, থিতিয়ে গেলেই শুধু এই কর্দ্দমাক্ত ভাব কেটে যেতে পারে। কিন্তু তখুনি আবার বেঁকে বসে মন, না, অন্যায় সে কিছু করেনি। প্রাণ রক্ষার খাতিরেই প্রাণ নিতে হয়েছে। ফিরে নিজের ঘরের দিকে চলতে থাকে দবীর। আকাশ তার কান্নার পালা শেষ ক'রে এনেছে। কিন্তু সফিদা বেগমের কান্না এখনও থামেনি। সে কান্না শুনতে শুনতেই নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে দবীর। খাপ থেকে টেনে নেয় নিজের অতিপ্রিয় তরোয়ালখানা। তারপর দৃঢ়পায়ে গিয়ে দাঁড়ায় বাইরে। বৃষ্টির প্রকোপ কমে আসায় ঘরের আশ্রয় ছেড়ে আবার একে একে বাইরে আসছে সিপাহ্‌রা। তাদেরই একজনকে ডাক দেয় দবীর। গুরু গম্ভীর স্বরে হুকুম জানায়—"এখুনি গিয়ে সিপাহ্‌শালার আব্বাস খাঁকে ডেকে নিয়ে আসবি। বলবি নকীবের ইন্তেকাল হয়েছে। তাঁর আসা বিশেষ প্রয়োজন।" হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই আবার গর্জন করে উঠে সাবধান করে, "খবরদার, আর কাউকে বলবি না একথা।" বলেই তরোয়ালখানা একবার সিপাহ্‌টির নাকের সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে আনে।

"জী ছোট মালিক," বলে সভয়ে ছু'পা পিছিয়ে যায় সিপাহ্‌টি। তারপরই ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে থাকে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দবীরও নেমে পড়ে বারান্দা থেকে। সোজা নেমে যায় ফটকের কাছে। বর্ষার রাত। মানুষের যাতায়াতের সম্ভাবনাও কম। সুযোগ বুঝে মহব্বতের গল্পের ঝুলি খুলে নিয়ে বসেছে প্রহরী দুইজন। ভাবতেই পারেনি যে এই অসময়ে আবার কোন বিঘ্নসৃষ্টিকারী এসে উপস্থিত হতে পারে। তাই ভীষণভাবে চম্‌কে ওঠে তারা যখন তাদের পিছন থেকে চীৎকার ক'রে ওঠে দবীর, "বন্ধ কর ফটক।"

লাফিয়ে উঠে ছিট্‌কে ফটকের ছু'পাশে সরে যায় ছু'জনে।

"বন্ধ কর ফটক।" আবার হুকুম জানায় দবীর, "আমার হুকুম ছাড়া কেউ ঢুকতে পারবে না এই দুর্গে। য়াদ থাকে যেন কথাটা।"

হতভম্ভ প্রহরী দুইজন। নিয়ম-মাফিক ছোটমালিককে শুধু সেলামই করে এসেছে এতদিন। আর মনের কোণে তার জন্যে রেখেছে একটুখানি করুণা। তার বেশী আর কিছুর প্রয়োজন হয়নি। হবে বলে মনেও করতে পারেনি। আজ ঠিক সেই জায়গা থেকেই জবরদস্ত্‌ হুকুম আসায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায় তারা। তাড়াতাড়ি ঠেলে বন্ধ্‌ করে দিতে থাকে বিরাটাকৃতি কাঠের পাল্লাদুইটি।

সেখান থেকে আবার উপরে উঠে আসে দবীর। বর্ষাশেষের মেঘের গোঙরাণির মত গুঙরেই চলেছে সফিদা বেগম। ঘরের ভেতরে ঢুকতে গিয়ে আর পা চলে না তার। ছোট ভাইএর ঐ স্পন্দনহীন দেহটি আঁকড়ে ধরে বসে রয়েছে মা। ওকে দেখলেই ডুক্‌রে উঠবে আবার। নিজের দেহখানিও যেন ক্লান্তির ভারে নেতিয়ে পড়তে চাইছে। তবুও খাড়া থাকতেই হবে। অনেকগুলি কর্তব্য এখন তার সম্মুখে। কিন্তু মা? তার যে চরম সর্বনাশ করেছে সে, তা তার গোচরে আনবে কি করে? আনলেও আম্মা

যে আর এ জীবনে তার মুখদর্শণ করবে না, এও সুনিশ্চিত।

অন্যমনস্কভাবেই দেহটি এলিয়ে দেয় সে দেয়ালের গায়ে। কতক্ষণে আব্বাস খাঁ আসবে তারই অপেক্ষায় সময় কাটতে থাকে তার।

একে অনাহার তার ওপরে পরিশ্রম ও উত্তেজনার ক্লান্তিতে চোখ দুটি বুঁজে এসেছিল দবীরের। এমন সময় তীক্ষ্ণ এক চীৎকারে চম্‌কে জেগে ওঠে সে। দুর্গের অন্যান্য সকলেও শুনতে পায় সে চীৎকার। ছুটে আসতে থাকে। মুহূর্তে সজাগ হয়ে ওঠে দবীর। কোনভাবেই কারও সঙ্গে মালিকার দেখা করতে দেওয়া উচিত হবে না। উন্মুক্ত তয়োয়াল হাতে লাফিয়ে গিয়ে ওদের সামনে দাঁড়ায় সে। চেঁচিয়ে ওঠে, "খবরদার! যে যার কাজে যাও।"

"ছোট মালিক!" আশ্চর্যে যেন ফেটে পড়ে তারা।

"ছোট মালিক নয়। আজ থেকে এই দুর্গের আমিই মালিক। যাও, কাজে যাও।"

পাশার দান বদলেছে, বুঝতে পারে তারা। নসীবের চাকাখানা ঘুরছেই আর ঘুরছেই। কখন কাকে যে ওপরে তুলবে আর কাকে যে নীচে নামাবে কেউ বলতে পারে না। অতএব যা হ'ল, তা মেনে নেওয়াই ভাল। নতুন মালিককে তসলিম জানিয়ে পিছু হঠতে থাকে তারা।

খবরটা বিদ্যুতের বেগেই ছড়িয়ে যায় সমস্ত দিল্লী সহরে। ব্রহ্মচারীও শোনেন। শুনেই ছুটতে থাকেন হরদেও প্রসাদের বাড়ীর দিকে। খা খা করছে দিল্লীর রাস্তাগুলি। হাটবাজার দোকান-পাট মকতব মাদ্রাসা সমস্ত বন্ধ। যেন কোন মহামারীর ভয়ে সহরবাসীরা সহর ত্যাগ করে দূর-দূরান্তে কোথাও চলে গিয়েছে। কিম্বা অত্যাচারী তৈমুরলঙের আগমন সংবাদে গৃহকোণ আশ্রয় করে

কায়মনোবাক্যে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করছে। সেই জনমানব পরিত্যক্ত রাস্তা দিয়ে যারা চলেছে আজ, তাদের না চললে নয়। ব্রহ্মচারীও তাদের ভেতরে একজন। সমস্যা, না সমাধান? বিরাট এক প্রশ্নের সম্মুখীন আজ তিনি। এই ক্রান্তিকালকে যদি কাজে লাগান যায় তাহ'লে হয়ত' আবার চুণার ফিরে আসতে প'রে তাঁর হাতে।

চিন্তার ভেতর দিয়েই কখন ফুরিয়ে যায় রাস্তা। হরদেও প্রসাদের বাড়ীর দরজায় এসে আঘাত করেন তিনি। দোকান বন্ধ। তাই বাড়ীতেই ছিল কৈরালাপ্রসাদ। এসে দরজা খুলে দেয়।

"পিতাজী কোথায়?" জিজ্ঞাসা করেন ব্রহ্মচারী।

"চল, বাড়ীতেই আছেন।" উত্তর দেয় কৈরালা।

এগিয়ে গিয়ে হরদেও প্রসাদের ঘরে ঢোকে তু'জনে।

"এস," আহ্বান জানায় হরদেও প্রসাদ, "বস।"

বসেন ব্রহ্মচারী।

"খুব ছুটে এসেছ, না? বড্ড হাঁফাচ্ছ যেন?" বলে হরদেও প্রসাদ।

"হ্যাঁ। খবরটা শুনে আর অপেক্ষা করতে পারিনি।"

"ভালই করেছ। আমিও তোমার কথাই ভাবছিলাম। এতদিন ধরে নজরবন্দী অবস্থায় কাটিয়েছ। আজ যখন এমন মওকা এসেছে তখন সেটাকে কাজে লাগাতে পারাটাই বড় কথা। কিন্তু আজকের দিনটাই, কাল বোধহয় আর এ সুযোগ থাকবে না।"

ব্রহ্মচারীর চিন্তাও সেই একই রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে। বাদশাহ্ বাবর আর নেই। পুত্র হুমায়ুনের অসুখ সারবার সঙ্গে সঙ্গেই অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন তিনি। তারপর চিকিৎসা বিদ্যার জ্ঞানভাণ্ড খালি করেও তাঁকে সারিয়ে তুলতে পারেনি চিকিৎসকেরা। অবস্থা ক্রমাবনতির দিকে চলতে চলতে সেইদিনই মাত্র সমস্ত হিসাব নিকাশের শেষ হ'য়ে গেল। বর্তমান রূপান্তরিত হ'ল ইতিহাসে।

বাদশাহজাদা হুমায়ুনও সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে ওঠেনি।

বাদশাহের মৃত্যুর খবর যেমন বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে গেল সমস্ত দিল্লী সহরে, তেমনি ব্রহ্মচারীও শুনলেন। শুনলেন আর মনে মনে হিসাব করলেন, অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া এই বিপর্যয়ে কর্তব্যে যে শৈথিল্য ঘটেছে কর্মচারীদের, তারই সুযোগ নিতে হবে। সেই হিসাব মতই ছুটে এসেছেন তিনি হরদেও প্রসাদের কাছে। কিন্তু কথা হচ্ছে কিভাবে এই সুযোগকে কাজে লাগান যায়।

কথা থেমে গিয়েছে। উপস্থিত তিনটি মানুষেরই মুখে চিন্তার রেখা। প্রধান ফটক পার হ'য়ে যাওয়াই এক বিরাট সমস্যা। বিশেষ করে হেদায়েৎ খাঁ যখন তার শ্যেন-চক্ষুদুটি নিয়ে বসে থাকে ভিক্ষের ঝুলিটি সামনে পেতে।

"এখান থেকে কোথায় যাবে ?" নিস্তব্ধতা ভাঙে কৈরালা।

প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লী থেকে সোজা বিহারের রাস্তা ধরলে পদে পদে ধরা পড়বার সম্ভাবনা। উত্তরের আশায় ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে হরদেও প্রসাদ।

"এখান থেকে গুরুগাঁও, রেওয়ারী হয়ে সোজা রাজস্থানে চলে যাব ভাবছি।" উত্তর দেন ব্রহ্মচারী।

"সেই ভাল। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ রাজস্থানের পরিধিকে বাড়াতে পার কিনা। তবে পারবে বলে মনে হয়না।"

"কেন ?"

"কারণ আমাদের ভেতরে জয়চাঁদের সংখ্যাই বেশি। যাক্, তুমি বস। আমি একটু ঘুরে আসি।"

"এখন আবার কোথায় যাবেন ?"

"তোমাকে দিল্লীর এলাকা পার করে দেবার ব্যবস্থাতো করতে হবে।" বলে উঠে দাঁড়ায় হরদেও প্রসাদ। পুত্রকে বলে ব্রহ্মচারীর স্নানাহারের ব্যবস্থা করে দিতে। তারপর বেরিয়ে যায়।

হরদেও যখন ঘুরে আসে তখন বেশ বেলা হ'য়ে গিয়েছে। হাতে একটি পুঁটুলি তার। সেটি ব্রহ্মচারীর হাতে ধরে দিয়ে বলে, "আফগান পোষাক আছে এর ভেতরে। পরে তৈরী হয়ে নাও। কৈরালা তোমাকে সাহায্য করবে। আমি চট করে ছুটো খেয়ে আসি।"

পুঁটুলিটা খোলেন ব্রহ্মচারী। আনকোরা নূতন আফগান পোষাক তার ভিতরে।

"পরে দেখ ঠিক হবে কিনা। যাও, ঘরে নিয়ে যাও।" বলে অন্দরের দিকে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছে হরদেও এমন সময় বাইরে থেকে কার দরাজ গলার ডাক শোনা যায়, "প্রসাদজী বাড়ী আছেন ?"

ডাকটি শোনবার সঙ্গে সঙ্গে "সত্যনাশ !" বলে আঁতকে উঠে থম্‌কে দাঁড়িয়ে যায় হরদেও প্রসাদ।

চাপা স্বরে দ্রুত হুকুম করে, "শিগগীর অন্দরে চলে যাও।" তাবপরই জোরে সাড়া দেয়, "আছি বাণেশ্বরজী, আসছি।"

সাড়া দিয়ে ধীরে ধীরে উঠোনে নেমে যায় হরদেও প্রসাদ। কৈরালাদের পোষাক আসাক নিয়ে অন্দরে চলে যাওয়ার মত যথেষ্ট সময় দিয়ে গিয়ে সদর দরজা খুলে দেয়।

"আসুন বাণেশ্বরজী।" অতিথিকে অন্দরে আসবার আহ্বান জানায়।

হরদেও প্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে এসে বাণেশ্বর বারান্দায় ওঠে। হাত দিয়ে টেনে একটা কুর্শি এগিয়ে দেয় হরদেও। বলে, "বসুন।"

"হ্যাঁ, বসি।" বলে এদিক ওদিক একবার ভালভাবে তাকিয়ে দেখে বসে পড়ে বাণেশ্বর। জিজ্ঞাসা করে, "সকলে দেখে আসতে গেল, আপনি গেলেন না ?"

"বৃদ্ধ মানুষের ভয় একটু বেশি বাণেশ্বরজী। কৈরালাকে

পাঠিয়েছি কিছু ফুল সওদা করতে। যদি পায়, ও-ই গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসবে।”

“সে ভাল, সে ভাল। যাচ্ছিলাম এখান দিয়ে, ভাবলাম অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই আপনার সঙ্গে, একটু দেখা করে যাই। ভালকথা, জীবন প্রসাদকে তার বাড়ীতে দেখলাম না। আপনার এখানে এসেছিল ?”

“আসেনি। হয়ত' আসতে পারে। প্রতিদিন যমুনায় স্নান করতে যায়। সেখানে দেখেছিলেন ?” বলেই একটু চাপ দেয় হরদেও প্রসাদ, “খুব জরুরি দরকার আছে তার সঙ্গে ? এলে আপনার ওখানে পাঠিয়ে দেব ?”

“না, না, তার কোন দরকার নেই,” বলে উঠে দাঁড়ায় বাণেশ্বর, “এমনি গিয়েছিলাম ওধারে, দেখলাম না বাড়ীতে, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। আচ্ছা চলি।” ঘুরতে গিয়ে চোখ পড়ে বারান্দার একপাশে পড়ে থাকা এক জোড়া উপানৎএর ওপরে। চোখের মণি দুটো মুহূর্ত্তের জন্যে চিক্ চিক্ করে ওঠে বাণেশ্বরের। তারপরই দৃষ্টিতে সহজ ভাব নিয়ে এসে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, “জীবন-প্রসাদের চপ্পল না ?”

“হ্যাঁ,” হরদেও প্রসাদও সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেয়, “কাল এখানে আসবার সময় নতুন একজোড়া চপ্পল কিনে এনেছিল। যাওয়ার সময় নতুন জোড়া পায়ে দিয়ে গিয়েছে।”

“নতুন পেলে পুরোনর দিকে আর নজর দেয় না কেউ।”

“তাইত' দেখছি। ঝিকে বললাম, তুই নিয়ে যা। তা' সে উত্তর দিল—মরদই নেই তার চপ্পল দিয়ে কি করব ?”

হা হা করে হেসে ওঠে বাণেশ্বর। হাসতে হাসতেই জিজ্ঞাসা করে “মরদ কি হল ? কাবার ?”

“না।” হাসির সঙ্গে হাসি মিলিয়ে উত্তর দেয় হরদেও প্রসাদ,

"নতুন জরু মিলেছে তার, তাই পুরোনর দিকে আর নজর নেই।"

আরও জোরে হেসে ওঠে বাণেশ্বর। হাসতে হাসতেই বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে। পিছন পিছন গিয়ে সদর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে আসে হরদেও প্রসাদ।

অন্দরের একটি ঘরে প্রায় দম বন্ধ করে বসেছিল ব্রহ্মচারী ও কৈরালা। বাণেশ্বর প্রসাদ অপরিচিত নয় তাদের। বিগত যৌবন এক ঘরোয়ানা ঘরের ওয়ারীশ্ সে। পুঁজি বলতে পূর্বপুরুষদের নামের ছাপ আর নিজের কূটচক্র। ছাপের জোরে আমীর ওমরাহ্ মহলে প্রবেশ পথ পায়, কূটচক্রের জোরে নিজের আসনকে স্থায়ী করে সেখানে। নিষ্কলুষ পদক্ষেপ তার চিন্তাও করতে পারে না মানুষে। যেখানে যায় সেখানেই বিপত্তির সূত্রপাত। তাই তার আগমনকে বিশেষ ভীতির চক্ষেই দেখে সকলে। কিন্তু বলতে পারেনা কিছুই। বাদশাহের বিশেষ স্নেহভাজন হওয়ায় তাঁর দরবারেও ওর যথেষ্ট প্রতিপত্তি।

এহেন বাণেশ্বর যে এখানে ব্রহ্মচারীকেই খুঁজতে এসেছে সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না কারও। হরদেও প্রসাদ ঘরে ঢুকতেই বলে ওঠেন ব্রহ্মচারী, "আজ নয়, আমি কাল যাব।"

"না, এখুনি যাবে। বাণেশ্বর এখন আঁতিপাতি করে তোমাকে খুঁজবে, তারপর রাত্রিবেলা যাবে বাদশাজাদা হুমায়ুনের কাছে, এই বিশেষ খবরটা দিয়ে আসতে। তোমাকে তার পূর্বেই দিল্লীর সীমানা ছাড়িয়ে চলে যেতে হবে।" দৃঢ়স্বরে বলে হরদেও প্রসাদ।

সে কথা মেনে নিতে পারেন না ব্রহ্মচারী। সামান্য স্বার্থের খাতিরে এই বাণেশ্বর জাতীয় মানুষ দেশের এবং দশের চরম সর্বনাশ করতে ইতস্ততঃ করে না। আজ যদি সে না খুঁজে পায় তাঁকে তাহ'লে পরদিনই হরদেও প্রসাদের সংসারের প্রতিটি মানুষ চালান হয়ে যাবে পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে, কোন এক গুপ্ত কক্ষে।

যেখান থেকে কোন হতভাগ্যকেই মুক্ত হ'য়ে আসতে দেখেনি কেউ।

কিন্তু হরদেও প্রসাদ আজ মরিয়া। ব্রহ্মচারীর যুক্তির উত্তরে তাঁর হাতদুখানি চেপে ধরে বলে, "আমার এই সাধটি মেটাও তুমি। বহুদিন, বহুদিন থেকে' এই হিন্দুস্থানকে আর নিজের দেশ বলে ভাবতে পারছি না। একের পর এক আসছে, নিজেদের ভেতরে শক্তির লড়াই করে গিয়ে সিংহাসনে বসছে। আর আমরা, এই দেশ যাদের, তারা হ'য়ে রয়েছে নীরব দর্শক।"

উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকে হরদেও প্রসাদ। ঘরের ভেতরেই একবার দ্রুত পাক খেয়ে এসে আবার দাঁড়ায় ব্রহ্মচারীর মুখোমুখি হ'য়ে। স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে যৌবনের উপান্তে এসে দাঁড়ান মানুষটির মুখের দিকে। তারপর ধীর গম্ভীর স্বরে বলতে থাকে, "রাণা সঙ্গ পারেননি, কিন্তু প্রমাণ করে দিয়েছেন যে আমরা আজও শেষ হ'য়ে যাইনি। যুদ্ধের কৌশলে বা শক্তিতে নয়, একমাত্র কামানের জোরেই জিতেছিলেন বাবর। এখন আর বাবর নেই। হুমায়ুনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। এই সুযোগে যদি আর একবার—"

"হয়না।" হরদেও প্রসাদের সমস্ত অনুরোধকে দু'হাতে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ান ব্রহ্মচারী, "আমার দ্বারা এমন কোন কাজ হবে না যাতে আপনি বিপদে পড়েন। আজই আমি বাণেশ্বরের সঙ্গে দেখা করব। তারপর রাত্রির অন্ধকারে আমি ঠিক বেরিয়ে যাব : চিন্তা করবেন না। কিন্তু তার আগে দুটি কাজ শেষ করতে হবে আপনাকে। প্রথম কৈরালাকে দিয়ে ফুলের তোড়া পাঠাতে হবে বাদশাহের প্রাসাদে। সেটা এখুনি করুন। আর দ্বিতীয় কাজ, রাত্রে আমি রওনা দেওয়ার পর বাণেশ্বরকে একবার খবর পাঠিয়ে দেবেন যে আমি যমুনার তীর ধরে এলাহাবাদের দিকে চলেছি।"

"কেন?"

"জানতে পারবেন নিশ্চয়ই। তবে আমি এলাহাবাদ যাব না। সেকথা আপনাকে পূর্বেই বলেছি। ঠিক সন্ধ্যাবেলায় পূর্ব ফটকের কিছু দূরে যে ভিখারীটাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করতে দেখা যাবে তার কাছে যেন এই আফগান পোষাক পৌঁছে দেয় কৈরালা। আমি চলি। মহাদেওজী আপনাদের মঙ্গল করুন।"

উঠে বেরিয়ে যান ব্রহ্মচারী। কৈরালাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। যেতে হবে ফুলের খোঁজে।

আলখাল্লা গায়ে দাঁড়িয়ে আছে ফকিরটি। একটি হাত সামনেব দিকে প্রসারিত। মাথার ওপরে একটি গাছেব পত্রবহুল শাখা প্রশাখা। সন্ধ্যার অন্ধকারে স্থানটি হয়ে উঠেছে রহস্যময়। অস্ফুট গলায় ভিক্ষা চেয়ে চলেছে ফকির। প্রায় দুইশত হাত দূরে পূর্ব ফটক। প্রহরারত প্রহরী দু'জন বাদশাহের মৃত্যু সম্বন্ধীয় সত্য মিথ্যা খবরের আলোচনায় মশগুল। দু'চারজন এল কি গেল তা নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা নেই তাদেব। তেমনিই কয়েকজন দেহাতী লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ফটকের বাইরে আসে কৈরালা। কয়েকহাত এগিয়ে গিয়ে সঙ্গ ছেড়ে পিছিয়ে পড়তে থাকে। ক্রমে আরও পিছিয়ে যায়। তারপর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ফকিরের সামনে।

"কৈরালা!"

"চুপ কর।"

ফটকের দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়ায় কৈরালা। আফগান পোষাকের পুঁটুলিটা দেয় ফকিরের হাতে। ফকির তাড়াতাড়ি সেটা লুকিয়ে ফেলে আলখাল্লার ভেতরে।

"বাণেশ্বরকে বলে এসেছি যে তোমাকে যমুনার তার ধরে এলাহাবাদের দিকে যেতে দেখেছি।" বলে কৈরালা।

"আর কেউ ছিল সেখানে?" জিজ্ঞাসা করে ফকির।

"না।"

"ঠিক আছে। তুমি ঘুরে অন্য রাস্তা ধরে বাড়ী চলে যাও।"

"অস্ত্র?"

"আমি বিনা অস্ত্রে পথ চলি না। এখন যাও।"

কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকের একটি গ্রাম্য রাস্তা ধরে কৈরালা। ফকির তখনও দাঁড়িয়ে। আরও কিছুক্ষণ সময়ের ভেতরেও ভিক্ষা দেবার মত কোন মানুষ ফটক পেরিয়ে আসছে না দেখে সেও হাঁটতে থাকে। যমুনার দিকে যাওয়ার রাস্তা ধরে সে।

কিছুটা পথ এগিয়ে একটি জংলামত জায়গা দেখে দাঁড়িয়ে যায় সে। বর্তমান পবিধেয় ছেড়ে ফেলে আফগান পোষাকটি পরে। আলখাল্লার অন্তরালে সে তরোয়ালটি লুকিয়েছিল এতক্ষণ, এবারে সেটি স্পষ্টতঃই স্থান পায় কটিবন্ধে।

"এবারে বাণেশ্বর, যমুনার তীরেই তোমার শেষ শয়নেব সময় এসে গিয়েছে।"

আপন মনে বলে ওঠেন ব্রহ্মচারী। তারপর দৃঢ়পায়ে এগিয়ে চলতে থাকেন যমুনার দিকে।

উপকূল পথ ধরে চলা। কোথাও গ্রামীণ মানুষের পায়ে পায়ে হ'য়েছে পথের সৃষ্টি, কোথাও বা তাও নেই। তার ওপরে চাপ চাপ মেঘ এসে জমেছে আকাশে, অন্ধকারের ঘনত্বকে তুলেছে বাড়িয়ে।

পথ চলা কষ্টকর। তবুও চলতেই হবে। এই যমুনার তীর ধরেই। যতক্ষণ না বাণেশ্বরের দেখা পাওয়া যায়।

প্রয়াগক্ষেত্রের স্থির গম্ভীর যমুনা এ নয়। সেখানে সে মিশিয়ে দিয়েছে নিজেকে গঙ্গার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। এখানে তা নয়। উচ্ছলা যৌবনময়ীরূপে হাস্যে লাস্যে মাতিয়ে চলেছে। হাসতে হাসতে উপকূলভাগের যেখানে এসে লুটিয়ে পড়েছে সেইখানেই সৃষ্টি হয়েছে একটি খাঁড়ির। ফলে কিছুটা ঘুরে গিয়ে আবার সোজা পথ ধরতে হয় ব্রহ্মচারীকে। এমনি একটি খাঁড়ির কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়িয়ে যান ব্রহ্মচারী। তিনজন ঘোড়সওয়ার খাঁড়ি ঘুরে সামনের রাস্তা দিয়ে চলেছে। ওদের ভেতরে একজন নিশ্চয়ই বাণেশ্বর। দ্রুত চিন্তা করেন ব্রহ্মচারী। তারপরই চীৎকার করে ওঠেন, "হে...ই আসওয়ার—"

চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে যায় অশ্বকয়টি। তারপরই একজন সওয়ার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এগিয়ে আসতে থাকে ব্রহ্মচারীর দিকে। ব্রহ্মচারীও এগিয়ে যান। দু'জনে কাছাকাছি হ'তেই ব্রহ্মচারী দেখেন লোকটি একটি মোগল সিপাহ্। বাণেশ্বর তাহ'লে অদূরে অপেক্ষমান দু'জনের ভেতরে একজন। ভালই হয়েছে যে সে ই এগিয়ে আসেনি। তাহলে মোকাবিলাটা এইখানেই করতে হ'ত তাঁকে।

"তোমরা কি জীবন প্রসাদের খোঁজে এসেছ?" জিজ্ঞাসা করেন ব্রহ্মচারী।

"হ্যাঁ। তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম আছে আমাদের ওপর।" উত্তর দেয় সিপাহ্‌টি।

"কিন্তু এভাবে তো তাকে ধরতে পারবে না। বড় ওস্তাদ খেলোয়াড় সে। যদি তিনদিক থেকে গিয়ে আক্রমণ করতে পার তাকে, তাহ'লেই হয়ত' ধরা পড়তে পারে।"

"তুমি চেন তাকে ?" সিপাহ্‌টির গলায় সন্দেহের সুর।

"জরুর। দূর থেকে আমাকে দেখেই ঢুকে গেল গাঁয়ের ভেতরে।"

"এই গাঁও ?"

"হ্যাঁ। চল আমরা তিনজনে তিন দিক দিয়ে গিয়ে আক্রমণ করি তাকে। বড় জবরদস্ত্‌ আদমী। একবার যদি দরিয়ার ওপারে হিন্দু মহল্লায় গিয়ে ঢুকতে পারে তাহ'লে আর ধরতে পারবে না। চল।"

"কিন্তু বাণেশ্বরজী ? উনি আমাদের সঙ্গে যাবেন না ?"

"কোন প্রয়োজন নেই। বাণেশ্বরজী এখানেই অপেক্ষা করুক। আমরাই জীবন প্রসাদকে ধরে নিয়ে আসব তার কাছে।"

"বেশ চল।"

"তাহ'লে যাও, তোমার সঙ্গী সিপাহ্‌কে ডেকে নিয়ে এস। আমি গাঁও এর দিকে এগুচ্ছি।"

কথা শেষ করে আর অপেক্ষা করেন না ব্রহ্মচারী। সোজা হাঁটতে থাকেন গ্রামের দিকে। কিন্তু বেশীদূর নয়। তারপরই গতি কমিয়ে দিয়ে লক্ষ্য করতে থাকেন মোগল সিপাহ্‌ দুইটি কোন দিকে যায়।

কিছুক্ষণ ধরে কি যেন আলোচনা করে সিপাহ্‌ দু'জন আর বাণেশ্বর। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ায় বাণেশ্বর আর তার সঙ্গী দুইটি গ্রামের রাস্তা ধরে। দ্রুতপায়ে আরও কিছুটা রাস্তা এগিয়ে যান ব্রহ্মচারী। গিয়ে দাঁড়ান একটি গাছের আড়ালে। সিপাহ্‌ দু'জন চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর আবার ফিরে দাঁড়ান। খাঁড়ি খুব বেশী দূরে নয়। তাছাড়া মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। দৃষ্টি চলে না অধিক দূর পর্য্যন্ত। উত্তেজনার কম্পন অনুভব করেন তিনি স্নায়ুতে স্নায়ুতে। একছুটে

গিয়ে নেমে পড়েন খাঁড়িব ঢালু পাড় ধরে। পাড়ের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে যেতে থাকেন যেদিকে একা বাণেশ্বর দাঁড়িয়ে আছে তার সিপাহ্ দু'জনেব ফিরে আসার অপেক্ষায়। ক্রমে বড় হ'তে থাকে খাঁড়ির মুখ। পাড়ও হয়ে আসে নীচু। দাঁড়াতে গেলেই বাণেশ্বরের দৃষ্টিতে এসে যাওয়ার সম্ভাবনা। পাড়ের সঙ্গে গা মিশিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন তিনি। কেবলমাত্র মাথাটি উঁচিয়ে দেখতে থাকেন তাঁর লক্ষ্যটিকে। পাঁয়চারি করছে। এধার থেকে ওধার। আর মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে তাকিয়ে দেখছে গ্রামের দিকে। মনে মনে হিসাব করেন তিনি খাঁড়ি থেকে বাণেশ্বর কতটা পথ হবে। খুব বেশীদূর নয়। দ্রুত ছুটলে এক নিঃশ্বাসেই পৌছান যেতে পারে। হিসাব শেষ। আবার অপেক্ষার পালা। ওদিকে সমান তালে পাঁয়চারি করে চলেছে বাণেশ্বর। ঐ এদিকে এল। এবারে ফিরবার পালা। চার হাতপায়ে ভর দিয়ে পাড়ের ওপরে উঠে পড়েন ব্রহ্মচারী। বাঁ-হাতে কোষশুদ্ধ তরোয়ালটি শক্ত করে চেপে ধরে তীরবেগে এগিয়ে যান বাণেশ্বরের দিকে।

অন্যমনস্ক বাণেশ্বব। সমস্ত চিন্তা তার কেন্দ্রীভূত হয়েছে ব্রহ্মচারীকে ঘিরে। কখন তাকে ধরে আনবে সিপাহ্‌রা আব তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বাদশাহ্‌জাদা হুমায়ুনের সামনে হাজির করে ইনাম নেবে সে। হঠাৎ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় চিন্তার সূত্রটা। পিছনে কার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না? সাঁ করে ঘুবে দাঁড়িয়েই কোষমুক্ত করে নেয় তরোয়ালটা। ওদিকে ব্রহ্মচারীও এসে পড়েছেন কয়েক হাতের ভেতরে। ঝপ্ করে দাঁড়িয়ে গিয়েই একটানে তবোয়ালটা তুলে নেন হাতে।

"বাণেশ্বর! নিজের সামান্য স্বার্থের জন্যে অনেক সর্বনাশ করেছ তুমি দেশের। আজ নিজের বুকের রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করে যাও।" দাঁতে দাঁত চেপে কেটে কেটে বলে ওঠেন ব্রহ্মচারী।

"না, না, আমি সামান্য মানুষ জীবন প্রসাদ," মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে বাণেশ্বর, "আমাকে যেতে দাও, তোমার দুটি পায়ে পড়েছি আমি।"

"তা আর হয় না। চুণারের জায়গীর থেকে শিবপ্রসাদকে সরিয়ে দেবার বুদ্ধি ইব্রাহিম লোদীকে কে দিয়েছিল বাণেশ্বর? মৃত্যুর সময়েও আমার হাত দু'খানি ধরে তিনি কেঁদে বলেছিলেন—এর প্রতিশোধ তুই নিস্। আজ এসেছে সেই প্রতিশোধ নেবার সময়—" বলতে বলতেই লাফিয়ে বাণেশ্বরের সামনে গিয়ে দাঁড়ান ব্রহ্মচারী। শিস্ দিয়ে বাতাস কেটে এদিক ওদিকে চলতে থাকে তাঁর তরোয়াল। বাণেশ্বরের বুদ্ধি খেলে কিন্তু অস্ত্র খেলে না। কোনরকমে গোটা দুই আঘাত ঠেকিয়েই চীৎকার করে সিপাহ্‌দের ডাকতে থাকে সে।

"ডাক্, আরও জোরে ডাক্," বলে এক চরম আঘাত হানে ব্রহ্মচারী। ঠং ক'রে এক শব্দের সঙ্গে আগুন ছিট্‌কে ওঠে দুই ইস্পাত ফলার ঘর্ষণে। বাণেশ্বরের হাতের অস্ত্র ছিট্‌কে গিয়ে পড়ে অদূরে। আর উপায় নেই। মৃত্যু ভয়ে ভীত সে বাঁচবার শেষ চেষ্টা করে। ছুটে যেতে থাকে যমুনার দিকে। কিন্তু সে সুযোগও মেলে না। বিরাট এক লাফে এগিয়ে এসে হস্তধৃত তরোয়ালটির প্রায় অর্দ্ধাংশ তার দেহ ভেদ করে চালিয়ে দেন ব্রহ্মচারী। তবুও ছোটার বেগে কয়েক পা এগিয়ে যায় বাণেশ্বর। তারপরই সমূলে উৎপাটিত বৃক্ষকাণ্ডের মত আছড়ে পড়ে। এগিয়ে গিয়ে আপন তরোয়ালটি একটানে তুলে নিয়ে যমুনায় গিয়ে নামেন ব্রহ্মচারী। অস্ত্রের গা থেকে রক্তের দাগ ধুয়ে নেন। সেটিকে কোষবদ্ধ করে অঞ্জলি ভরে জল নেন হাতে। বলতে থাকেন—

"তোমার অন্তিম ইচ্ছা আমি পূর্ণ করেছি বাবা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যতদিন না তোমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারব ততদিন পর্যন্ত ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করব। আজ মুক্ত আমি।

পূর্ণাঞ্জলি দিচ্ছি, তুমি যেখানেই থাক, শান্ত হও।"

অঞ্জলি দান শেষ করেন ব্রহ্মচারী। ধীরে ধীরে উঠে যান ওপরে। বাণেশ্বরের ঘোড়াটি বাঁধা রয়েছে একটি গাছের সঙ্গে। এগিয়ে যান সেদিকে। বাঁধন খুলে বল্গা হাতে নেন। অভ্যস্থ সওয়ারের মতই লাফিয়ে উঠে বসেন অশ্বপৃষ্ঠে। ছ'পায়ের সামান্য ঠোকায় ইসারা করেন জীবটিকে ছুটে চলতে।

"আপনি মালিক, যদি জোর করেন, 'না' বলতে পারব না। কিন্তু আমার মনে হয় এ সাদী না হওয়াই ভাল।" চোখের জলে ছ'গাল ভাসিয়ে কোনরকমে কথা কয়টি বলে আমিনা।

দবীরের মনেও অপরাধ বোধটি অত্যন্ত সচেতন। এক চরম উত্তেজনায় যে নৃশংস কাজ সে করেছে তার অনুতাপে নিয়ত জ্বলে পুড়ে মরছে। কিন্তু করবার আর কিই-বা ছিল। নকাবের সঙ্গে সঙ্গে আম্মাও যে শেষ হ'য়ে যেত। মাঝে মাঝে বেঁকে বসে মন—না, ঠিকই করেছে সে। যে মানুষ একটি আওরতের কথায় নিজের স্ত্রীপুত্রকে না খেতে দিয়ে মারতে চায় তব মরণই মঙ্গল। চিন্তার টানাপোড়েনে অস্থির হয়ে ওঠে দবীর। সামনেই দাঁড়িয়ে আমিনা। তার মনটিকেও সে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছে। জানে দবীর, 'তুমি'র নৈকট্য থেকে আপনি'র দূরত্বে সরে যেতে কতখানি চোখের জল ফেলতে হয়েছে এই মেয়েটিকে। কিন্তু বলতে পারে না কিছুই। তার বদনসীবের সঙ্গে কেউ যদি নিজের জীন্দগীকে জড়িয়ে ফেলতে না চায়, সেখানে কিছুই বলবার নেই তার।

"আমি যাই, আম্মা উঠে পড়বে এখুনি।"

আমিনার কথা শুনে চমকে তার মুখের দিকে তাকায় দবীর। মুখের ওপরে টেনে আনা গাম্ভীর্যের আবরণটি ভেদ করে দেখতে

চায় তার অন্তরটিকে। ওকি চিরদিনের মতই ভুলে যেতে চায় দবীরকে? অর্থাৎ এই পৃথিবীতে সে আজ নিতান্তই একা! ভাষা জিনিষটা যে কি তাই-ই ভুলে গিয়েছে আম্মা। আজ পর্যন্ত একটি কথাও বলেনি তার সঙ্গে। কেবল তার সঙ্গে নয়, কারও সঙ্গেই বলেনি। মানুষ দেখলেই নিজের ঘরের কোনটিতে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে, আর নয়ত' গিয়ে দাঁড়ায় উত্তরের প্রাচীর ধারে, এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে গঙ্গার দিকে। আর ছিল আমিনা। যাকে ঘিরে সে গড়ে তুলেছিল নিজের খোয়াব। এই মরুভূমির ভেতরে যে ছিল তার একমাত্র পান্থপাদপ। কিন্তু সেও কেমন সরিয়ে নিল নিজেকে।

"এ একরকম ভালই হ'ল," উঠে দাঁড়ায় দবীর, "আমার অভিষপ্ত জীবনের সঙ্গে কেউ জড়িয়ে থাকবে না। নিজেকে মুক্ত বলে ভাবতে পারব। খোদা তোমাকে সুখী করুন।"

কথা শেষ করে আর দাঁড়ায় না দবীর। ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা হাঁটতে থাকে দুর্গের দিকে। কি একটা যেন চিন্তা করতে চাইছে কিন্তু পারছে না। বিরাট শূন্যতার ভেতরে ঘুরপাক খেয়ে মরছে মনটা।

অন্যমনস্ক পথ চলা। ভাবতেই ভুলে গিয়েছিল দবীর যে দুর্গের অভ্যন্তরে যতই নিশ্চিন্ত থাকুক বাইরের জীবন মোটেই নির্বিঘ্ন নয় তার পক্ষে। মীর আহ্‌মদের দলীয় লোকেরা বিষাক্ত বীজানুর মত ছড়িয়ে রয়েছে চুণারের আনাচে কানাচে। আছে সুযোগের প্রত্যাশায়। সামান্য দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পেলেই তীব্র বেগে আক্রমণ করে অধিকার করে বসবে দুর্গ-দেহটিকে। চিন্তার কুয়াশায় আচ্ছন্ন আবছায়া দৃষ্টি। খেয়ালই করেনি কে আসছে তার দিকে এগিয়ে। মানুষটি অত্যন্ত কাছে এসে দাঁড়াতেই থেমে যায় পা। অত্যন্ত সাধারণ একটি মানুষ। বিশেষত্বের ভেতরে

শুধু তার চোখ দুটি। তীব্র অনুসন্ধানী দৃষ্টি। দবীরেরই নিয়োজিত এক গুপ্তচর।

তসলিম জানায় লোকটি।

"খবর পেলে?" জিজ্ঞাসা করে দবীর।

"না জনাব। চুণারের ধারে কাছে কোথাও তারা নেই। আমার মনে হয় সাসারাম অথবা গৌড়ে চলে গিয়েছে।"

"তাদের বোনকে এখানে ফেলে রেখে?"

দবীরের প্রশ্নে একটুকরো ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে গুপ্তচরটির ঠোঁটের কোনে। বলে, "জনাব, বহিন্‌তো নিজেদের রাস্তা পরিষ্কার করবার জন্যে। সে যদি আটকই থাকল তো তার ওপরে আর মায়া রেখে লাভ কি? হিন্দুদের মত মায়া রাখলে কি আর আফগান, পারস্য থেকে এই হিন্দুস্তানে এসে রাজত্ব করা যায়?"

হয়ত' ঠিক, হয়ত' ঠিক নয় এই গুপ্তচরের কথা। কিন্তু তা নিয়ে বিচার করতে বসবার মত মানসিক অবস্থাও নেই দবীরের। সামান্য এক কথায় আরও তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে আদেশ দিয়েই বিদায় দেয় লোকটিকে। তারপর ঘুরে চলতে থাকে সিপাহ্-মহল্লার দিকে।

মহল্লার গলি পথ দিয়ে চলতে থাকে দবীর। আমিনার কাছ থেকে ফেরবার সময়কার দবীর আর নয় সে। সম্পূর্ণ সচেতন সতর্ক দৃষ্টি। এতখানি সতর্ক হয়ত সে হ'ত না কোনদিনও। হুইয়ে দিয়েছে দু'জন সিপাহ্। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে। অনেকদিন আমিনার কাছে যাওয়া হয়নি। দ্বিধার জড়তায় জড়িয়ে গিয়েছিল পা দুটি। ইচ্ছা থাকলেও সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। ভেবেছিল আব্বাস খাঁর কাছ থেকে আমিনার মনের খবরটি যাতে কোন রকমে জানতে পারে তারই চেষ্টা করবে প্রথমে। কিন্তু কিছুই পায়নি। প্রতিদিনই এসেছে আব্বাস খাঁ। প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তাও বলেছে। তারপর চলে গিয়েছে এমন এক গাম্ভীর্য

নিয়ে যে দ্বিতীয় কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার মত অবকাশই পায়নি দবীর। চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল সে। তাহ'লে কি সে আর আকাঙ্ক্ষিত নয় আব্বাস খাঁর গৃহে? কিন্তু সে কথা ওরা স্পষ্ট করে বলে নাইবা কেন? সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছিল দবীর। হন্‌হন্ ক'রে গিয়ে উঠেছিল আব্বাস খাঁর গৃহে। কিন্তু তারপর? প্রস্তরীভূত দেহখানিকে দিয়ে আর কোন কাজই করাতে পারেনি সে। না পেরেছে কাউকে ডাকতে, না পেরেছে দরজার গায়ে আঘাত দিয়ে নিজের আগমনের সংবাদ জানাতে। বৃথাই কিছু সময় ধরে দাঁড়িয়ে থেকে শেষে মাথা নীচু করে ফিরে এসেছে। সিপাহ্-মহল্লার কাছে আসতেই একবার পুরো মহল্লাটা ঘুরে দেখবার ইচ্ছা হয় তার। যেমন মনে হওয়া তেমনি এগুতে থাকে সে। কিন্তু কেমন একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া। মনে হয় কেউ বা কারা দৃষ্টি রেখে চলেছে তার ওপরে। আপন মনের দুর্বলতা ভেবে সে ভাবটিকেও স্থায়ী হ'তে দেয় না দবীর। চলতে থাকে এগিয়ে, নিঃসন্দিগ্ধ মনে। এমন সময় একটি ঘর থেকে দু'জন সিপাহ্কে খোলা তবোয়াল হাতে তার দিকে ছুটে আসতে দেখে কঠিন হয়ে ওঠে তার সমস্ত দেহ। এক ঝট্‌কায় কোষমুক্ত করে নেয় তার তরোয়াল। আক্রমণকারীদের অস্ত্রের আয়ত্বের ভেতরে আসবার অপেক্ষা করতে থাকে। ছুটে এগিয়ে এসেই দাঁড়িয়ে যায় সিপাহ্ দু'জন। যথারীতি কুর্নিশ করে বলে, "জনাব এভাবে একা একা যাবেন না। আপনার পিছনে সর্বদাই দুষমণ লেগে আছে। বাইরে বেরুবার দরকার হ'লে আমাদের ডেকে পাঠাবেন, আমরা সঙ্গে থাকব।"

"কোথায় থাক তোমরা?"

"এই ১২ আর ১৩ সংখ্যার ঘরে। সিপাহ্-শালার আমাদের চেনেন জনাব।"

"সিপাহ্‌-শালার কোথায়?"

"একদল নতুন সৈন্য নেওয়া হয়েছে। উত্তরের ময়দানে তাদের কুচ-কাওয়াজ হচ্ছে, তাই দেখতে গিয়েছেন।"

"চল দেখে আসি।" এগিয়ে যেতে থাকে দবীর।

সিপাহ্‌ দু'জন তার পাশে পাশে হাঁটতে থাকে।

সেদিনের অভিজ্ঞতা নিয়েই এইদিন সতর্কভাবে চলেছিল সে। এমন সময় মহল্লার শেষদিক থেকে আব্বাস খাঁকে আসতে দেখা যায়। কণ্ঠস্বর এবং পদক্ষেপ উভয়েই বিশেষ উত্তেজনার প্রকাশ। পিছনে কয়েকজন সিপাহ্‌। তাদের ভেতরে একজন কি একটা কথা বলতে যেতেই জোরে ধমকে ওঠে আব্বাস খাঁ। এতদূর থেকে কথাগুলি শুনতে পায় না বটে কিন্তু ঘটনা যে একটা কিছু ঘটেছে তা বেশ বুঝতে পারে দবীর।

দূর থেকে তাকে দেখে আরও দ্রুত এগিয়ে আসে আব্বাস খাঁ। নিকটে এসে দাঁড়াবারও বুঝি অপেক্ষা রাখতে পারে না। তার পূর্বেই উত্তেজিতভাবে বলতে সুরু করে, "যে ভয় করেছিলাম ঠিক তাই হয়েছে।"

"কি হয়েছে?" সিপাহ্‌শালার কয়েক হাত দূরে থাকতেই জিজ্ঞাসা করে দবীর।

ততক্ষণে আব্বাস খাঁও সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্নের জবাব দেয়, "কিছু সংখ্যক সিপাহ্‌ মীর আহ্‌মদের খুব বাধ্য দেখে আমি একটু সাবধান হয়ে যাই। অন্ততঃ তাদের সংখ্যা যেন তুলনায় অত্যন্ত কম হয় সেই চেষ্টাই করছিলাম। আর সেইজন্যেই নতুন কিছু সিপাহ্‌ও নিয়েছি কিছুদিন হ'ল। এতে একটু ভীতই হয়ে পড়েছিল তারা। আমিও নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। কিন্তু আজ সকালে খবর পেলাম তারা উল্টো আঘাত হেনে গিয়েছে।"

"কি রকম?"

"কোথায় চলে গিয়েছে তারা। আর যাবার সময় নিজেদেরত' বটেই অন্যান্য বহু সিপাহ্‌এরও অস্ত্র নিয়ে গিয়েছে। এখন আবার নতুন ক'রে অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে।"

"কোথায় গিয়েছে বলে মনে হয়?"

"সাসারাম।"

সাসারাম! শঙ্কিত হয়ে ওঠে দবীর। হিন্দুস্থানের এক অমোঘ ভাগ্যলেখা যেন ক্রমেই স্পষ্ট আকার ধারণ করছে। করভ বলে আজ যাকে অবহেলা করে চলেছে সকলে, তাকেই একদিন দেখা যাবে যূথপতিরূপে। তখন তার সেই শক্তিকে রুখবার ক্ষমতা হয়ত' কারও হবে না।

"আপনি এখন কি উপদেশ দেন?" দবীরের কণ্ঠস্বরটা অসহায়ের মত শোনায়।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে গিয়েও চেপে যায় আব্বাস খাঁ। আশে পাশে দাঁড়ি রয়েছে কয়েকজন সিপাহ্‌। তাদের উপস্থিতিতে কোনও গোপন কথা বলা আর ঢাক পিটিয়ে প্রচার করা একই কথা।

"এস, আলোচনা করে দেখা যাক কোনও উপায় খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।"

কথাটা বলে আর দাঁড়ায় না আব্বাস খাঁ। ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে নিজের বাড়ীর দিকে। সেখানে যাওয়ার আর ইচ্ছা ছিল না দবীরের। কিন্তু সিপাহ্‌শালারের মত শুভানুধ্যায়ীকে অসন্তুষ্ট করতে সাহস হয় না তার। ফিরে দাঁড়িয়ে সেও চলতে থাকে আব্বাস খাঁর সঙ্গে সঙ্গে।

আব্বাজানের সাড়া পেয়ে এক লহমার জন্যে বাইরে এসেছিল আমিনা, দবীরকে দেখে তখুনি আবার অন্দরে চলে যায়। দবীরের

মত আব্বাস খাঁও লক্ষ্য করে তা। কিছু একটা বলতে গিয়েও পারে না। "ই" বলে আরম্ভ করতে গিয়েও কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, "এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে দিল্লী যাওয়া। হুমায়ুন এতদিনে নিশ্চয়ই সিংহাসনে বসেছেন। শের খাঁ যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করবার পূর্বেই বাদশাহের কাছে এই সংবাদটি পাঠাতে হবে। নইলে শের খাঁর প্রথম আঘাতটি এসে পড়বে এই চুণারের ওপরেই।"

কথা বলতে বলতে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢোকে আব্বাস খাঁ। একটা কুর্শি টেনে দিয়ে বসতে বলে দবীরকে। কিন্তু বসে না সে। নেহাৎই সৌজন্যের আসনখানি আঁকড়ে ধরে আর কি লাভ হবে তার? প্রয়োজনের কথা যখন শেষ হয়ে গিয়েছে তখন যত শীঘ্র এস্থান ত্যাগ করে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। আশ্চর্য! আমিনা একবার তার মনের অবস্থাটির কথা চিন্তা করেও দেখল না! সাধারণ আর পাঁচজনের মত সেও শুধু কাজ দেখেই বিচার করল! এতই ঠুন্‌কো তার মহব্বৎ! অভিমানটা চুণার দুর্গের উত্তর দিকে ধাক্কা খাওয়া গঙ্গার মত পাকে পাকে গুম্‌রে গুম্‌রে উঠছে। আর অধিকক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও কষ্টকর দবীরের পক্ষে।

"তাহ'লে বিশ্বাসী কোন লোককে দিল্লী পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।" বলে আর দাঁড়ায় না সে। সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে হন্ হন্ করে চলতে থাকে দুর্গের অভিমুখে।

সেই বিশ্বাসী লোক যখন পাওয়া গেল তখন বর্ষা এসে গিয়েছে। বিশেষ করে এ অঞ্চলের ঋতু বড় সাড়া দিয়ে আসে। গ্রীষ্মে যেমন গরম, শীতেও তেমনি হাড়ের গায়ে দংষ্ট্রাঘাত করে। আবার বর্ষায় পঙ্গু করে ফেলে দৈনন্দিন জীবন-চালনাকে। পশ্চিমে নদী, পূর্বেও নদী। বুক ছাপিয়ে উতলোন জল তাদের এসে পড়ে রাস্তার ওপরে।

ক্রমেই বাড়তে থাকে তা। ছোট্ট চকের পাথর বাঁধান চত্বরটি আর দেখা যায় না। শব্জী আর মাংস বিক্রেতারা মাথায় পসরা নিয়ে মাজা সমান জল ভেঙ্গে এসে দাঁড়ায় গৃহস্থের ঘরের দরজায়। অগ্নিমূল্য সব। এক ঢেবুয়ার জিনিস তিন ঢেবুয়া দিয়ে কিনতে হয়। কুয়োগুলিরও ঘটেছে সলিল সমাধি। খাওয়ার জলের অভাব। দরাজ হুকুম দিয়েছে দবীর, "হাতী নিয়ে বের হও, দেখ কোথাও ভাল জলের কুয়ো পাওয়া যায় কিনা। হাতীর পিঠে করে জল এনে দেবে প্রত্যেক বাড়ীতে।" সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ জানিয়েছে আব্বাস খাঁকে, "কোন প্রজা যেন বিপদে না পড়ে সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন।"

"তা রাখব," বলে অন্যকথা পেড়েছিল আব্বাস খাঁ। একটু রহস্য করেই বলেছিল, "আমিওত' তোমার প্রজা। আমার বাড়ীতেও যে বিপদ।"

"বিপদ?" চম্‌কে উঠেছিল দবীর, "কি বিপদ?"

"মেয়েটা শুধু কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলে বলেনা কিছুই।"

"সূর্য তার তেজে জল এনে দেয় মেঘের চোখে। সেই চোখের জলই কখন কম কখন বা বেশী হয়ে ঝরে পড়ে। আপনার কন্যার ভেতরেও তেমনি কোন তেজ আছে যার জ্বালা শুধু জলই এনে দিচ্ছে তার চোখে, শান্তি দিচ্ছে না।" কথাটি বলে একটা টানা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দবীর, "যে মহাপাপ করেছি, শান্তি বোধহয় আর পাব না।" বলতে বলতেই উঠে দাঁড়ায় সে। চঞ্চল হয়ে উঠেছে মন। আমিনা ভুলতে পারেনি তাকে। আবার গ্রহণ করতেও পারে নি। বরবাদ হ'য়ে গেল ওর জিন্দ্‌গী, সঙ্গে সঙ্গে তার নিজেরও।

সিপাহ্‌শালারকে বিদায় দিয়ে গিয়ে ঢোকে আম্মার ঘরে। বৃন্তচ্যুত শুক্‌নো ফুলের মতই হ'য়ে গিয়েছে আম্মা। চুপ করে বসে

থাকে এক মূক পঙ্গুর দৃষ্টি নিয়ে। চোখ দুটিই তার সব। তার মনের প্রকাশ। দবীর ঘরে ঢুকতে একবার তার দিকে তাকায় সফিদা বেগম, তারপরই চোখ ফিরিয়ে নেয়। প্রতিদিনের মত আজও আম্মার এই নির্লিপ্ততায় বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে দবীরের। স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে আম্মার দিকে। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। গিয়ে দাঁড়ায় সফিদার পাশে। তার একখানি হাত নিজের হাতের ভেতরে তুলে নেয়। বলে, "আমি নিজেই অনেক শাস্তি পাচ্ছি মা, আরও কত পাব। তুমি আর আমাকে শাস্তি দিও না।" তারপর ধীরে ধীরে আম্মার হাতখানি নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসে নিজের ঘরে।

বর্ষার মেঘে ঢাকা দিন। বেলা থাকতেই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। নিজের জীবনের সঙ্গে যেন এর একটা মিল খুঁজে পায় দবীর। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেই কথাই ভাবতে থাকে। এমন সময় বাইরে থেকে কার ডাক শোনা যায়, "জনাব!"

"কে?" বলে সাড়া দিয়ে এগিয়ে যায় দবীর। দেখে একটি অপরিচিত লোক। সিক্ত পোষাকে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দার নীচে।

"কি চাও?" এগিয়ে দিয়ে তার সামনে দাঁড়ায় দবীর।

"খোঁজ পেয়েছি জনাব।" ব্যস্তভাবে বলতে থাকে লোকটি, "দরিয়ার উপার মোহনপুর গাঁয়ে এসে রয়েছে ইশাক। যদি অনুমতি করেন তাহলে আমরা কয়েকজন—"

"না। ধরে আনবার দরকার নেই। শুধু নজর রাখবে দরিয়ার এপারে যেন সে না আসতে পারে। দাঁড়াও, তোমার বখসিস নিয়ে যাও," বলে ঘরে ঢুকে যায় দবীর। একটু পরেই ফিরে এসে কয়টি রৌপ্য আসরফী দেয় লোকটিকে। দিয়ে আবার সাবধান করে দেয় লোকটিকে, "সাবধান, মনে থাকে যেন কিছুতেই দরিয়ার এপারে আসতে দেবে না ইশাককে।"

"জী জনাব," বলে কুর্ণিশ করে লোকটি।

দবীরও তার বখসিস ও হুকুমদান শেষ হ'য়েছে ভেবে ফিরে যায় নিজের ঘরে।

লোকটি কিন্তু তখুনি যায় না। এদিক ওদিক তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয় যে তাকে লক্ষ্য করবার মত কেউ নেই বাইরে। বৃষ্টিঝরা দিনের এই সুবিধাটুকুই সে চেয়েছিল। এসেছিলও তাই এমন দিন বেছে নিয়েই। নিঃশব্দ পায়ে সে এগিয়ে যায় মালিকার মহলের দিকে। তার চলা দেখে মনে হয় এই মহলের বিশেষ বিবরণ নিয়েই সে এসেছে। জাফরি ঢাকা দেহলীতে উঠে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয় সে। মৃদু কয়টি আঘাত করে দরজায়। অপেক্ষা করতে থাকে। একটু পরেই খুলে যায় দরজা।

"কি চাই?"

মুশকিলে পড়ে যায় লোকটি। যে কাজে সে এসেছে তা দ্বিতীয় কাউকে বলবার নয়। অথচ ওড়না ঢাকা চেহারা দেখে বুঝতে পারছে না এ বেগম না বাঁদী।

"কি দরকার ঝট্‌পট্ বল?" উগ্র হয়ে ওঠে স্ত্রীলোকটির কণ্ঠস্বর।

"আজ্ঞে, বেগমসাহেবা—" থতমত খেয়ে বলে ওঠে লোকটি।

"আমি।"

"কিন্তু সঠিক কোনও নিদর্শন না পেলে আমি কিছুই বলতে পারছি না।"

এবারে মুখের ওপর থেকে ওড়নার আবরণটি খুলে ফেলে মালিকা। দেখে চমকে ওঠে লোকটি। এ রূপ, না আগুন? এর দাহ্য-শক্তিতে শুধু তাজ খাঁ কেন আরও কতজনে পুড়ে মরবে, কে জানে? তাড়াতাড়ি কুর্ণিশ করে বলে—"আজ রাত্রে উত্তর দিকে পাঁচিলের কাছে থাকবেন। ইশাক সাহেব আসবে।"

কথা শেষ করে আর দাঁড়ায় না লোকটি। দ্বিতীয় দফার কুর্ণিশ জানিয়ে নেমে যায় দেহলী থেকে।

আর বুকের ভেতরে রক্তের আস্ফালন, দু'চোখে আগুনের দৃষ্টি নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে মালিকা।

বায়না ধরা শিশু যেমন কাঁদতে কাঁদতে হাঁফিয়ে যায়, দম নিয়ে আবার কাঁদতে থাকে, তেমনি হয়েছে আকাশের অবস্থা। সকাল থেকে ঝরতে আরম্ভ হয়েছে, মাঝখানে বার দুই একটু সময়ের জন্যে থেমেছিল তারপর সেই যে আরম্ভ হয়েছে বিকেল বেলা, আর থামবার নামটিও করছে না। নিস্তব্ধ পৃথিবীতে একঘেয়ে ঝর্ ঝর্ শব্দই শুধু শোনা যায়। কিন্তু সে শব্দও শোনবার জন্যে জেগে বসে থাকে না কেউ। পঙ্গু জীবনের শান্তি একমাত্র নিদ্রায়। জাগরণেই তার বিরক্তি আর রাজ্য জোড়া অসহায় ক্রোধ। প্রকাশ করবার রাস্তা নেই। তাই নিদ্রাকেই পরম আরাধ্য জ্ঞান করতে বাধ্য হয়েছে সকলে। দুর্গের অভ্যন্তরেও সেই একই অবস্থা। একমাত্র মালিকার চোখে ঘুম নেই। বুকের ভেতরে প্রতিহিংসার ধুনি জ্বালিয়ে নিয়ে বসে রয়েছে সে। ক্রমে রাত বাড়ে। সময় হয়েছে ভেবে উঠে দাঁড়ায় মালিকা। ভেজান দরজাটা নিঃশব্দে খুলে ফেলে। মাথা গা ঢেকে নেয় কালো একটি ওড়নায়। তারপর আলতো পায়ে গিয়ে দাঁড়ায় উত্তর দিকের প্রাচীরের পাশে। দেহ ঝুঁকিয়ে দেখতে থাকে ওধারে নীচে কাউকে দেখা যায় কিনা।

অন্ধকারে প্রথম দিকে দেখা যায় না কিছুই। মনে হয় ওটা একটা কালো সমতলের রাজ্য। তারপর দৃষ্টি অভ্যস্থ হ'য়ে এলে দেখতে পায় উত্তর দিকের গণ্ডশিলার ওপরে দুইটি মানুষ দাঁড়িয়ে। হাত নেড়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করবার চেষ্টা করে মালিকা। সক্ষম হয় না। শেষে ওড়নাটি টেনে নেয় গা থেকে। বৃষ্টিতে ভিজে সপ্ সপ্ করছে। তাহ'ক, সেইটিকে নিয়েই প্রাচীরের বাইরে জোরে নাড়াতে থাকে সে। এবারে বুঝি দেখতে পায় মানুষ দুইটি। তাদের ভেতরে একজন কি যেন একটা জোরে ছুঁড়ে দেয়। ঠক্ ক'রে এসে পড়ে সেটি প্রাচীরের এধারে। ছুটে গিয়ে সেটি ধরতে যায় মালিকা। বাধা পায় কিসে। হাত দিয়ে ধরে জিনিসটি। সরু শক্ত দড়ি। ঢিল বেঁধে ছুঁড়ে দিয়েছে, বুঝতে পারে সে। দড়িটি ধরে টানতে থাকে। অনেকখানি টানবার পর সেই সরু দড়ির সঙ্গে বাঁধা মোটা একগাছি দড়ির একাংশ উঠে আসে। এবারে? দ্রুত চিন্তা করতে থাকে মালিকা। এধারে এই দড়িগাছ বাঁধবার মত কিছুই নেই যে! নাইবা থাকল, মনস্থির করে ফেলে সে, নিজের দেহের সঙ্গেই ভাল করে জড়িয়ে নেয় দড়িগাছ। তারপর প্রাচীরের সঙ্গে দু'পা বাধিয়ে কাত হয়ে পড়ে। ওধার থেকে টান পড়েছে দড়িতে। বোধহয় দড়ি বেয়ে উঠে আসছে ইশাক। চিত হয়ে শুয়ে পড়বার চেষ্টা করে মালিকা। পারে না। দড়ির টানে একটু একটু ক'রে উঠে সোজা হ'য়ে যাচ্ছে তার দেহটা। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সে। বড় জোর ঝাঁকি লাগছে দড়িতে। বোঝা যাচ্ছে, অনেকখানি উপরে উঠে এসেছে ইশাক। আর কয়েকটি মুহূর্ত্ত। দম বন্ধ করে পড়ে থাকে সে। শেষে একসময় শেষ হয় এই শক্তি পরীক্ষার। প্রাচীরের ওপরে এসে দাঁড়ায় ইশাক্। নিঃশব্দে নেমে পড়ে এধারে। দেহে জড়ান দড়িগাছ খসিয়ে ফেলে মালিকা। ইশাকের সঙ্গে নিজের মহলে গিয়ে ঢোকে।

"খবর কি বল?" ঘরে ঢুকে বসবার ধৈর্যটুকুও ধরতে পারে না মালিকা।

"একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করতে এলাম।" বলেই ঘুরে

গল্প বলবার মত করে বলতে সুরু করে ইশাক, "সেদিন শের খাঁর ওখানে গিয়েছিলাম, বুঝলি? এত লেখাপড়া জানা মানুষ, সাসারামের জায়গীরদার, আর জালাল খাঁর রাজ্যতো উনিই চালান, কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার নেই। আমাকে ডেকে বসালেন। কত গল্প করলেন। তারপর তোর খবর শুনে আফশোষও করলেন।"

তার কথা শুনে আফশোষ কেন করবে শের খাঁ, ঠিক বুঝতে পারে না মালিকা। তাহ'লেও কোন প্রশ্ন ক'রে না সে।

"মানুষটাকে দেখে মনে হ'ল সামান্য জায়গীরদার আর মৌলবী হ'য়ে থাকবার জন্যে জন্মাননি তিনি। একটু সাহায্য পেলে সমস্ত বিহারের সুলতান হতে পারেন।"

একটু থেমে বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ইশাক। মুখের প্রতিফলন লক্ষ্য করে। কিন্তু সে রকম কিছুই দেখতে না পেয়ে সোজা জিজ্ঞাসা করে, "তোর কি মনে হয়?"

"আমার আবার কি মনে হবে? কি বলতে চাইছ তুমি?" একটু সন্দেহের আভাষ মালিকার কথায়।

"আমি কিছুই বলতে চাইনা।" যে কথা বলতে চায় ইশাক, সোজা স্পষ্ট করে সে কথা বলা উচিত হবে কিনা বুঝতে না পেরে আবার অন্য পথ ধরে, "আমাদের অবস্থা হ'য়েছে কঠিন। এই ঝড়জলের ভেতরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। পেটে দানা নেই, মাথায় ছাউনি নেই। মীর দাদত' অসুখেই পড়ে গেল।"

"অসুখে পড়েছে? কোথায় আছে?" একটু ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে মালিকা তার খবর জানবার জন্যে।

"আছে দরিয়ার ওপারে একটা বাড়ীতে। তাইত' ভাইজান বলছিল যে মালিকা ইচ্ছা করলে আমাদের বাঁচাতে পারে।"

"আমি নিজেই বন্দী। তোমাদের বাঁচাব কি ক'রে বল?" রাস্তা জানবার ঔৎসুক্যের সঙ্গে অসহায় ভাবটাও প্রকাশ হ'য়ে পড়ে

মালিকার।

"সে কথা না ভেবেই কি আর বলেছে?" এতক্ষণে আসল কথাটি বলবার একটু সুযোগ মেলে ইশাকের। বলে, "ভাইজান আমাকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছে যে শের খাঁর সাহায্য পেলে তুই নিবিত' ?"

"আমার কাজ হবে তাতে ?"

"হবে না! দবীরকে পিষে গুঁড়িয়ে ফেলবে শের খাঁ।"

"ফেলবে ?" তবুও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না মালিকা।

"নিশ্চয়।" আরও জোর দিয়ে বলে ইশাক। তারপরই গভীর চিন্তিত ভাব নিয়ে ধীরে ধীরে বলে, "কিন্তু কেবলমাত্র এই দুর্গটি তার কোন কাজেই আসবে না।"

"কেন ?" একটুখানি হতাশার সুর ধরা পড়ে মালিকার কণ্ঠস্বরে।

"যেমন যোদ্ধা তেমনি কৌশলী শের খাঁ।" মালিকার প্রশ্নের উত্তর দেয় ইশাক, "সহস্রবার হাত বদলান এই মুসাফিরখানার ওপরে তার কোন লোভ নেই। সে চায় সড়ক। সিপাহ্‌রা যাতে সহজে কুচ্‌ করে যেতে পারে। এর ভেতরে অনেকখানি এগিয়েও এসেছে।"

"এইদিকে ?"

"নিশ্চয়। সাসারাম থেকে উত্তর-পশ্চিমদিকে। আরও টানবে। সোজা বারাণসী। সেখান থেকে এলাহাবাদ।"

"বল কি ?" চোখ দুটি বড় বড় হ'য়ে ওঠে মালিকার। এমন ভাবে যে কেউ সড়কের পর সড়ক গড়তে পারে তা এই প্রথম শুনল সে। দেখবার কথাত' কল্পনাই করতে পারে না।

"সেইজন্যেইত' তাঁর এখন অত্যন্ত অর্থের দরকার।" বলে একটু

থেমে আরও গম্ভীর হয় ইশাক, "সেদিন বলছিলেন আমাকে, ইশাক, এই সড়ক যদি আমি গড়ে তুলতে পারি তাহ'লে আমাকে ঠেকাতে পারবে না কেউ। সেই কথা শুনেই তোর কথা মনে পড়ল আমার।"

"ভাবলে আমার প্রচুর অর্থ আছে, না ?" আবার সন্দেহের সুর ফুটে ওঠে মালিকার কথায়।

"না, তা ঠিক নয়," তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নেয় ইশাক, "ভাবলাম, প্রচুর না হ'ক, কিছুত' আছে নিশ্চয়ই। আর সেটা যদি শের খাঁর কাজে লাগে তাহ'লে এভাবে বন্দী হ'য়ে আর থাকতে হয় না। তিনি নিশ্চয়ই মুক্ত করবেন তোকে।"

"সবই বুঝলাম। কিন্তু শের খাঁ শুনেছি জালাল খাঁর মৌলবী। তার কাছ থেকে তুমি কতটুকু আশা করতে পার ?"

এ প্রশ্নের আর জবাব দিতে পারে না ইশাক। সে যতটুকু দেখেছে তাতে শের খাঁর প্রতি তার শ্রদ্ধা জন্মেছে। কিন্তু শ্রদ্ধা আর বিচার এক নয়। তাই মালিকার প্রশ্নকে খণ্ডন করা কঠিন হ'য়ে পড়ে তার পক্ষে। কিছুক্ষণ নীরবে বসে থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় ইশাক।

"তুই ভাইজানের সঙ্গে একবার দেখা কর।"

"পাঠিয়ে দিও।" মালিকাও উঠে দাঁড়ায়, "কিন্তু ভাইজান কি পারবে তোমার মত উঠে আসতে ?"

"আমাদের শক্তির ওপর তোর আস্থা নেই দেখছি।"

"শক্তির বড়াই আর কর না। একটা নাবালক তোমাদের তিন ভাইকে দরিয়ায় চোবানি খাইয়ে দিলে।"

"না, নাবালক নয়।" সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ায় ইশাক, "শক্তি আছে তার দেহে মনে এবং আব্বাস খাঁর ঘরে।"

"আব্বাস খাঁর ঘরে মানে ?" কথাটা ঠিক বোধগম্য হয় না

মালিকার।

"অর্থাৎ সিপাহ্‌শালারের কন্যার মেহ্‌বুব দবীর খাঁ।"

"আচ্ছা!" চোখের ঘূর্ণিতে সহস্র কথার ইসারা জেগে ওঠে মালিকার। বলে, "ঠিক আছে। মাথা গেলে কানটাও থাকে না। তুমি বড়ভাইকে একবার পাঠিয়ে দিও। চল, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসি।"

ঘর থেকে বেরিয়ে দু'জনে আবার যেতে থাকে প্রাচীরের দিকে। মালিকা জিজ্ঞাসা করে, "কবে আসবে ভাইজান?"

"আজ থেকে দশদিন পরে।" উত্তর দেয় ইশাক।

ইশাকের কাছ থেকে যেটুকু খবর পায় মীর আহ্‌মদ তাতে মালিকার মনোভাবটি স্পষ্ট জানা না গেলেও শের খাঁর সঙ্গে কথাবার্তা আরও কিছুটা এগিয়ে রাখা প্রয়োজন বোধ করে সে। রাত্রির অন্ধকারে গা আড়াল দিয়ে পাহাড়তলির পথ ধরে এগিয়ে চলতে থাকে। দ্রুতপায়ে। চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলোতে বুলোতে। গভীর থেকে গভীরতর হয় রাত। তারপর এক সময়ে আবার ফিকে হ'য়ে আসে। ক্লান্ত দেহ। কিন্তু মন সে ক্লান্তিকে আমল দিতে চায় না। নারাজ দেহকে টেনে নিয়ে চলতে থাকে যতখানি দ্রুত সম্ভব।

চুণারের সীমানা পার হ'য়ে যেতে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয় মীর আহ্‌মদ। এবারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতেও বাধা। দেহাতি মানুষ সন্দেহের চোখে দেখে। খাদ্য যদিবা মেলে, আশ্রয় নিতে হয় গাছ তলায়। এইভাবে কেটে যায় পরের দিনটি। বৈকালের দিকে এসে পৌঁছয় চন্দৌলী মাজোহার। এতক্ষণ পর্যন্ত রাস্তা বলতে সঠিক কিছু পায়নি সে।

প্রয়োজনও বিশেষ বোধ করেনি তার। পথের নিশানা যে রকম বলে দিয়েছিল ইশাক, সেইরকমই চলে এসেছিল। চন্দৌলীতে এসে দেখা মেলে সড়কের। নিশ্চিন্ত হয় মীর আহ্‌মদ। তাহ'লে সাসারামের জায়গীরের ভেতরে প্রবেশ করেছে সে। একটা টানা নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্লান্তি যেন ঝরে পড়ে তার। আনন্দের উত্তেজনায় পা চলতে থাকে দ্রুত। কিন্তু পরের গ্রামটিতে পৌঁছেই অবাক হ'য়ে যায় সে। রাস্তা শেষ হ'য়ে গেল এর ভেতরেই ? তাহলে এ কীর্ত্তিটুকু কার ? গ্রামবাসীদের একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করে সে। উত্তর যা পায় তা খুব সন্তুষ্ট হওয়ার নয়। শের খাঁরই তৈরী সড়ক এটি। সাসারাম থেকেও এদিকে এগিয়েছে কিছুটা রাস্তা। কিন্তু শেষ করতে পারেনি। দম ফুরিয়ে গিয়েছে। তাই এখন কাজ বন্ধ রেখে দম নিয়ে নিচ্ছে। চিন্তায় পড়ে মীর আহ্‌মদ, তাহ'লে কি শের ভেবে শেয়ালের পেছনে দৌড়ুচ্ছে সে ? একটু বুঝি দুর্বলই হ'য়ে পড়েছিল। চিন্তাক্লিষ্ট মনখানি তার কখন যে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছিল একটি গাছের নীচে, খেয়ালই করেনি সে। চোখের দৃষ্টির সঙ্গে মনের কোনও সংযোগ নেই। সেইভাবেই দেখে পাশেই একটি গোযান। গরু দুইটি দূরে বাঁধা। শিংগুলি রংকরা। তাদের কপালের ওপরে কড়ি দিয়ে তৈরী সুন্দর কপালী। গলায় কড়ির মালা। গোযানের ছত্রীটিও সুন্দর করে সাজান। ছত্রীর ভেতরে একটি কিশোরী বৌ। বৌটির স্বামীই হবে বোধহয়, গোযানের সম্মুখ ভাগে বসে। তারও কৈশোরকাল কাটেনি। একজন প্রৌঢ় পাঁয়চারি করছে আর মাঝে মাঝে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে কিশোরটির কাছে। কি যেন কথা হয় দু'জনের ভেতরে, তারপর আবার পাঁয়চারি করতে থাকে প্রৌঢ়টি। শের খাঁকে যদি সেরকম উপযুক্ত মনে না হয় তাহলে কি হুমায়ুনের কাছেই যাবে সে ? হয়ত' তাই যেতে হবে

শেষ পর্যন্ত। দেখা যাক্ আগে বর্তমান কি বলে। হঠাৎ সোজা হ'য়ে বসে মীর আহ্মদ। রসুইএর গন্ধ এল কোথা থেকে? এদিক ওদিক তাকায়। দেখে গোযানের আড়ালে বসে একটি প্রৌঢ়া রসুই পাকাচ্ছে। দেখবার সঙ্গে সঙ্গে চন্মন্ করে ওঠে ক্ষুধাপেশী-গুলি। সেই কোন সকালে একটু নাস্তা করবার সুযোগ জুটেছিল তার, তারপর থেকে আর পেটে দানাটি পড়ে নি। কি করা যায়? এদিক ওদিকে তাকায় মীর আহ্মদ। একটি সরাইখানাও চোখে পড়ে না। উঠে পড়ে সে। গিয়ে দাঁড়ায় প্রৌঢ়ের সামনে।

"পানি দাও।"

ভয়ে ভয়ে তার মুখের দিকে একবার তাকায় প্রৌঢ়। তারপরই তার চোখদুটি গিয়ে আটকে যায় মীর আহ্মদের কোটিবদ্ধ তরোয়ালটির ওপরে। পানি চাওয়া একটা অজুহাত নয়ত' মানুষটার? হয়ত' এরপরই খাপের ভেতর থেকে উঠে আসবে অস্ত্রটি।

"কৈ, দাও।" একটু বিরক্ত হয়েই বলে ওঠে মীর আহ্মদ।

এবারে উঠে দাঁড়াতেই হয় প্রৌঢ়কে। প্রৌঢ়াটির কাছ থেকে এক লোটা জল নিয়ে আসে। ঢেলে দেয় আহ্মদের হাতে। ঐ এক লোটা জলই নিঃশেষে শেষ ক'রে আবার গাছতলায় ফিরে যায় আহ্মদ। বসে বসে চিন্তা করতে থাকে। তারপর এক সময়ে ক্লান্তির ঘুম এসে জুড়ে দেয় তার চোখের পাতা।

প্রত্যুষে ঘুম ভাঙতেই দেখে তার পাশে আরও দু'তিনজন লোক। প্রত্যেকেরই হাতে লাঠি। চম্‌কে উঠে বসে আহ্মদ।

"তোমরা কারা? কি চাও?" বেশ কঠিন সুরেই জিজ্ঞাসা করে সে।

"কোথায় যাবে?" উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে একজন।

"শের খাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তোমরা কোথায় যাবে?"

"ঐ গাড়ি আর আরোহীদের পাহারা দিচ্ছি। আমরা এই

গ্রামেরই মানুষ।"

"পাহারা দিচ্ছ কেন?"

"তোমাকে দেখে ওরা ভয় পেয়েছে। ওদেব মাল-জানের দায়ীত্ব আমাদের।"

"কেন?"

"জায়গীরদার শের খাঁর হুকুম।"

একটু চমৎকৃতই হয় মীর আহ্‌মদ। রাহীর মাল-জানের দায়ীত্ব গ্রামবাসীদের? আর সে হুকুম এমনভাবে বিনিদ্র বাত্রি যাপন ক'রেই মানে সকলে?

"এখানে চুরি ডাকাতি হয় না?" আবও নিঃসন্দেহ হওয়াব জন্যে জিজ্ঞাসা করে মীর আহ্‌মদ।

"তার বংশসুদ্ধ গোরে যাবে। তোমাকে বিদেশী দেখলাম, তাই পাহারা দিলাম। যাও, এখন নিজের কাজে যাও।"

"আর কতদূব সাসারাম?"

"অনেক দূর। আজ আর কাল সারাদিন হাঁটলে পৌঁছে যাবে।"

উত্তর শুনে আফশোষ হয় মীর আহ্‌মদের। একটা ঘোড়া যদি থাকত তাহ'লে হয়ত' এতক্ষণ পৌঁছে যেত সে। কিন্তু গা ঢাকা দিয়ে বেড়াতে হয় যাকে তার সঙ্গে ঘোড়া আর কি করে থাকে! অতএব আবার পায়ের শক্তিব ওপরেই নির্ভর করতে হয় তাকে।

পরদিন সাসারামে গিয়ে যখন পৌঁছয় মীর আহ্‌মদ তখন বেশ রাত হ'য়ে গিয়েছে। এই অসময়ে শের খাঁর দেখা পাওয়া যাবে কিনা ঠিক বুঝতে পাবে না সে। আবার জানাশোনাও কেউ নেই যে তার

কাছে একটা রাত্রের জন্যে আশ্রয় নেবে। এতটা চিন্তা হয়ত' করত না সে যদি পায়ে হেঁটে না আসতে হ'ত তাকে! যাইহ'ক, এসেছে যখন তখন দেখা করবারই চেষ্টা করবে আগে। মনস্থির করে এগিয়ে চলতে থাকে সে।

আলস্যকে প্রশ্রয় দেয়না শের খাঁ। কাজ তার চলে এদিকে যেমন অধিক রাত্রি অবধি, ওদিকে তেমনি শয্যাত্যাগ করে ভোরের অন্ধকার থাকতেই। তাই দেখা করতে বিশেষ অসুবিধা হয়না মীর আহ্‌মদের। ঘরে ঢুকে সালাম করতেই বলে ওঠে শের খাঁ, "চুণার থেকে আসছ? স্নান, খাওয়া কিছুই হয়নি বোধ হয়?"

"সে হবে। জনাবের সঙ্গে বিশেষ জরুরি কথাটা আগে সেরে নিই।"

কথা শুনে একটুখানি খুশির রেখা ফুটে ওঠে শের খাঁর মুখে চোখে। দেখে উৎসাহ পায় মীর আহ্‌মদ। কিন্তু কি ভাবে কথা আরম্ভ করা যায় সেই চিন্তাই করতে থাকে। হঠাৎ যেন একটি সূত্রের দেখা মেলে। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "জনাব যে সড়ক করাচ্ছেন তা শেষ হয়নি দেখলাম।"

"হবে।"

"হ্যাঁ। ওটা হয়ে গেলে রাহীদের যেমন সুবিধা হবে তেমনি সিপাহ্‌রাও যাতায়াত করতে পারবে অনেক তাড়াতাড়ি।" বলে একটু চিন্তা করে মীর আহ্‌মদ, তারপর আবার আরম্ভ করে, "কিছু মনে করবেন না জনাব, আমার কিন্তু মনে হয় কিছু অর্থ পেলে আপনি অনেক কিছু করতে পারেন।"

"কি রকম?"

"এই যে রাহীদের জন্যে আপনি এমন সুবন্দোবস্ত করেছেন যে চুরি-ডাকাতির ভয় পর্যন্ত নেই, কিন্তু তাদের রাত কাটাবার একটু আস্তানা আর খাওয়ার ব্যবস্থা যদি থাকে—"

"মনে থাকবে কথাটা।"

"আমার ভাই ইশাক এসেছিল আপনার কাছে।"

"হ্যাঁ। একটা খবর দেওয়ার কথা ছিল।"

"বলেছে আমাকে। কিন্তু বুঝতেই পারছেন কত সাবধানে একটু একটু ক'রে এগুতে হচ্ছে আমাদের।"

"ঠিক আছে। দেখ চেষ্টা করে যদি খুশ্‌খবর কিছু আনতে পার।"

"আনতে হয়ত' পারি। কিন্তু আমার বহিন্‌ লড মালিকা চুণারে বন্দী হ'য়ে রয়েছে। আর প্রকৃত খবরটি আছে তারই কাছে।" বলেই অনুনয়ে ভেঙে পড়ে মীর আহ্‌মদ, "জনাব যদি একটু সাহায্য করেন—"

"আমি সব সময়েই তোমাদের সাহায্য করবার জন্যে প্রস্তুত আছি।"

"সে বিশ্বাস আছে বলেই আপনার কাছে আসতে সাহসী হয়েছি। মুশকিল হয়েছে মালিকাকে নিয়ে। একে নহলী-যৌবন, তার ওপরে হুরীর মত খুবসুরৎ। বুঝতেই পারছেন আমাদের চিন্তা কতখানি।"

"চিন্তার কিছু নেই। যখনই বলবে, আমার সাহায্য পাবে।"

"আপনার কথাই যথেষ্ট। আমি তাহ'লে এখন উঠি।"

"আজ রাত্রিটা এখানেই থেকে যাও। আমি বলে দিচ্ছি। আর তোমার বহিন্‌কে বলো যে তাঁর কোন রকম অসম্মান বা তাঁর সম্পত্তি যাতে নষ্ট না হয় সে ব্যবস্থা আমি করছি।"

এবারে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করে মীর আহ্‌মদ।

"আবার আসবে।"

"আসব জনাব," একটু উচ্ছ্বসিতভাবেই বলে ওঠে মীর আহ্‌মদ, "কয়েকদিনের ভেতরেই আবার আসব।"

শের খাঁকে যতটুকু বোঝবার বুঝে নিয়েছে মীর আহ্‌মদ। চিন্তা তার বোনটিকে নিয়ে। প্রস্তাব তার ছোট নয়। কিন্তু সেই প্রস্তাবকে কি ভাবে গ্রহণ করবে সে তাই নিয়েই হচ্ছে চিন্তা। ভাবতে-ভাবতেই নির্দিষ্ট দিনটি এসে যায়। রাত্রির অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দড়ি বেয়ে উঠে আসে ওপরে। মালিকার সঙ্গে গিয়ে তার ঘরে ঢোকে।

"বস।" বলে মালিকা।

"বসছি।" বলেই ছোট বোনের হাতদুটি চেপে ধরে মীর আহ্‌মদ্, "আমাদের তুই বাঁচা বোন।"

"তুমি অমন করছ কেন ? আগে বস, শুনি সব কথা।" একরকম জোর করেই তাকে বসিয়ে দেয় মালিকা।

"শোনবার কিছু নেই। যা আছে, তা হচ্ছে তোর সম্মতি। কাত্‌রে ওঠে মীর আহ্‌মদ, বলতে থাকে, "তোর গায়ে কাঁটার আঁচড়টি লাগতে দিইনি আমরা। এনে তুলেছি এই দুর্গে। আজ তোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে। তাই বলছিলাম তুই আবার এই দুর্গের মালিকান হয়ে বস। আমরাও আমাদের ভাগ্যকে ফিরে পাই।"

"দেখ ভাইজান, তোমরা আমার আব্বাজানের মত। তোমাদের কোন কথাই অবহেলা করিনি আমি। আমার সামনে ওরকম ভাবে মিনতি না করে কি করতে হবে হুকুম কর।" দৃঢ়স্বরে বলে মালিকা।

"সেই কথাইত' বলতে চাই। এই দুর্গ দবীরের হাত থেকে কখনই ছিনিয়ে নিতে পারবি না তুই, যদি না বাইরে থেকে সাহায্য পাস্।"

"জানি।"

"তাই বলছিলাম—" একটু থেমে গিয়েই আরও জোর দিয়ে

বলে ওঠে মীর আহ্মদ, "তুই শের খাঁকে নেকা কর। তোর অর্থ আর তার শক্তি, একে রুখতে পারবে না স্বয়ং বাদশাহ্ও। শের খাঁ কথা দিয়েছে আমাকে যে সব সময়ে আমাদের সাহায্য করবার জন্যে প্রস্তুত সে। এখন তুই বল্।" আশা ভরা চোখে বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মীর আহ্মদ।

"আমার বলবারত' কিছু নেই। তোমরা যা ভাল বুঝবে তাই করবে।" একটু অন্যমনস্ক ভাবেই বলে মালিকা।

"বেশ। তাহলে শের খাঁকে বলি আমরা যে তুই তাকে নেকা করতে রাজী আছিস্?"

"অগত্যা।"

"আর তাকে অর্থ সাহায্য করবার কি হবে?"

"আমার যা আছে তা শের খাঁ চিন্তাও করতে পারে না।"

"কোথায়?

"এই দুর্গের কোথাও আছে।" হেসে বলে মালিকা, "তোমাব চিন্তার কিছু নেই। কথার খেলাপ হবে না তোমার।"

"বাস্, তাহ'লেই হল।" নিশ্চিন্ত মনে উঠে দাঁড়ায় মীর আহ্মদ। বলে, "আমি আবার দশ দিন পরে আসব পাকা খবর নিয়ে। আজ থেকে দশ দিন।"

দু'জনে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় উত্তরের প্রাচীরের পাশে।

দ্রুত ঘুরে যাচ্ছে রাজনৈতিক চাকাটি। চম্কে ওঠে দবীর খবর শুনে। আব্বাস খাঁয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণের জন্যে মূক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপরই হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে, "এ হয় না।

পরের সম্পত্তির জিম্মাদার হ'য়ে আমি কিছুতেই সব কিছু ফেলে পালিয়ে যেতে পারব না।"

"কি করবে তুমি?" স্থির শান্ত ভাবেই জিজ্ঞাসা করে আব্বাস খাঁ।

"কেন, বাধা দেব। শেষ সিপাহ্ যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে লড়াই।"

"এর ইনাম একমাত্র মরহুম্।"

"ইনামের কোন প্রশ্ন নেই, প্রশ্ন ইমানের। দুটো যে এক জিনিস নয় তা নিশ্চয়ই কবুল করবেন আপনি?"

"করি।" পূর্বের মতই হিমানী-শীতল স্বরে উত্তর দেয় আব্বাস খাঁ, "কিন্তু বাঁচাতেত' পারবে না কিছুই! এমনকি তহ্শীলখানার চাবিটিও পাওনি আজও যে ধনরত্ন যা আছে তুলে নিয়ে দিল্লী চালান করে দেবে।" বলেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায় আব্বাস খাঁ, "আমি চলি। শের খাঁ তার সৈন্যদল নিয়ে এদিকে রওনা যখন হয়েছে তখন সন্ধ্যার মুখেই হয়ত' এসে উপস্থিত হবে। তার পূর্বেই যতটুকু সাবধান হওয়ার তা হ'তে হবে। নিজের জানের পরোয়া করিনা দবীর, চিন্তা আমার আওরতের ইজ্জতের। শের খাঁ শিক্ষিত, তার সঙ্গে বিরোধও নেই আমাদের। আমার চিন্তা ইশাক আর মীর দাদাকে নিয়ে।"

"তারাও কি শের খাঁর সঙ্গে আছে?" এই একটি সংবাদেই বিশেষ চিন্তিত হয়ে ওঠে দবীর।

কিন্তু তার উত্তর আর আব্বাস খাঁকে দিতে হয় না। হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসে দাঁড়ায় একটি সিপাহ্। যথারীতি কুর্ণিশ জানাবার কথাটিও ভুল হ'য়ে গিয়েছে তার। শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করে চলেছে মুখবিবর। ফলে বলবার কথাগুলি স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতেও পারছে না। আবার অহেতুক কালক্ষয় করবার মত মনের অবস্থাও নেই তার। কোনরকমে দম নিতে নিতেই জানায়, চুণার

থেকে কিছুদূরে শের খাঁকে আসতে দেখা গিয়েছে। সঙ্গে প্রায় পাঁচ হাজার সিপাহ্।

"পাঁচ হাজার সিপাহ্?" প্রায় চম্‌কে ওঠে দবীর।

"ভুলে যাচ্ছ কেন যে শের খাঁর সঙ্গে মীর আহ্‌মদরা যোগ দিয়েছে। ওরা এখানকার সিপাহ্ শক্তি জানে।" বলে আব্বাস খাঁ।

"হ্যাঁ জনাব, ইশাক আর মীর দাদও শের খাঁর সঙ্গে আছে। মীর আহ্‌মদ বরাবর এখানেই ছিল।"

"এখানেই ছিল!" লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় দবীর, "আমাকে জানাস্‌নি কেন উল্লু?"

"আমি কাল রাত্রে শুনেছি জনাব," ভয়ে ভয়ে বলে সিপাহ্‌টি, "তারপর চলে গিয়েছিলাম চুণারের শেষে। সিপাহ্‌শালার পাঠিয়ে ছিলেন শের খাঁ আসছে কিনা, দেখতে। তাই সময়মত খবর দিতে পারিনি জনাব।"

"ঠিক আছে, তুই যা। আর দেখ, হাওদা বানাতে বল। এখুনি।" সিপাহ্‌টিকে বিদায় দিয়ে আব্বাস খাঁর দিকে ফিরে তাকায় দবীর, "যা ভাল বোধ করেন, তাই করবেন আপনি। আমার সঙ্গে এই বোধহয় আপনাদের শেষ দেখা। মীর দাদদের হাত থেকে আমিনাকে বাঁচাবেন।" বলেই তার হাত তুটো চেপে ধরে সে। চোখ তুটি ছলছলিয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। জন্মাবধি যাকে কাছে পেয়ে এসেছে অতি নিকট জনের মত, অতবড় নৃশংসতার পরেও যে শুধু কর্মের বিচার করেনি, তার মনটিকেও দেখেছিল, আজ এই অসময়ে সেই মানুষটিকে ছেড়ে যেতে চাইছে না অন্তর। কিন্তু উপায় নেই। নিমগ্ন পোতের যাত্রী। সম্মুখে অকূল পাথার। ভেসে চলতে হবে। কতদূর, কারও জানা নেই। একসঙ্গে চলারও তাই শেষ। তরঙ্গের বুকে গা এলিয়ে দিয়ে শুধুই ভেসে চলা। যদি কূলের দেখা কোথাও মেলে।

শূন্য খাঁচা। সফিদা বেগমের মহলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায় মীর দাদ। নিঃশব্দ-গতি মার্জার যেভাবে এগিয়ে আসে একটু একটু করে, সেইভাবেই এগিয়ে এসেছিল সে। ভেবেছিল বদ্ধ খাঁচার দরজা যখন খোলা পাওয়া গিয়েছে, শিকারকে তখন এই দুর্গের চত্বরেই একটু একটু করে খেলিয়ে খেলিয়ে শেষ করবে। কিন্তু এত পরিশ্রমের ফল শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়াতে মাথার ভেতরে আগুন জ্বলে ওঠে তার। সঙ্গের সিপাহ্‌দের হুকুম দেয় ঐ মহলের ভেতর থেকে সমস্ত সামান বাইরে ফেলে দিতে।

হুকুম হ'তেই হুড়মুড় করে সিপাহ্‌রা গিয়ে ঢোকে মহলের ভেতরে। এইটুকুইতো আসল কাজ। প্রাণ ভয়ে গৃহত্যাগ করে গিয়েছে যারা তাদের পরিত্যক্ত দ্রব্যসামগ্রী খুঁজে দেখা। মেলেও বৈকি। ভাল ভাল জিনিষই মেলে। ক্ষুদ্র আশরফী থেকে বহুমূল্য মণিমুক্তা পর্যন্ত। যুদ্ধ তাই সিপাহ্‌দের পক্ষে যেমন ভয়ের তেমনি আকাঙ্খারও স্থল। আর যুদ্ধে না গিয়েও যদি পাওয়া যায় এমন মওকা, তাহ'লে সেত' যেচে আসা বেহেস্ত্‌।

উন্মত্তের মত সিপাহ্‌রা দবীরের পরিত্যক্ত মহলটি খুঁজে দেখতে থাকে। কিন্তু পাওয়া যায় না কিছুই। এক আসবাব পত্র ছাড়া। পরম আক্রোশে সেগুলি ধরে ধরে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে। আর বীভৎস দন্তপংক্তি বের করে হায়নার হাসি হাসতে থাকে মীর দাদ।

সামান্যের দিকে নজর দেবার অবসর নেই মীর আহ্‌মদের। মাননীয় মেহ্‌মান শের খাঁর পরিচর্যার এতটুকু ইতর বিশেষ না হয় সেইদিকেই তার প্রখর দৃষ্টি। আব্বাস খাঁর ঘরের সন্নিকটেই পড়েছে শের খাঁর তাঁবু। কোনও মোকামে উঠতে সে রাজী হয়নি।

বহুবার অনুরোধ জানিয়েছিল মীর আহ্মদ। কিন্তু অটল শের খাঁ। স্পষ্ট উত্তর দিয়েছিল, "আগে দেখি চুণারের মালিকান আমাকে কি ভাবে নেয়, তারপর দেখা যাবে তোমার কথা রাখা যায় কিনা।"

অগত্যা মেহ্মানের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করেই মীর আহ্মদকে ছুটে আসতে হয়েছে মালিকার কাছে।

বহুদিন পর আবার নতুন করে সেজেছে মালিকা। তাজ খাঁর দেওয়া অলঙ্কারগুলি সব পরেনি বটে কিন্তু চোখে দিয়েছে সুর্মার লেখা, হাতের আর পায়ের পাতায় দিয়েছে মেহেদীরসের আলিম্পন। কঞ্চুলিকার ওপরে পরেছে মখমলের পহ্রাণ, পরনেও মখমলের সেরোয়াল। ঈষৎ পিঙ্গল কেশদাম বেণীবদ্ধ। কপালের ওপরে সযত্নে রাখা কয়েকগাছি চূর্ণ-কুন্তল।

মহলের দরজার কাছে একটু থম্কে দাঁড়িয়েই যেতে হয়েছিল মীর আহ্মদকে। সেই মর্দিন সহর থেকে যে ছোটবোনটিকে সঙ্গে করে এনেছিল সে, এ কি সেই মালিকা? রূপ তার বরাবরই আছে, কিন্তু পুরুষ শক্তিকে পতঙ্গে পরিণত করবার মত এমন ঝলসান রূপ যে ছিল, তা সে নিজেও বুঝে উঠতে পারেনি।

"কি ভাইজান, অমন করে দাঁড়িয়ে গেলে যে?" মুচ্কে হেসে জিজ্ঞাসা করে মালিকা।

"না, ভাবছিলাম শের খাঁ ভাগ্যবান। চল্, ঘরে চল্।"

মালিকার পিছন পিছন এসে ঘরে বসে মীর আহ্মদ। বলে, "তোর কথা মত শের খাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছি।"

"বেশ।"

"এখন আমাদের তিন ভাইএর ভবিষ্যৎ এবং তোর প্রতিশোধ নেওয়া—"

"আমি কি তোমার কথায় কোনদিন অমত করেছি?" বাধা দিয়ে বলে ওঠে মালিকা।

"না, তা করিস্‌নি।" বলে আর একটু নরম সুরে বলে মীর আহ্‌মদ, "সেদিন রাত্রে যখন তোর সঙ্গে দেখা করতে আসি, সেদিনও না। কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানিস্‌, এক জীবন থেকে আর এক জীবনে যাওয়াতো, যদি 'না' বলে বসিস্‌, যদি—"

"তোমার ঐ যদির রাজ্য ছাড় দেখি।" হেসে ওঠে মালিকা, "স্ত্রীলোক হ'য়ে জন্মেছি যখন, হারেম আমাকে খুঁজতেই হবে। তবে কথা হচ্ছে পথ থেকে দুর্গের ভেতরে যখন আশ্রয় পেয়েছি তখন সেই দুর্গ থেকে আবার পথে গিয়ে দাঁড়াতে আমি পারব না।"

"পারতেও হবে না তোকে," উত্তেজিতভাবে বলে ওঠে মীর আহ্‌মদ। এই ছোট বহিন্‌টির মনের গতি নিয়েই যেটুকু ভয় ছিল তার। এখন তার দৃষ্টির নিশানা পেয়ে আশার আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে সে। দরাজ সুরে আশ্বাস দিতে থাকে," কোন চিন্তারই কারণ ঘটবে না তোর। এই দুর্গের মালিকান থাকবি তুই। তুই যেরকম হুকুম করবি সেইরকম ভাবেই চলবে এখানকার কাজ।" বলেই গলা নামিয়ে নিয়ে বুঝিয়ে বলতে থাকে, "নইলে, এই শের খাঁর তরোয়াল যদি আজ তোর না হয় তাহ'লে ঐ দবীর খাঁ আবার কখন এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে এই দুর্গের ওপরে তার ঠিক কি? বুঝলি, সিংহাসন যেন কচি শিশু, তার ওপরে লোভ শেয়াল থেকে শের, সিংহ সকলেরই আছে।"

"তাত' বটেই।" চিন্তিতভাবে বড়ভাইএর কথা সমর্থন করে মালিকা।

"সেইজন্যেই তোকে বলেছিলাম শের খাঁকে সাদী করতে।"

"আমিতো বলেই দিয়েছি, তোমরা যা করবে তাতেই মত আছে আমার।"

"সেত' জানিই।" আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে মীর আহ্‌মদ, "সেই সাহসেইতো জবান দিয়ে শের খাঁকে এখানে নিয়ে আসতে

সাহসী হয়েছি। আর এও জানি যে শের খাঁ যাতে আরও বড় হ'য়ে উঠতে পারে তার জন্যে যতদূর সম্ভব সাহায্যও তুই করবি।" বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় সে, "আচ্ছা, তাহ'লে এখন চলি। নেকার ব্যবস্থা করতে হবে আবার। দেখিস্, তুই সুখীই হবি।"

হাসি হাসি মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মীর আহ্মদ।

মির্জাপুরের বনের ভেতরে এসেই দবীরের দলটিকে ধরে ফেলে আব্বাস খাঁ। সিপাহ্শালার সর্বপ্রথমে, তার পিছনে এক্কায় চলেছে আমিনা আর আসরাফন বিবি। আর সকলের পিছনে আব্বাস খাঁএর একান্ত অনুগত কয়জন সিপাহ্। আমিনাদের দেখে মনের ওপর থেকে একটা গুরুভার পাষাণ যেন নেমে যায় দবীরেব। তাহ'লে শের খাঁ এসে পৌছুবার পূর্বেই চুণার ত্যাগ করতে পেরেছে ওরা! তাছাড়া আরও একটি বিষয়ে চিন্তা ছিল তার। নিজেদের জায়গীর হ'লেও এই মির্জাপুরের বনটিকে বিপদমুক্ত করতে পাবেনি তারা। তাই সংঘবদ্ধ না হ'য়ে এই পথে চলা, বিশেষ করে রাত্রি-কালে, মোটেই নিরাপদ নয়। নিজের জন্যে চিন্তা নেই তার। চিন্তা আম্মার জন্যে আর চিন্তা আমিনাদের জন্যে। যেতে যেতে কতবারই পিছন দিকে তাকিয়েছে সে, যদি দেখা যায় আমিনাদের।

চিন্তার হাত থেকে মুক্ত হতেই তার এবং আমিনার এই অসাম্য পথ-যাত্রা বড় বিসদৃশ বোধ হ'তে থাকে দবীরের কাছে। হাওদা এবং এক্কার পার্থক্য যেন তু'জনকে আরও ঠেলে তু'দিকে সরিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও কথা বলতে গেলে আম্মাজান কিভাবে নেবে তা, সেই চিন্তা করেই একটু ইতস্ততঃ করে সে। তবুও পারেনা। হৃদয়াবেগ আর নৌকোর গুণ, যেদিকে টানে সেই

দিকেই যেতে হয়।

"হাতী থামাও," বলে ওঠে দবীর।

সামনের বিরাটবপু গজটি থামতে পিছনের দলটিকেও থেমে যেতে হয়।

"আবার থামলে কেন?" একটু ধম্‌কেই ওঠে আব্বাস খাঁ, "জায়গাটা ভাল নয়।"

"ওদের হাওদায় উঠে আসতে বলুন। আমি এক্কায় যাচ্ছি," উত্তর দেয় দবীর।

"যাবে হাওদায়?" এক্কার পাশে গিয়ে আসরাফন বিবিকে জিজ্ঞাসা করে আব্বাস খাঁ।

"না," মায়ের উত্তরের পূর্বেই নিজের অমত জানিয়ে বসে আমিনা।

অগত্যা যেমন চলছিল তেমনিই আবার চলতে থাকে দলটি। মশালের আলোয় পথ চিনে নিয়ে। নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চেরা ঝিঁঝিঁর একটানা শব্দ শুনতে শুনতে। এমন সময় হঠাৎ চাপা হুকুম করে ওঠে আব্বাস খাঁ, "মশাল সব নিভিয়ে দাও। শব্দ করবে না কেউ। দূরে মশালের আলো দেখা যাচ্ছে।"

"ওদের হাওদায় তুলে দিন," বলে ওঠে দবীর।

"আর তুমি?" জিজ্ঞাসা করে আব্বাস খাঁ।

"আমি আপনার সঙ্গে থাকব।"

"তা হয় না। তুমি জেনানাদের বাঁচিয়ে নিয়ে যাবে। হাতী আর এক্কা ছুটবে একসঙ্গে। সঙ্গে থাকবে তোমার সিপাহ্‌রা।"

"কিন্তু—"

"যা বলছি শোন।" বাধা দিয়ে প্রায় ধম্‌কে উঠে আব্বাস খাঁ।

"কিন্তু হাওদায় বসে জেনানা রক্ষা করা যায় না।" তবুও প্রতিবাদ জানায় দবীর।

ফেলে দেওয়া যায় না কথাটিকে। চিন্তায় পড়ে যায় সিপাহ্‌-শালার। সময় নেই। যা করতে হবে, এখুনি, এই মুহূর্ত্তে। তাই করে সে।

"হাতী থামাও।"

সিপাহ্‌শালারের সঙ্গে সঙ্গে দবীরও বলে হাতী থামাতে।

"এক্কা হাতীর পাশে নিয়ে যাও।"

এগিয়ে গিয়ে হাতীর গা ঘেঁষে দাঁড়ায় এক্কাটি।

"তোমরা হাওদায় উঠে যাও। দবীর এক্কায় নেমে এস।"

আব্বাস খাঁর এ হুকুমকে আর অমান্য করতে পারে না আমিনা। এক্কার ওপরে দাঁড়িয়ে হাওদাব রশি ধরে উঠতে চেষ্টা করে সে।

"তাড়াতাড়ি কর। মশালের আলো আরও কাছে চলে এসেছে।" আব্বাস খাঁ তাড়া দেয় ওধার থেকে, সিপাহ্‌দের হাতীর দু'ধারে সারিবদ্ধভাবে সাজাতে সাজাতে।

আর ইতস্ততঃ করবার সময় নেই। আমিনার একখানি হাত ধরে টেনে হাওদার ওপরে তুলে নেয় দবীর। ছল্‌কে ওঠে তার বুকের রক্ত। ফিস্ ফিস্ করে বলে, "আমার আম্মা তোমার জিম্মায় রইল আমিনা।"

ইতিমধ্যে আসরাফন বিবিও এক্কার ওপরে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

"আম্মন আম্মা," বলে হাত বাড়িয়ে দেয় দবীর।

ডাক শুনে দবীরের মুখের দিকে একবার তাকায় আসরাফন বিবি। তারপর নিঃসঙ্কোচে হাতখানি বাড়িয়ে দেয় এই নতুন পাওয়া ছেলের দিকে।

দু'জনে হাওদার ওপরে উঠে আসতে লঘু মনে এক্কায় নেমে যায় দবীর।

"চালাও।" হুকুম করে আব্বাস খাঁ।

টং টং! এগুতে থাকে হাতী।

চম্‌কে ওঠে আব্বাস খাঁ। উত্তেজনার মাথায় এতক্ষণ খেয়ালই হয়নি তার যে ঘণ্টি বাঁধা রয়েছে হাতীর গলায়। ঘোড়া ছুটিয়ে মাহুতের পাশে গিয়ে বলে, "ঘণ্টি খুলে নাও। শব্দ হয় না যেন।"

তবুও কয়েকবার শব্দ করে শেষে থেমে যায় ঘণ্টি। নিঃশব্দ গতিতে চলতে থাকে পলাতক দলটি। আততায়ীর আক্রমণকে এড়িয়ে যেতেই চায়, কিন্তু প্রয়োজন হলে মোকাবিলা করতেও প্রস্তুত। আব্বাস খাঁ একবাব এগিয়ে যাচ্ছে, আবার ঘোড়া থামিয়ে এগিয়ে যেতে দিচ্ছে দলটিকে। একবার এসে এক্কার পাশে পাশে চলতে থাকে। চাপা স্বরে বলে, "শোন দবীর, যদি হামলা হয়, আমরা বাধা দেব। তুমি আর কয়জন সিপাহ্‌ হাতী নিয়ে এগিয়ে যাবে। আওরতের ইজ্জৎ রক্ষার ভার তোমার।"

"জান কবুল। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" বলে ওঠে দবীর।

থেমে যায় কথা। আবার নৈঃশব্দের ভেতর দিয়ে পথ চলা। চোখে সতর্ক দৃষ্টি, অন্তরে প্রস্তুতি। কোষমুক্ত তরোয়াল উঠে এসেছে হাতে। উত্তেজিত স্নায়ু, অধীর, অপেক্ষমান।

হা হা করে ওঠে যেন সমস্ত বনরাজ্যটি। উত্তর দক্ষিণ, পথের দু'ধার থেকেই জেগে ওঠে বিকট সমস্বর চীৎকার। দপ্‌ দপ্‌ ক'রে জ্বলে ওঠে কতকগুলি মশাল। তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা চলমান দলটির ওপরে। এইরকম আক্রমণই আশঙ্কা করেছিল আব্বাস খাঁ। প্রস্তুতও হয়েছিল তার জন্যে। তাই বিকট শব্দে হক্‌চকিয়ে দিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েও সুবিধা করতে পারে না আক্রমণকারীর দল। সুশিক্ষিত সিপাহ্‌, অশ্বারূঢ়। অসিচালনায় অধিক কুশলী। এরকম একটি প্রবল বাধার সম্মুখীন হওয়ায় অভ্যস্ত নয় আততায়ীর দল। প্রথম আঘাতেই হতচকিত হ'য়ে ওঠে তারা। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। তারপরই আবার দ্বিগুণ বেগে এগিয়ে গিয়ে আব্বাস খাঁ রচিত ব্যূহটিকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবার চেষ্টা

করে। সিপাহ্দের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। কেবলমাত্র হাতী, এক্কা আর কয়েকজন সিপাহের একটি ক্ষুদ্র দল এগিয়ে যেতে থাকে। লক্ষ্যবস্তু চলে যায় দেখে ছুটে আসে দস্যুদের সর্দ্দার। সঙ্গে কয়েকজন অনুচর। এবারে আর নিজেকে স্থবিরের মত এক্কার ওপরে বসিয়ে রাখতে পারে না দবীর। অস্ত্র চালনায় যে পারঙ্গম, আততায়ীর সম্মুখে ক্লীবের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। উন্মুক্ত অসি হাতে হুঙ্কার দিয়ে এক্কা থেকে লাফিয়ে পড়ে দবীর। বিশালবপু দস্যুসর্দ্দার, শক্তির অধিকারী। শক্ত সিকিম দেহ দবীরের। হরিণের মত ক্ষিপ্রগতি। মুখের হুঙ্কার নেই, আছে অস্ত্রের আস্ফালন। মশালের আলোয় ঝল্‌কে ঝল্‌কে উঠতে থাকে তীক্ষ্ণধার ইস্পাতফলা।

ঘুরে বসেছে আমিনা। খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়েছে তার অভিমান। দ্বন্দ্ব বেধেছে মনে। এইকি সেই পিতৃহত্যাকারী দবীর? কয়টি স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষা করবার জন্যে যে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সে কি অমন অমানুষ হয় কখনও? সন্দেহের বাতাস লেগে অভিমানের মেঘখানা ক্রমেই যেন সরে যাচ্ছে। ঐ একটি মুখের ওপরেই দৃষ্টি আবদ্ধ তার। অস্ত্রচালনার প্রতিটি ভঙ্গিমায়, দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠে, চোখের তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। হঠাৎ চম্‌কে ওঠে আমিনা। দস্যু-সর্দ্দারের তরোয়ালের একটি সবল আঘাত প্রতিহত করতে গিয়েও পেরে ওঠেনি দবীর। ফসকে এসে বিঁধেছে তার বাম বাহুমূলে। সভয়ে চীৎকার করে উঠতেই বুঝি যাচ্ছিল আমিনা। কিন্তু পারে না। কে যেন শক্তমুঠিতে চেপে ধরেছে তার মুখখানি। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে তার আম্মাজান।

"খবরদার চীৎকার করবি না। অন্যমনস্ক হ'য়ে যাবে।"

ধম্‌কানি দিয়ে কন্যাকে সাবধান করে দেয় আসরাফন বিবি।

আর অনুশোচনায় ভেঙ্গে গিয়ে তার বুকে মাথা রেখে অঝরে কাঁদতে থাকে আমিনা।

কতক্ষণ, তা তার খেয়ালও নেই। হঠাৎ 'ইয়া আল্লা' বলে কে চীৎকার করে উঠতেই চম্‌কে ফিরে তাকায় আমিনা। দেখে সর্দ্দারের দেহখানিকে আমূল বিদ্ধ করে একটি বৃক্ষের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে দবীর। আর নেতার এই শোচনীয় মৃত্যু দেখে ফেরুপালের মতই পলায়নপর হয়েছে তার অনুচরের দল। ফিরে আসছে বিজয়ী দবীর। ডানহাত দিয়ে চেপে ধরেছে আহত স্থানটি। কোনরকমে এসে এক্কায় উঠে বসে সে। এবারে আর নিজেকে লজ্জার বাঁধন দিয়ে বেঁধে রাখতে পারে না আমিনা। নিজের ওড়নাটি ছুঁড়ে দেয় দবীরের দিকে। বলে, "ওটি ছিঁড়ে ক্ষতস্থানটি ভাল করে বেঁধে নাও।"

ক্লান্তি আর ব্যথার মাঝখানেও আমিনার মুখের দিকে তাকিয়ে একবার হাসে দবীর। বিজয়ী প্রেমিকের হাসি।

পথ মুক্ত। কেবলমাত্র আব্বাস খাঁর দলটির জন্যে অপেক্ষা করছে তারা। এমন সময় দু'জন সিপাহের কাঁধে ভর দিয়ে এসে দাঁড়ায় আব্বাস খাঁ। ক্ষতবিক্ষত দেহ। বিশেষ করে পায়ের একটি আঘাত হয়েছে গুরুতর। চলতেও কষ্ট হচ্ছে তার। এক্কার ওপরে কোন রকমে তাকে তুলে দেয় সিপাহেরা। তারপর আবার ছুটে যায় আহত আর কেউ পড়ে আছে কিনা দেখতে।

একজন নয় আরও তিনজন আহত সিপাহ্‌কে নিয়ে আসে তারা। ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার মত অবস্থা নেই তাদের। এদিকে এক্কার সঙ্কীর্ণ স্থানে তাদের ঠাঁই হওয়াও মুশকিল।

"দবীরকে হাওদায় তুলে নে আমিনা," উদ্গত কান্নাকে বুকের ভেতরে কোন রকমে ঠেলে দিয়ে বলে ওঠে আসরাফন বিবি।

ইঙ্গিত বুঝে হাতীকে বসিয়ে দেয় মাহুত। এক্কা এগিয়ে আসে

হাতীর পাশে।

"উঠে এস দবীব," বলে হাত বাড়িয়ে দেয় আমিনা।

"আর এটা তোব আব্বাজানকে দে," বলে নিজের ওড়নাটি খুলে মেয়ের হাতে দেয় আসরাফন বিবি।

দবীর হাওদায় উঠে আসতে সিপাহেরা স্থান পায় এক্কায়। ঝড়ের ঝাপটায় বিপর্যস্থ দলটি আবাব এগিয়ে চলতে থাকে।

"মির্জা মনস্থরের গৃহে যাবে।" মাহুতকে হুকুম জানায় দবীর।

ইশাক কিন্তু থামেনি। এমনকি নামেওনি তার অশ্বপৃষ্ঠ থেকে। আব্বাস খাঁএর চুণাব ত্যাগের খবর পেয়ে প্রায় ক্ষিপ্ত অবস্থা তাব। মেহ্‌মান শেব খাঁব পবিচর্যার ভাব বড় ভাইএর ওপর ছেড়ে দিয়েই ঘোড়া ছুটিয়েছে মির্জাপুবেব দিকে। সঙ্গে নিত্য সহচর কয়েকজন মাত্র সিপাহ্‌। গ্রাম্যপথেব স্থবিধা যেটুকু ছিল বর্ষার জলের নীচে তলিয়ে গিয়েছে তা। চলার বেগ ক্রমেই কমে আসতে থাকে অশ্বকয়টির। চাবুকের পর চাবুক পড়তে থাকে তাদের পিঠে। তবুও বাড়ে না তাদের গতি। আর মনের ভেতবে এক বিরাট ক্ষতির জ্বালা নিয়ে পশুকয়টিকেই গালাগাল করতে থাকে ইশাক।

একটু একটু করে বেলা পড়ে আসতে থাকে। ওদিকে উচ্চতর ভূমি পেয়ে জলের গভীরতাও আসে কমে। চিন্তায় পড়ে ইশাক। এগিয়ে চলবে, না পিছিয়ে যাবে। ওদিকে শের খাঁর মত মেহ্‌মান, এদিকে আমিনার মত পিয়ারা লেড়কি। উভয় দিকেই লোভ। একটি জীবনে উঠে দাঁড়াবার, আর একটি পেয়ারের। উভয়ই টানে। এক-দিকে স্রোত, অপরদিকে গুণের দড়ি। দো-টানায় পড়া নৌকোর মত ইশাকও থেমে যায়। তার চিন্তিত পায়ের ইসারা পেয়েছে বুঝি

অশ্বতরটি। থেমে যায় সেও। এমন সময় পালে লাগে বাতাস। গুণের দড়ির টানের সঙ্গে মিশে যায় বাতাসের টান। স্রোতকে উপেক্ষা করেই তর্ তর্ করে এগিয়ে চলে তরিত্র। গ্রাম্য পথ। গৃহস্থের ঘরের পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে এগিয়ে গিয়েছে তার প্রয়োজন অনুযায়ী। সেই রকমই একটি গৃহস্থ বাড়ীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ইশাকেরা। কথাবার্ত্তাও বলে চলেছিল সরবেই। সেই কথাবার্তাই কৌতুহল জাগায় গৃহবাসীদের। যুদ্ধ তো কোথাও হচ্ছে না, অথচ দলের পর দল হাতী ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে মির্জাপুরের দিকে। কেন? জিজ্ঞাসু মন তাদের টেনে নিয়ে এসে দাঁড় করায় রাস্তার ধারে।

"এই, এধার দিয়ে সিপাহ্‌শালার আব্বাস খাঁকে যেতে দেখেছিস্?" দেহাতী মানুষের কাছ থেকে সঠিক খবর পাবার আশায় জিজ্ঞাসা করে ইশাক।

কিন্তু কে সিপাহ্‌শালার আর কে জায়গীরদার তার সঠিক খবর বড় একটা রাখে না গ্রামের মানুষ। নায়ের আসে, দেয় কর নিয়ে চলে যায়। এই পর্যন্তই উপরওয়ালাদের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ। তাই ইশাকের জিজ্ঞাসা অনুযায়ী উত্তর দিতে পারে না তারা। শুধু বলে যে একজন গিয়েছে হাওদায় চড়ে, সঙ্গে একটি জেনানা ছিল আর তারপর একজন গিয়েছে ঘোড়ায়, সঙ্গে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার সিপাহ্ আর এক্কায় ছিল দু'জন জেনানা।

"নিশ্চয় দবীর খাঁ। চল, চালাও ঘোড়া।"

উন্মত্ত আবেগে চেঁচিয়ে ওঠে ইশাক। সঙ্গে সঙ্গে বল্গার এক ঝাঁকিতে ছুটিয়ে দেয় তার ঘোড়া। সঙ্গী সিপাহ্ কয়জনকেও বাধ্য হয়ে ছুটতে হয় তার পিছন পিছন।

পড়ে আসা বেলায় গ্রাম্য পথে এরই ভেতরে অন্ধকারের আবছায়া নেমে এসেছে। আর একটু পরেই আরম্ভ হবে মির্জাপুরের

বন। দিনমানেও যেখানে চাপ চাপ অন্ধকার রহস্যময় করে রাখে স্থানটিকে, পড়ন্ত বেলায় সে হয়ে উঠবে নিঃসীম নিশ্ছিদ্র। সেই বৃক্ষবহুল বনের ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া আর মৃত্যুকে আহ্বান করা একই কথা। অশ্বের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে ইশাকের চিন্তা। ভাবনার ভেতর দিয়েই কোন এক সময়ে শেষ হয়ে গিয়েছে চুণারের সীমানা। এসে প্রবেশ করেছে তারা মির্জাপুরের বিখ্যাত অটবীর ভেতরে।

"ভুল হয়ে গেল," চিন্তিত ভাবে বলে ওঠে ইশাক, "ওদের কাছ থেকে একটা মশাল চেয়ে আনলে হ'ত।"

পিছনের মানুষগুলি সে কথার আর কোন উত্তর করেনা। তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনের মানুষটির ওপরে। মেষের স্বভাবের মত ঐ সামনের মানুষটিকে লক্ষ্য করেই চলতে হবে তাদের। নিস্তব্ধ বনের মাঝখানে নির্বাক কয়টি মানুষ এগিয়ে চলতে থাকে অশ্বক্ষুরের সাড়া জাগিয়ে।

হঠাৎ সজোরে বাশ টেনে ধরে ইশাক। দূর থেকে একটা কোলাহলের আওয়াজ ভেসে আসছে না? শুধু ইশাক নয়, উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে সকলেই। হয়ত' দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে কোনও পথচারীদল। ইশাকের চিন্তা আরও একটু এগিয়ে যায়। আব্বাস খাঁ তার স্ত্রীকন্যা নিয়ে আক্রান্ত হয়নিত'? বিশেষ ক'রে আমিনার বিপদাশঙ্কায় বিশেষ উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে সে। দু'দিন নয়, একদিনই মাত্র আমিনাকে দেখেছে সে। দেখেছে তার উন্মত্ত যৌবনের সমস্তটুকু কামনা দিয়ে। তার চমক্, তার নিটোল কপোলে ছল্‌কে ওঠা রক্তের আভা। তারপরই দ্রুত পলায়নপরা তার নিতম্বিনী রূপ। সিপাহ্ সংগ্রহের মতদ্বৈধতার যাতে অবসান ঘটে তারই চেষ্টায় গিয়েছিল সে আব্বাস খাঁর গৃহে। নিদাঘের নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর। সচরাচর এই সময়েই দবীর আসে আমিনার সঙ্গে দেখা

করতে। তাই দরজায় আঘাত পড়তে নিশ্চিন্ত মনে এসেই দরজা খুলে দিয়েছিল আমিনা। তারপরই বিরাট এক চমক্ খেয়ে ঠোঁট তুটি ফাঁক হ'য়ে গিয়েছিল তার। তু'চোখে ভীতা হরিণীর দৃষ্টি। মুহূর্ত্তমাত্র। তারপরই ছুটে অন্দরের দরজা গলিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল সে। অপরিচিত মেহ্মানের জিজ্ঞাস্যের উত্তর দেবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছিল বাঁদীকে।

মনের পর্দায় যে তসবীর ওঠবার তা এক লহমাতেই ওঠে। ইশাকের মনেও আমিনা রেখে গিয়েছে এক অক্ষয় ছাপ। তারই জন্যে সে চায় উন্নত আসন, শের খাঁর সাহায্য। অন্যথায় আব্বাস খাঁর কন্যাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসা কোনদিনই সম্ভব হবে না।

সেই আমিনার জন্যেই সে ছুটে এসেছিল এতদূর। এখন তারই অমঙ্গল আশঙ্কায় বুকখানি কেঁপে ওঠে তাঁর। যদি অঘটন কিছু ঘটিয়ে বসে দস্যুদল! যদি তারা লুটের মালের সঙ্গে আমিনাকেও নিয়ে গিয়ে তাদের ঘরে তোলে!

রাশটানা বল্লায় আবার ছুটবার ইসারা পড়ে। কোনরকমে বৃক্ষকাণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষিত হওয়া থেকে ঘোড়াটাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলে ইশাক। কিছুদূর যেতেই মেলে একখণ্ড ফাঁকা জমি। তার ওপরে এসে কয়েক মূহূর্ত্তের জন্যে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে যায় সে। আন্দাজ করতে চেষ্টা করে কোন দিক থেকে ভেসে এসেছিল কোলাহলের শব্দ। তারপর তীরবেগে সেই মাঠখণ্ড পার হয়ে যায়। গিয়ে আবার প্রবেশ করে সে সেই অটবীরাজ্যে। কিন্তু এবারে আর আন্দাজে পথচলা নয়। স্থির নির্দিষ্ট গতি। দেখতে দেখতে আরও কাছে গিয়ে পড়ে ইশাক। কিন্তু কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল যেন সব। সন্দেহ হয় ইশাকের। এই চীৎকার আর থেমে যাওয়া আততায়ীর কোন কৌশল নয়ত'? বিপদগ্রস্থের আর্তরব তুলে হয়ত' তাদের ফাঁদে ফেলতে চায়। চিন্তায় পড়ে ইশাক। যাবে, কি

যাবেনা। মনস্থির করতেই কিছু সময় কেটে যায়। তারপ
অকুস্থানে যাওয়াই স্থির করে সে একটু এগুতেই দেখা মেয়ে
একটি পথের।

মির্জাপুর আর চুণারের একমাত্র যোজকপথ। সবেগে এগিয়ে
যায় ইশাক। চীৎকার ক'রে ওঠে, "হুঁসিযার!"

লাফিয়ে নেমে পড়ে ইশাক। স্পষ্ট দেখা যায় না কিছু। ফেলে
যাওয়া কয়টি মশাল ইতস্ততঃ পড়ে পড়ে জ্বলছে। আততায়ীদের
কারও দেখা নেই। ছুটে গিয়ে একটি মশাল তুলে নেয় সে। তেজ
বাড়ে মশালের। সেটিকে হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ক্ষুদ্র রণাঙ্গনটি
দেখতে থাকে। খণ্ডিত-হাত একটি মানুষ পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে
রক্তক্ষরণে স্তিমিত প্রাণশক্তি। হয়ত আর বেশীক্ষণ নয়। চেহারায়
মনে হয় আততায়ীদেরই একজন। একটু দূরে একজন সিপাহ্ পড়ে
বিগত প্রাণ সিপাহ্‌টিকে আব্বাস খাঁএর সঙ্গে কয়েকবারই দেখেছে
ইশাক। তাহলে সে কোথায়? এদিক ওদিকে দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে
ইশাক। একজন আততায়ী, তরবারী দিয়ে একটি বৃক্ষের সঙ্গে
গেঁথে রাখা হ'য়েছে। ঝুলে পড়েছে মাথা। আরও কয়েকজন
পড়ে রয়েছে এদিকে ওদিকে। কারও দেহ আহত সাপের মত মুচড়ে
মুচড়ে উঠছে। কেউ বা নিশ্চল।

"এ ঢাল কার?" ইশাকের সঙ্গীদের ভেতরে একজন ওধার থেকে
চীৎকার করে উঠে।

চীৎকার শুনে ছুটে সেখানে গিয়ে দাঁড়ায় ইশাক। মশালের
আলোয় ভাল করে ঢালটি দেখে। হ্যাঁ, আব্বাস খাঁর ঢাল বলেই
মনে হচ্ছে। কিন্তু মানুষটি কোথায়? আর আমিনারাই বা
কোথায় গেল? এতক্ষণে যেন সমস্ত দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি এসে
চেপে বসে তার সারাটা দেহ জুড়ে। ব্যর্থতায় ভারাক্রান্ত মন।
হঠাৎ কি এক আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার চোখদুটি। ছুটে যায়

ছিন্ন-হাত সেই আততয়ীটির দিকে। সে হয়ত বলতে পারবে কিছু। একটা কোনও নিশানা, যা অবলম্বন ক'রে ইশাক গিয়ে পৌঁছতে পারবে আমিনার কাছে। কিন্তু নসীব তাকে সে সুযোগটুকুও দেয়না। সমস্ত জিজ্ঞাসার বাইরে চলে গিয়েছে মানুষটি।

চরম ব্যর্থতার গ্লানিতে অবনত মস্তক ইশাক ফিরে আসে তার ঘোড়াটির কাছে। ক্লান্ত দেহটিকে যেন দু'হাতের জোরে কোন রকমে টেনে তোলে জন্তুটির পিঠের ওপরে। শিক্ষিত জানোয়ার সামান্য ইসারাতেই বুঝে নেয় তার গতিপথ। সওয়ারের বোঝা পিঠে নিয়ে ফিরে যেতে থাকে চুণারের দিকে।

ত্যক্ত রণাঙ্গণটিই শুধু দেখে গিয়েছে ইশাক। জানতে পারেনি তার ইতিহাস। প্রয়োজনও বোধ করেনি কোন। কেবলমাত্র আমিনাকে না পাওয়ার ব্যথাটাই বেজেছিল তার বুকে। হতাশ অন্তঃকরণে ফিরে গিয়েছিল আবার চুণারের দিকে।

দুর্গের মুখেই দেখা মীর আহ্‌মদের সঙ্গে। ব্যস্তভাবে চলেছে কোথায়। ইশাককে দেখেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে যায়। ধমক দিয়ে ওঠে, "গিয়েছিলি কোথায়? জীবনে উঠতে হলে সেই সাধনাতেই লিপ্ত থাকতে হয়।"

আমিনার তসবীরের ভাঙা শিসাটা তখনও বিঁধে রয়েছে মনে। খচ্‌ খচ্‌ করে উঠছে জায়গাটা। তার ওপরে ভাইসাবের এই ভর্ৎসনা যেন আর সহ্য হয়না ইশাকের। উষ্মাভরেই বলে ওঠে, "আমার সাধনা তরোয়াল চালনার। প্রয়োজন হলে বল, পিছিয়ে যাবনা।" বলেই হন্‌ হন্‌ করে দুর্গের ভেতরে চলে যায়।

তার চলমান দেহখানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মীর-

আহ্মদ। আপন মনে বলে ওঠে, "কি যেন হয়েছে ওর।" তারপর আবার হাঁটতে থাকে ব্যস্তভাবে।

দুর্গের ভেতরে ঢুকে আবার দাঁড়িয়ে যেতে হয় ইশাককে। এমন রোশনাই ইতিপূর্বে সে দেখেনি কোনদিন। দুর্গ-প্রাচীরের মাথায় সারিবদ্ধভাবে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে মশাল। বিরাট একটি সামিয়ানা টাঙান হয়েছে চত্বরেব মাঝখানে। তার চার কোণে ঝুলছে বেশ বড় আকারের চারটি বাতিদান। সামিয়ানার ঠিক মাঝখানে একটি। নীচে বিরাট গালিচা পাতা। পশ্চিম দিকের একাংশে রসুইএর ব্যবস্থা হয়েছে। বাতাসে গোস্ত্ রসুইএর গন্ধ। মনে মনে হাসে ইশাক। ভাইসাব নিজের আখেরের দরজাটা ভালভাবেই খুলবাব ব্যবস্থা করেছে। তাবপর ঘুরে চলে মালিকার মহলের দিকে।

নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই বোধহয় ভাবছিল মালিকা। ইশাক গিয়ে ঘরে ঢুকতে একটু নড়ে চড়ে বসে শুধু। কোনও কথা বলেনা।

"কিরে, ভয় হচ্ছে ?" সুসজ্জিত ঘরখানি ভালভাবে দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করে ইশাক।

"ভয় নয়, ভাবনা। এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না ভবিষ্যৎ আমাকে কোন দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।" উত্তর দেয় মালিকা।

"ঠিক পথেই নিয়ে যাচ্ছে। নসীব খুলে গেল তোর। আমাদের ভুলে যাস্‌নে যেন।" রহস্য করে ইশাক।

"তোমার মসকরা থামাও।" ধম্‌কে ওঠে মালিকা।

"বেশ থামালাম। যা বলবি তুই, তাই এখন আমাদের কাছে হুকুম। সাদী কবে ?"

"জানিনা।" ঝাঁকিয়ে ওঠে মালিকা।

"যা খসবুই বেরিয়েছে গোস্তের—"

"তুমি থামবে না ?" সোজা টান হয়ে বসে মালিকা।

"থামছি। সত্যি, বল্‌না, কবে সাদী হবে?"

"সত্যিই তুমি জাননা?" এবারে একটু আশ্চর্যই হয় মালিকা, জিজ্ঞাসা করে, "কোথায় ছিলে?"

"মির্জাপুরের বনে।"

"কেন?"

"আমিনাকে ফিরিয়ে আনতে।"

"সে কি মনের দুঃখে বনে গিয়েছে? পেলে?"

"না। দবীর খাঁর খোঁজ না পেলে তার খোঁজও পাওয়া যাবে না। সে দেখা যাবে পরে। সাদী কি কাল?"

"হ্যাঁ। সাদী সাদী ক'বে অস্থির হচ্ছ কেন?"

"আমোদ আহ্লাদ করতে হবেত,' সেইজন্যে। চলি। খাঁ সাহেবকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করিস্।"

আবার ঘুরে দেখতে দেখতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় ইশাক।

মালিকা চোখ বুঁজে তাব ঘূর্ণায়মান নসীবের চাকাটিকে একবার দেখবার চেষ্টা করে। ঠিক বুঝতে পারে না তার গতি এখন ঊর্দ্ধগামী না নিম্নগামী। হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় সে। নিজের একটি গুপ্ত পেটিকা থেকে বের করে একটি চাবি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটাকে দেখতে থাকে। কালো মত একটা ছোট্ট দাগ। দাগটির দিকে স্থিব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মালিকা। তার প্রথম শওহরের রক্ত। দরজাব মুখটিতেই পড়েছিল তাব দেহ। সে নিজেও আহত এবং রক্তক্ষরণে যথেষ্ট দুর্বল। কিন্তু ভবিষ্যতের চাবিকাঠি নিজের দখলে রাখতে একটুও ভুল হয়নি তার। তাজ খাঁকে আঘাত করবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন অসাড় হয়ে গিয়েছিল দবীর। সমস্ত দেহের মধ্যে তার দুটি বিস্ফারিত চোখ শুধু প্রাণের পরিচয় দিচ্ছিল। তারপরই সে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে। আর কালমাত্র বিলম্ব না ক'রে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার কবেছিল মালিকা। নিজের আঘাতকে

সম্পূর্ণ অবহেলা করে ছুটে গিয়ে বসেছিল সে তাজ খাঁর স্থির নিষ্কম্প দেহটির পাশে। রক্তে যেন ভাসছে সে দেহ। দেখে মাথাটি কেমন ঘুরে উঠেছিল তার। কিন্তু সে মুহূর্ত্ত কয়েকের জন্যে। তারপরই স্থিরিকৃত মনে তাজ খাঁর কটিবন্ধ থেকে খুলে নিয়েছিল এই চাবি। নিয়ে এসে রেখে দিয়েছিল তার গুপ্ত পেটিকায়। সেই চাবিটিই আজ এই প্রথমবার বের করে দেখে সে তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের একমাত্র হাতিয়ার।

অনন্যদৃষ্টি হ'য়ে সেই পদার্থটির দিকে তাকিয়েছিল সে। এমন সময় ঘরের ভেতরে কার পদশব্দ শোনা যেতে ফিরে তাকায়। দেখে মীর দাদ ঢুকেছে ঘরে। তাড়াতাড়ি চাবিটা আবার পেটিকায় রেখে দিয়ে এগিয়ে যায় মীর দাদের দিকে।

"একজন মুন্সীকে ডেকে আনতো," বলে সে।

"কেন?"

"একটা চিঠি লিখতে হবে।"

বেরিয়ে যায় মীর দাদ। ইত্যবসরে মালিকাও পেটিকাটি আবার গুপ্তস্থানে রেখে দেয়। ফিরে এসে বসে গির্দায় হেলান দিয়ে।

একটু পরেই ফিরে আসে মীর দাদ। সঙ্গে মুন্সী। কাগজ কলম হাতে।

"পত্র লেখ। খাঁ সাহেবের কাছে। বয়ান লেখ, মাননীয় মেহ্‌মান্," বলে যেতে থাকে মালিকা আর লিখে যেতে থাকে মুন্সী, "খোদার মর্জিতেই নসীবের চাকা ঘোরে। আমি বদনসীব। তাই ভয় হয়, কেহ যদি আমাকে সাহায্য করিতে আসিয়া বিপাকে পড়ে সে হইবে আরও লজ্জার বিষয়। কিন্তু আওরৎ হইয়া কাহারও সাহায্য ছাড়া চলিবার কথা চিন্তা করিতেও ভয় হয়। আশমানে যে সব চিড়িয়া ওড়ে তাদেরও ভয় থাকে বাজের। ইন্‌শানের ভয় শের আর ভাল্লুর। তাই শেরএর ভেতরে

যে শাহ্ তার কাছেই আমি আশ্রয় চাই। যদি সে আশ্রয় পাই তাহা হইলে নিজেকে খুশনসীব বলিয়া ভাবিব।

কিন্তু তাহার পূর্বে একটি, গোস্তাকি মাফ হয়, একটি অনুরোধ আছে। সেটি হইতেছে এই যে দুর্গের অধিকার সম্পূর্ণ আমার থাকিবে এবং আমার ভাইদের প্রতিষ্ঠার পথে সাহায্য করিতে হইবে। মহামান্য মেহ্মানের এই সামান্য জবানটুকু পাইলে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। তসলিম রাখা হইল।"

চিঠি লেখা শেষ হ'তে তার নীচে নিজের মেহেদী রাঙান হাতের ছাপ দিয়ে দেয় মালিকা। মীর দাদের হাতে সেখানি তুলে দিয়ে বলে, "খাঁ সাহেবের হাতে দিয়ে তাঁর উত্তর নিয়ে আসবে।"

খৎ হাতে নেয় মীর দাদ। মুন্সীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

সারারাত ধরে কলমা পড়বার আর কিছু নেই। উত্তর চেয়েছিল মালিকা। আশার অতিরিক্ত উত্তরই পেয়েছে সে। তার সর্তের সঙ্গে আর একটু যোগ করে দিয়েছে শের খাঁ। দুর্গের অধিকর্ত্রীর সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও নিয়েছে সে। অতএব আবার একবার দুল্হান্ সাজতে হয়েছে মালিকাকে। বিবাহের মজলিস্ থেকে কাজী ইত্যাদি সাক্ষী পঞ্চজন রীতি-মাফিক একবার গিয়েছে শের খাঁর কাছে। জিজ্ঞাসা করেছে সাসারামের জায়গীরদার হাসান খাঁ শূরের পুত্র ফরিদ খাঁ শূর ওরফে শের খাঁ তুর্কীদেশবাসী মীর বক্সের কন্যা লড মালিকাকে নেকা করিবার জন্য এই এই যৌতুকে স্বীকৃত আছে কিনা। স্বীকৃতি লাভ করে তারা আবার গিয়েছে লড মালিকার মহলে। সেখানেও অনুরূপ স্বীকৃতি

লাভের পর ফিরে এসেছে মজলিসে। দিয়েছে নওশার শের খাঁ ও তুলহান্ মালিকার স্বীকৃতির বিবরণ। এবারে খোৎবা-এ-নেকা পাঠ করায় আর বাধা নেই। সেই সমস্বর প্রার্থনা শেষ হ'তেই মীর আহ্মদ আর ইশাক গিয়ে হাত ধরে নিয়ে এসেছে মালিকাকে। ওধার থেকে আনা হয়েছে শের খাঁকে। পর্দার আড়ালে একই আঈনার বুকে তারা দেখেছে পরস্পরের মুখ। তারপর নওশার সঙ্গে ফিরে এসেছে মালিকা নিজের মহলে।

এতক্ষণ পর্যন্ত যেন একটা সম্মোহিতের ভাব আড়ষ্ট করে রেখেছিল মালিকাকে। এক জীবন থেকে আর এক জীবনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতেই ব্যস্ত মন। যা বলেছে মৌলানা, মৌলভী আর কাজীর দল, তাই করে চলেছে। একান্ত অনুগতের মত।

রাত শেষ হ'তে তখনও কিছু বাকী। নিজের মহলে এসে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে মালিকা। সহজ হওয়ার চেষ্টা করে। হাসি হাসি মুখে বিদায় দেয় সঙ্গীদের। তারপর ফিরে তাকায় শের খাঁর দিকে। পূর্ণ স্বচ্ছ সে দৃষ্টিতে যেমন মোহ নেই তেমনি কোন রূঢ়তাও নেই। শান্ত অথচ গভীর অনুসন্ধানী। মানুষটার ওমর তাজ খাঁএর চাইতে বেশীই হবে। কিন্তু শক্তির স্ফূরণ লক্ষ্য করা যায়। মেদের আতিশয্য নেই। সুযোগ সন্ধানী বলেই মনে হয়। প্রশ্ন জাগে মালিকার মনে—যদি সে সুযোগ আসে তাহ'লে পারবে কি এই মানুষটি আরও ওপরে উঠতে? যেখানে দাঁড়িয়ে দবীরকে অনেক নীচের মানুষ বলে মনে হবে। দবীরের কথা মনে পড়তেই ছট্ ফটিয়ে ওঠে মালিকা। প্রতিহিংসার জ্বালায়। উঠতেই হবে তাকে। তা সে যে মূল্যেই হ'ক।

"কি দেখছ?" নূতন সুহাগনের সঙ্গে প্রথম কথা বলে শের খাঁ।

"আপনাকে।" একটু এগিয়ে আসে মালিকা, "ভাবছি আপনি আরও কত বড় হতে পারেন।"

"হয়ত' পারি। কিন্তু তার জন্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।"

"যদি সে প্রয়োজন মেটে?" আরও এগিয়ে আসে মালিকা। উত্তেজনায় তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছে তার চোখ দুটি। স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ শের খাঁর মুখের ওপরে।

"তাহ'লে একবার চেষ্টা করে দেখা যায়—" বলেই থেমে যায় শের খাঁ। নহলী বেগমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"কি, বললেন না?" মেঝের ওপরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে মালিকা। উন্মুখ দৃষ্টি স্থাপিত তার নতুন শওহরের মুখের ওপর। তারপরই হঠাৎ 'বুঝেছি' বলে ছুটে যায় সে পাশের ঘরে। আবার একটু পরেই ফিরে আসে সুন্দর কাজ করা একটি কাঠের পেটিকা নিয়ে। তুলে দেয় সেটা শের খাঁর হাতে।

"আমার প্রচুর গহনা আছে এর ভেতরে। আপনার কাজে লাগবে।"

সেটি খুলে একবার দেখেও না শের খাঁ। পেটরা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা এই নহলী বেগমের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে—এই আওরৎটিই বুঝি তার জীন্দ্‌গীর শুভ তারা। তার খোয়াবকে সত্যে পরিণত করতে এসেছে। একহাতে পেটিকাটি নিয়ে আর একহাতে মালিকার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে সে। টেনে নেয় কাছে। নিজের সীনার ওপরে। তার গোলাপ-রাঙা গালের ওপরে শ্মশ্রুমণ্ডিত আপন গণ্ডটি ঘষতে ঘষতে বলে, "তুমি আমাকে সাহায্য কর, আমি ওপরে উঠব, অনেক ওপরে।"

"আমার অনেক আছে," ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে মালিকা, "আপনি চেষ্টা করুন। আমি সব আপনাকে দেব, সব। শুধু আপনাকে ঐ বাদ্‌শাহী তক্তে দেখতে চাই।"

মির্জা মন্সুর আশ্রয় দিয়েছিল দবীরদের। স্বার্থ ছিল না সেখানে। ছিল দবীরের প্রতি স্নেহের টান আর আব্বাস খাঁর প্রতি বন্ধুপ্রীতি। তবুও সেখানে পূর্ণ আরোগ্যলাভের সময় পর্যন্ত থাকতে সাহস হয়নি কারও। খবর পেয়েছে তারা, শের খাঁ নেকা করেছে তাজ খাঁএর বেওয়া লড মালিকাকে অতএব মির্জাপুর আর নিরাপদ নয় তাদের কাছে। তাই সেস্থান ত্যাগ করে আবার এগিয়ে যেতে হয় তাদের। দু'দিন পরে যখন এলাহাবাদে এসে পৌঁছুল তারা তখন কথা কইবার সামর্থটুকুও বুঝি হারিয়ে ফেলেছে সকলে।

চক থেকে বেশী দূরে নয় সুলতান আলমের গৃহ। খবর পেয়ে ছুটে আসে সে। অতিথিদের বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। তাদের বিশ্রাম, আহার্য ইত্যাদির ব্যবস্থা করে শেষে খবর পাঠায় হেকিমের কাছে। তারপর একসময় এসে বসে দবীরের পাশে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। দবীর বোঝে একটা কিছু বলতে এসেছে সুলতান আলম। প্রসঙ্গটা যে কি হ'তে পারে তাও কিছুটা আন্দাজ করে সে। তাই সেই না বলা কথাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে নিজেই অন্য প্রসঙ্গ টেনে আনে, "আপনার ব্যবসা কি রকম চলছে ?"

"ভাল।" এক কথায় সেরে দেয় আলম সাহেব।

দবীরও ছাড়বে না সহজে। আবার বলে, "দিল্লীতে আর একটা দোকান করলে পারতেন।"

"দেখাশোনা করবে কে ?" ঠিক রাস্তা পেয়ে যায় আলম সাহেব। বলতে থাকে, "ছেলেত' নেই, আছে কয়টি মেয়ে। ভেবেছিলাম বড়টির সঙ্গে তোমার সাদী দিয়ে তোমাকেই বসাব দিল্লীতে একটি দোকান ক'রে দিয়ে। তা তুমি একি করে বসলে দবীর ? তক্তটা কি এতই বড় ?"

কি উত্তর এর দেবে দবীর ? নিজের মনকে প্রশ্ন করেছে

হাজারবার। বলতে গিয়েছে কতজনকে। কিন্তু না পেয়েছে নিজের মনের কাছ থেকে কোন সদুত্তর, না পেরেছে কাউকে বলতে। নিজের জ্বালা নিজেই বহন করে এসেছে দিনের পর দিন।

"এখন একথা শোনবার পর মেয়ে আর তোমাকে সাদী করতে রাজা নয়।" কথা শেষ করে আলম সাহেব।

এ একরকম ভালই হয়েছে, মনে মনে ভাবে দবীর। নিজের থেকে ঐ কথা কয়টি বলতে গেলে বড় রূঢ় শোনাত।

কিন্তু এরপর আর এ গৃহে অবস্থান সমীচীন নয়। সেই কথাটিই একটু ঘুরিয়ে বলে, "আমাদের যদি একটা মোকামের ব্যবস্থা করে দেন—"

"কেন, এখানে কি খুব অসুবিধে হচ্ছে তোমার?"

"না, তা নয়।"

"তবে? অত সহজে যাওয়া চলবেনা। খাও দাও থাক, সুস্থ হ'য়ে নাও, তারপর যাওয়ার প্রশ্ন উঠবে। আমি যাই, গদিতে শুধু কর্মচারীরা আছে।" যেমন এসেছিল তেমনি ব্যস্তভাবে চলে যায় আলম সাহেব।

নিজেকে একলা পেয়ে চিন্তার অতলে তলিয়ে যায় দবীর। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ তিনটি কাল যেন জড়াজড়ি করে রয়েছে। অতীতের সম্বন্ধ ধরেই এসেছে বর্তমানের আলম সাহেবের কাছে। আর ভবিষ্যতের জন্যেও তাঁরই সাহায্য প্রয়োজন। আর একজন পারে সাহায্য করতে। আব্বাস খাঁ। কিন্তু কেমন আছেন তিনি, কোথায় আছেন, তাও জানা নেই তার। একবার খোঁজ নিতে হয়! উঠতে যায় দবীর। বাঁ হাতে দেহের ভর সইছেনা। ডানদিকে ফিরতে হয় তাকে। হ্যাঁ, এবারে ডান হাতে ভর দিয়ে বেশ ওঠা যাচ্ছে। কিন্তু সম্পুর্ণ উঠতেও পারেনা সে। তার পূর্বেই বাধা পড়ে।

"অসুস্থ দেহ নিয়ে কোথায় যাবে?"

দু'খানি নরম হাতের চাপ দিয়ে দবীরকে আবার শুইয়ে দেয় আমিনা। দবীরের পাশ ফিববাব মুহূর্তেই এসে ঘরে ঢুকেছে সে।

"যাচ্ছিলাম তোমার আব্বাজানের কাছে। কেমন আছেন তিনি?"

"একই রকম।" মুখখানিব ওপবে ব্যথার ছাপ পড়ে আমিনার।

"আমার জন্যেই তাঁর আজ এই দুর্দ্দশা।"

"তাঁর স্ত্রী এবং কন্যাও পড়েছিল দস্যুদের কবলে। বাজে কথা ছাড়। এবারে আমাকে তোমার সব কথা বল। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন একটা বিবাট ভুল করেছিলাম।"

"বলব আমিনা। কিন্তু এখন নয়। এখন তুমি যাও। কেউ হয়ত' এসে পড়তে পারে।"

"কবে বলবে?"

"দিল্লী গিয়ে।"

"দিল্লী?"

"সেখানে আমাকে যেতেই হবে। বাদশাহ্ হুমায়ুনের ফৌজে যোগ দিয়ে চুণার উদ্ধার আমাকে করতেই হবে।"

"তার চাইতে বড় আনন্দ আর আমার কিছুতেই হবেনা। সত্যি, চুণারকে আমি বড্ড ভালবেসে ফেলেছি। ঘুমোও।"

দবীরের মাথাটা সস্নেহে একটু ঝাঁকিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় আমিনা।

দবীর সেরে ওঠে একপক্ষ কালের ভেতরেই। কিন্তু আব্বাস খাঁ এবং সিপাহ্‌রা তখনও শয্যাগত। সুলতান আলম পূর্বের মতই অতিথিদের পরিচর্যা করে চলেছে। দেখে লজ্জা হয় দবীরের।

আত্মীয় তার আবও অনেকেই আছে কিন্তু এমন ভাবে আশ্রয় আর কেউই বোধহয় দেবেনা। ভাবতে ভাবতে আব্বাস খাঁর ঘরে গিয়ে ঢোকে সে। ওকে দেখে ইসারায় কাছে ডাকে সিপাহ্‌শালার। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে যতটা সম্ভব নীচু গলায় বলে, "তুমি দিল্লী চলে যাও দবীর।"

"কেন?"

"এখানে আমরা বোধহয় খুব নিবাপদ নই।"

"কেন, সুলতান আলম কি—"

"না, তিনি নন, ইশাক! এই বাড়ীরই একজন নোকরের কাছে সে অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। চুণারেব খবর রাখ কিছু?"

"শুনেছি মালিকা বেগমের সঙ্গে নেকা হয়েছে শের খাঁর।"

"সেত' মির্জাপুরে থাকতেই শুনেছি। আর?"

"জানিনা।"

"চুণার মির্জাপুরের জায়গীর, গচ্ছিত ধনরত্ন সমস্ত কিছু পেয়েছে শের খাঁ। অর্থশক্তিতে এখন সে প্রচুর শক্তিশালী। নতুন ক'রে সাজাচ্ছে তার ফৌজকে। কয়েক সহস্র নতুন সিপাহ্‌ নিয়েছে। ফজর থেকে প্রায় দুপুর পর্যন্ত নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের তালিম দেওয়ায়।"

"তার সঙ্গে আমাদের—"

"বলছি। মালিকার অনুবোধ উপেক্ষা করবার ক্ষমতা নেই শের খাঁর। তার ইচ্ছামতই মীর আহ্‌মদ আজ শের খাঁর দক্ষিণ হস্ত, ইশাক আছে চুণারে শের খাঁর দ্বিতীয় পুত্র জালাল খানের নায়েবে-সিপাহ্‌শালার হ'য়ে আর মীর দাদ আছে খাঁ সাহেবের তৃতীয় পুত্র কুতব খানের অধীনে।" বলেই একটু থেমে যায় আব্বাস খাঁ, কি যেন চিন্তা করতে করতে বলে, "এই ইশাক চায় আমিনাকে। সেই জন্যেই সে আছে চুণারে। কিন্তু এখান পর্যন্ত যে সে আসতে

পারে, তা আমি ভাবতেও পারিনি। যাইহ'ক, তুমি কি করবে এখন বল ?"

"আপনি যা বলবেন।"

"তাহ'লে দিল্লী যাওয়ারই ব্যবস্থা কর। আমি আজম আলি সাহেবকে পত্র লিখে দিচ্ছি। কোনরকম অসুবিধায় পড়তে হবেনা তোমাকে।"

"আর," কি একটা কথা বলতে গিয়েও থেমে যায় দবীর, একটু ঘুরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "আপনারা ?"

এইটুকু জিজ্ঞাসা করতেই রক্তিম হয়ে উঠেছে তার মুখ। লক্ষ্য করে আব্বাস খাঁ। সূক্ষ্ম একটি হাসির রেখা ফুটে ওঠে তার মুখে। সেটাকে লুকিয়ে ফেলে বলে, "আমিনার নেকা না হওয়া পর্যন্ত আমি যাই কি করে বল ?"

"আমি ভেবেছি যমুনার ওপারে আম্মাকে নিয়ে থাকব। চাষ আবাদ করে দু'জনের দিন কোন রকমে চলে যাবে।"

কথা শুনে হো হো করে হেসে ওঠে আব্বাস খাঁ। আর ঠিক সেই সময় হাসির বাতাসকে এক ঝাপ্টায় দূরে সরিয়ে দিয়ে ঝড়ো বাতাসের মত ঘরে ঢোকে সুলতান আলম।

"ভীষণ বিপদ খাঁ সাহেব।"

"আপনার আবার বিপদ কিসের ?" নিশ্চিন্ত মনেই জিজ্ঞাসা করে আব্বাস খাঁ।

"আমার নয়, আপনাদের," হাঁফাতে হাঁফাতে বলে সুলতান আলম, "এবং আপনাদের সঙ্গে জড়িয়ে আমার।"

"কি রকম ?"

"এখানকার সিকদারকে ঘুষ দিয়ে বশ করেছে একজন। সে নাকি তার দলবল নিয়ে আজ রাত্রে আমার বাড়ীতে চড়াও হবে।"

"আপনি জানলেন কি ক'রে ?"

"আমার কাছ থেকে যারা মাঝে মাঝে সেলামি নেয়, আমার বিপদের সময় এ গোপন খবর তারাই দেয়। এখন কি করবেন?" বলে আবার নিজেই যুক্তি দেয় সুলতান আলম, "আমি বলি কি, আপনারা এখুনি দিল্লীর দিকে রওনা হয়ে যান। তবে ওদের চোখ এড়াবার জন্যে নৌকোয় যেতে হবে। আগ্রা অবধি গিয়ে পৌঁছুতে পারলেই নিশ্চিন্ত। কি বলেন?" আব্বাস খাঁর মুখের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে সুলতান আলম।

"তাই করতে হবে অগত্যা।" চিন্তার অতল থেকে যেন উঠে আসে আব্বাস খাঁ, "আপনি দয়া করে একজন বিশ্বাসী মাঝির নৌকা ঠিক করে দিন। আমরা গুছিয়ে নিচ্ছি সব।"

"তাহ'লে তাই করি।"

সুলতান আলম বেরিয়ে যেতেই দু'হাতের ওপরে ভর দিয় আহত পাটিকে সোজা রেখেই উঠে বসবার চেষ্টা করে আব্বাস খাঁ। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তার পিঠে হাত দিয়ে সাহায্য করে দবীর।

"আমিনাকে খবর দাও দবীর, তাড়াতাড়ি। একটা আঈনা আনতে বল।"

এহেন অদ্ভুত হুকুমের তাৎপর্য কি তা বুঝবার আর সময় পায় না দবীর। আব্বাস খাঁএর হাতের ধাক্কা খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। একজন বাঁদীকে দিয়ে আমিনার কাছে খবর পাঠিয়ে দেয়। তারপর ফিরে এসে আব্বাস খাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তার আগমনের অপেক্ষা করতে থাকে।

একটু পরে এসে ঘরে ঢোকে আমিনা। হাতে একটি আঈনা।

"এদিকে আয়," হাত বাড়িয়ে কন্যাকে কাছে টেনে নেয় আব্বাস খাঁ, বলে, "আর সময় নেই আমিনা, সময় পাব কিনা তাও জানিনা। তাই তোর নেকা আজ এখানেই দিয়ে যেতে চাই। এদিকে এস দবীর।"

সরে আসে দবীর। দাঁড়ায় আব্বাস খাঁ আর আমিনার মুখোমুখি হ'য়ে। এবারে তাকে উদ্দেশ করে বলতে থাকে আব্বাস খাঁ, "শোন, তুমি, তাজ খাঁর বড়ছেলে দবীর খাঁ। আজ আমার অর্থাৎ আব্বাস খাঁর কন্যা আমিনাকে নেকা করবার জন্যে তোমার জিন্দ্গী যৌতুক দিলে। কবুল?"

"কবুল।" প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেয় দবীর।

অতঃপর কন্যার দিকে ফিরে বলে আব্বাস খাঁ, "তুমি তাজ খাঁর বড়ছেলে দবীর খাঁকে নেকা করবার জন্যে তোমার জিন্দ্গী যৌতুক দিলে। কবুল?"

লজ্জায় মাথাটা ঝুলে পড়ে আমিনার। অস্ফুট স্বরে জবাব দেয়— "কবুল।"

"খোদা মেহেরবান্ তোমাদের ভাল করুন।"

একটা বিরাট দায়িত্বের বোঝা নামিয়ে দেবার মত টানা নিঃশ্বাস ফেলে আব্বাস খাঁ। ত্ব'জনকেই বলে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়ে আঈনার বুকে ত্ব'জনের মুখচ্ছবি দেখতে। নিজে মুখ ফিরিয়ে বসে। প্রথমে দেখে আমিনা। তারপর দবীর দেখবার জন্যে একটু ঝুঁকে পড়ে। দেখে, আঈনার বুকে জেগে উঠেছে আমিনার জিব ভেঙচান রূপ।

"যাক্, এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত।" মুখ ঘুরিয়ে তাদের দিকে তাকায় অব্বাস খাঁ, দবীরকে বলে, "দবীর, তোমার আম্মাজানকে বলে এস কথাটা। আর সব গুছিয়ে নাও। আলম সাহেব ফিরে এলেই বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের।"

চারণ কবি হ'য়ে রাজস্থানের পথে পথে ফিরতে থাকেন ব্রহ্মচারী।

কিন্তু ভাঙা হাট কিছুতেই যেন জোড়া লাগতে চায়না। রাণা সঙ্গের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার গ্রামে গ্রামে আরম্ভ হ'য়েছিল সিপাহ্‌দের অত্যাচার। নেতার অভাবে সংঘবদ্ধ হ'য়ে সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আর সাহস পায়নি গ্রামবাসীরা। প্রাণের দায়ে, ভদ্রাসনের মায়া ত্যাগ করে উদ্বাস্তু হ'য়েছে তারা। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে কুমায়ূনের ভেতর দিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে পল্লায়। তারপর সেখান থেকে আরও এগিয়ে গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছে নেপালের গোর্খা অঞ্চলে।

ব্রহ্মচারী দেখেছেন সেই সব পরিত্যক্ত গৃহ আর ভূমি, আর বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠেছে তাঁর। পরদেশী কয়টি মানুষ, যাদের সঙ্গে এখানকার মাটির কোনও সংযোগ নেই, তারা এসে জেঁকে বসল উত্তব, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমে। যেন বিরাট-বপু হাতীর নিষ্প্রাণ দেহটা পড়ে রয়েছে, আর সিংহ থেকে শৃগাল অবধি মাংসলোভী প্রাণীর দল যে যেধার থেকে পেরেছে খুবলে খেয়েছে এবং খাচ্ছে। বিরাট আফশোষে চোখে জল এসে যায় ব্রহ্মচারীর। আবার তখুনি শুকিয়ে যায় তা অন্তরের প্রতিজ্ঞার উত্তাপে। এগিয়ে চলতে থাকেন তিনি। যান আর খোঁজ কবেন কোথায় এখনও আশার প্রদীপটা জ্বলছে, এখনও প্রাণের আগুন নিভে অঙ্গার হয়ে যায়নি।

ক্রমে রণথম্ভোরের পাশ দিয়ে গিয়ে সুমেল গ্রামে পৌছান তিনি। সেখান থেকেই শুনতে পান যোধপুর-রাজ মলদেও রাঠোরের বীরত্বেব কথা। "হর হর মহাদেও," আশায় আনন্দে চীৎকার করে ওঠেন ব্রহ্মচারী। ছুটে চলতে থাকেন যোধপুরের দিকে।

কিন্তু বিপত্তি ঘটে পথের ভেতরেই। সুমেল গ্রাম ছেড়ে কিছুটা যেতেই কোথা থেকে কয়টি লোক এসে ঘিরে ফেলে তাঁকে। তাদের দাবী ঘোড়াটি দিয়ে যেতে হবে তাদের। কথা শুনে মনে মনে হাসেন ব্রহ্মচারী। এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এলেন। মোলাকাৎও

যে বিশেষ বিশেষ লোকের সঙ্গে দু'একবার না হ'য়েছে এমন নয়। অস্ত্র পরীক্ষাও দিতে হয়েছে দু'এক জায়গায়। কিন্তু এমনভাবে কেবলমাত্র বাহনটিকে কেউ দাবী করেনি। একটু চমৎকৃতই হন তিনি। আর সেইভাবেই জিজ্ঞাসা করেন, "কেবলমাত্র ঘোড়াটি দিলেই হবে, না আমাকেও যোগ দিতে হবে তোমাদের সঙ্গে ?"

কথা শুনে হো হো করে হেসে ওঠে লোক কয়টি। একজন একটু বিদ্রূপ করে বলে, "তাজা ঘোড়ার ওপ'র তুমি তো এক বুড়ো ঘোড়া বসে রয়েছ। তোমাকে দিয়ে আবার কি কাজ হবে ?"

"কাজ হবে কিনা একটু পরীক্ষা করে দেখ "

কথার সঙ্গে সঙ্গে একটানে কোষমুক্ত করে নেন তরোয়ালখানা। শিক্ষিত ঘোড়াটিও হাতের ইসারায় ডাক ছেড়ে শিস্-পা হ'য়ে ওঠে। ঠন্ ঠন্ ক'রে বার দুই ধাতব শব্দ জাগবার পরেই দেখা যায় নিরস্ত্র একজনকে ঠেলে ফেলে দিয়ে একলাফে ব্যূহ ভেদ করে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ঘোড়াটি।

হতভম্ব লোক কয়টী। মুহূর্ত্তের ভেতরে কি যেন হ'য়ে গেল, ঠিক বুঝতে পারা গেল না। ঘোড়াটী শিস্-পা হ'য়ে উঠতে একটু মাত্র সরে দাঁড়িয়েছিল তারা। আর সেই লহমা-মাত্র সময়ের ভেতরেই পরাজয় ঘটে গেল তাদের ! রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে একযোগে ব্রহ্মচারীর দিকে ছুটে আসে তারা। ব্রহ্মচারীকেও যেন কৌতুকে পেয়ে বসেছে। অস্ত্রচালনা নয়, কেবলমাত্র অশ্বচালনার কৌশলেই বিপর্যস্ত করে তুলতে থাকেন তাদের। এমন সময় দূরে কি যেন দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায় লোক কয়টী। তারপরই ছুটতে থাকে। সুমেল গ্রামের উত্তরের পাহাড়টী তাদের লক্ষ্যস্থল।

ঘটনার এমন হঠাৎ পরিবর্তন দেখে ব্রহ্মচারীও কিছু কম আশ্চর্য হন না। এদিক ওদিকে দেখতে থাকেন। স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না। শুধু মনে হয় চৈতালী-ঘূর্ণির মত ধুলোর একটা পিণ্ড ঘুরতে

ঘুরতে এগিয়ে আসছে এদিকে। স্থিরদৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। একটু পরেই মাটীর ভেতর থেকে ফুঁড়ে ওঠে একটী মানুষের মাথা। ক্রমে জেগে ওঠে তার দেহটী। সঙ্গে একটী অশ্ব-মুণ্ড। তার পিছনে আরও কয়েকজন। এতক্ষণে স্পষ্ট আকৃতি লাভ করে তারা। বোঝা যায়, কয়েকজন অশ্বারোহী ছুটে আসতে আসতে নেমে পড়েছিল একটি খাদের ভেতরে। এখন সেখান থেকেই উঠে আসছে। কিন্তু এরা কারা? আর এদের দেখে এমন ভয় পেয়ে পালিয়েই বা গেল কেন তাঁর ঘোড়ার দাবীদার কয়টি? স্থিরদৃষ্টিতে ঐ অশ্বারোহীদের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন ব্রহ্মচারী। ক্রমে কাছে এগিয়ে আসতে থাকে অশ্বারোহী কয়জন। এখন আর অস্পষ্ট নয়, বেশ স্পষ্টই দেখা যায় তাদের। সকলের আগে আসছে যে তাকে বেশ মান্য গণ্য কেউ বলেই মনে হয়। আর সকলে বোধহয় পার্শ্বচর। আরও কাছে আসে তারা। ক্রমে এগিয়ে এসে ব্রহ্মচারীর সামনে দাঁড়িয়ে যায়।

"আপনাকে বিদেশী বলে মনে হচ্ছে।" দলটীর ভেতরে পদস্থ বলে যাকে মনে হয় তিনিই কথা বলেন, "এদিকে কোথায় যাবেন?"

"রাণা মলদেও রাঠোরের কাছে।" উত্তর দেন ব্রহ্মচারী।

"ও। তাহ'লে আসুন আমাদের সঙ্গে।"

আবার এগিয়ে চলতে থাকে দলটি। ব্রহ্মচারী সেই পদস্থ ব্যক্তিটির পাশে পাশে চলেন। নিঃশব্দে কিছুটা পথ অতিক্রম করবার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন তিনি, "কয়টি লোক এসে আমার ঘোড়াটিকে দাবী করেছিল কেন?"

প্রশ্ন শুনে পাশের মানুষটি একবার তাঁর ঘোড়াটির দিকে তাকান, তারপর সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেন, "প্রথমতঃ আপনার এই আরবীয় ঘোড়াটি লোভনীয়। দ্বিতীয়তঃ এখানে ঘোড়া খুব বেশি দামে বিকোয়। সেইজন্যেই বোধ হয়—" কথাটি অসমাপ্ত

রেখেই আবার ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে তাকান, কৌতুকের স্বরে জিজ্ঞাসা করেন, "পারল না নিতে ?"

"না। একটু বিপর্যস্থ হ'ল শুধু।" ব্রহ্মচারীর গলার স্বরেও তরল ভাব।

"কি রকম ?"

"ব্যূহসৃষ্টি করেছিল, কিন্তু এক মুহূর্ত্তে তা রক্ষা করতে পারেনি। তারপর শুধু অশ্বচালনার কায়দাতেই ওরা ছিট্‌কে পড়ছিল। অস্ত্রের ব্যবহার করতে হয়নি।"

কথা শুনে হো হো করে হেসে ওঠেন ব্রহ্মচারীর পাশের মানুষটি। কিন্তু সেদিকে তখন আর মন নেই ব্রহ্মচারীর। গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন তাঁরা। গ্রামীণ মানুষ যে দেখছে এই দলটি কি, শ্রদ্ধার নমস্কার জানাচ্ছে। বিশেষ করে তাদের দৃষ্টি ঐ পদস্থ ব্যক্তিটির দিকে। কেন ? প্রশ্ন জেগেছে ব্রহ্মচারীর মনে। এই মানুষটি কি রাণা মলদেও রাঠোরের প্রধান সেনাপতি ? অথবা মন্ত্রী ?

"রাণার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ আলাপ নেই বুঝতে পারছি। তাহ'লে কি প্রয়োজনে এসেছেন ? আর কোথা থেকেই বা এসেছেন ?" চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করেন পদস্থ ব্যক্তিটি।

"প্রয়োজনের কথা তাঁকে বলব।" উত্তর দেন ব্রহ্মচারী, "বর্তমানে আসছি দিল্লী থেকে। পালিয়ে।"

"পালিয়ে কেন ?"

"বাদশাহ্ বাবরের হুকুমে অন্তরীণ ছিলাম।"

"তার আগে ?"

"চুণারে।"

"সবই বুঝলাম।" বলে একটু সময় চুপ করে থাকেন প্রশ্নকর্তা। তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলেন, "রাণা

সংগ্রাম সিংহের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গিয়েছে রাজপুতনার শক্তি। আর বোধহয় এক করা যাবে না তা।"

"হতাশ হ'লেও চলবে না," জোর দিয়ে বলে ওঠেন ব্রহ্মচারী, "বিদেশ থেকে এসে মাথার ওপরে চেপে বসে এক এক ক'রে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে খাবে, এই কি আপনি চান ? মুসলমানদের কোন কর নেই, আর এদেশ যাদের তাদের কর দিতে হচ্ছে ঘরবাড়ী বিক্রী করে। জিজিয়া করের মত এক অপমানজনক করকেও আজ সহ্য করতে হচ্ছে আমাদের।"

"আপনি বড় উত্তেজিত হ'য়েছেন।"

"হ'য়েছি।" গম্ভীরভাবে বলেন ব্রহ্মচারী, "তার কারণ আমি রাও গঙ্গাজীর মত সিংহের পুত্র মলদেও রাঠোরের কাছ থেকে এ রকম কথা আশা করিনি।"

"আপনি চিনতে পেরেছেন ?" একটু আশ্চর্যই হন মলদেও রাঠোর। জিজ্ঞাসা করেন, "কি ক'রে চিনলেন ?"

"হিসাব মিলিয়ে। সেনাপতি কি মন্ত্রী হ'লে স্ব-পরিচয় দিয়ে অভিবাদন নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়ত। কিন্তু যে জানে, তার সম্মানের আসন পাতা আছে সকলের অন্তরে, বাইরের ঐ লোক-দেখান অভিবাদনের জন্যে সে লালায়িত নয়।"

কথা শেষ করে মাথা নুইয়ে সম্মান জানান ব্রহ্মচারী।

তারপর আর কোন কথাই হয় না দু'জনের ভেতরে। নিঃশব্দে অতিক্রান্ত হ'তে থাকে পথ। শিলা-শক্ত মাটির ওপরে ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরের আঘাতে খটাখট্ শব্দ জাগতে থাকে।

ক্রমে পথ শেষ হ'য়ে আসে। যোধপুর রাজপ্রাসাদে প্রবেশের মুখে একবার মুখ তুলে ব্রহ্মচারীর দিকে তাকান মলদেও রাঠোর। বলেন, "আজ বিশ্রাম নিন। কাল আপনার সঙ্গে কথা হবে। আপনার অশ্বপরিচালন কৌশলও দেখব।"

কথা শেষ ক'রে সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে যান যোধপুর-রাজ। একজন মাত্র ব্রহ্মচারীর পাশে থেকে যায়। পথ দেখিয়ে অতিথি-শালায় নিয়ে যেতে হবে এই অতিথিকে।

নিরলস কর্মী শের খাঁ। জীবনে উঠে দাঁড়াবার পথে আয়েশের কোন স্থান নেই এই তার একমাত্র মূল-মন্ত্র। ভোরের পাখী সাড়া দেবার আগেই ঘুম ভাঙে তার। নেওয়াজ সারে। তারপর আরম্ভ হয় তার কাজ। কোথায় গঠন আর কোথা কোথা সংস্কারের প্রয়োজন। এ পর্যন্ত কত সিপাহ্ এল। তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা ঠিক হ'য়েছে কিনা। কাজের ব্যস্ততার ভেতর দিয়েই কখন ফজর হ'য়ে যায়। আর অপেক্ষা করা যায় না। আবার একবার নেওয়াজ সেরে নেয় শের খাঁ। তারপর নাস্তা সেরেই গিয়ে চেপে বসে ঘোড়ার পিঠে। ছুটে চলে বিন্ধ্যাচল পর্বতমালার পাদদেশ লক্ষ্য করে। সেখানকার বিস্তৃত ময়দানেই সিপাহ্দের কুচ্কাওয়াজের ব্যবস্থা হয়েছে।

সেদিনও তেমনি সিপাহ্দের শিক্ষাদান পর্যবেক্ষণ করছিল শের খাঁ। এমন সময় একজন অশ্বারোহী এসে থামে সেখানে। ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে যায় শের খাঁএর দিকে। কুর্ণিশ ক'রে বলে, "মামুদ লোদী আসছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

খবরটা শুনে খুব খুশি হ'তে পারে না শের খাঁ। কিন্তু মনের সে ভাবকে চেপে রেখে বলে, "তাঁকে আমার তসলিম জানিয়ে বলো যে মাননীয় মেহ্মানের পরিচর্যার কোনও ত্রুটি হবে না। এবং চুণারের সৌভাগ্য যে তাঁর মত একজন সম্মানীয় লোক এখানে আসছেন।"

কথাটি বলে আর সেখানে অপেক্ষা করে না শের খাঁ। ফিরে

চলতে থাকে চুণারগড়ের দিকে। মাথার ভেতরে চিন্তার কুণ্ডলী। নিজেকে সে এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করে না। কিন্তু অন্যান্য আফগান প্রধানদের ধারণা যে তাদের সঙ্গে যদি শের খাঁ আর মামুদ লোদী হাত মিলিয়ে দাঁড়ায় তাহ'লে হুমায়ুনের ক্ষমতাও হবে না সেই সম্মিলিত শক্তির সামনে দাঁড়াবার। আর সেই ধারণার ওপরে নির্ভর করেই মামুদ লোদীকে তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছে। শের খাঁ তার অমত জানানো সত্বেও। এখন মামুদ লোদীও বোধহয় সেই একই প্রস্তাব নিয়ে আসছে। কি উত্তর সে দেবে ?

ভাবতে ভাবতেই ফুরিয়ে যায় রাস্তাটুকু। তবুও ভাবনা তার শেষ হয় না। চিন্তা-ভারাক্রান্ত মাথাটি পড়েছে নুয়ে। পৃষ্ঠদেশের ওপরে আবদ্ধ দুটি হাত। গিয়ে উপস্থিত হয় সে মালিকার ঘরে।

"এত চিন্তিত যে জনাব ?" তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে মালিকা।

"হুঁ।" কেবলমাত্র একটি শব্দ বের হয় অন্যমনস্ক শের খাঁর গলা থেকে।

"অত ছোট উত্তরেই যদি সব বুঝব তাহ'লে আর এই বোরখা পরবার জাত হ'য়ে জন্মাব কেন ?"

মালিকার রহস্য-তরল গলা শুনে তার মুখের দিকে তাকায় শের খাঁ।

"বললে বুঝবে ?" একটু কঠিন ভাবেই জিজ্ঞাসা করে গিয়ে বসে পড়ে শের খাঁ।

"চেষ্টা করতে পারি।"

"আফগান প্রধানরা—"

"মামুদ লোদীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এখন তারা আপনাকে যোগ দিতে বলছে।"

নিজের কথার শেষাংশটুকু এই নয়া বেগমটির মুখ থেকে শুনে এক মুহূর্ত্তে সোজা হয়ে বসে শের খাঁ। চোখ দুটি হ'য়ে উঠেছে

তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধানী এবং কুতূহলীও।

"তারপর ?"

"তারপর আপনি জানেন। আপনার শক্তি বুঝে আপনি কাজ করবেন। আমার সেখানে কথা বলা ধৃষ্টতা। তবে মাঝে মাঝে পরীক্ষা না করলে ঠিক বোঝা যায় না কতটুকু শক্তি বাড়ল।"

যতক্ষণ কথা বলছিল মালিকা ততক্ষণ তার মুখের দিকে 'হাঁ' করে তাকিয়েই ছিল শের খাঁ। নিজের অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে যে এই আওরৎটি কেবলমাত্র তার বেগম নয়, তার শক্তি, তার চিন্তার অংশীদার।

"কিন্তু যদি পরাজয় ঘটে তাহ'লে যে তোমাকে পালাতে হবে এখান থেকে ?" উপায় ছেড়ে এবারে অপায়ের চিন্তায় আসে শের শাঁ।

"পালাব। আপনি যেখানে যাবেন সেইখানেইতো আমার ঘর।"

নিজের মনখানিকে যেন উজাড় করে মেলে ধরে মালিকা।

"কষ্ট হবে না ?"

এতক্ষণে গম্ভীর হ'য়ে যায় মালিকা। জ্বালা করে উঠেছে বুঝি আহত স্থানটি। মনটিও তার জ্বলে উঠেছে। স্বরেও প্রকাশ পায় দাঢ্যভাব। বলে ওঠে, "দৈহিক কষ্টকে আমি কষ্ট বলেই মনে করি না। আমার কষ্ট মনে। দবীরকে আমার চাই-ই। তার প্রাপ্য শাস্তি তাকে দিতেই হবে। কিন্তু আপনি দিল্লীর সিংহাসনে না বসলে তাকে পাওয়া সম্ভব নয়।"

কথা শুনে হো হো করে হেসে ওঠে শের খাঁ। হাসতে হাসতেই বলে, "আমার হ'য়েছে ভাল। তোমার ভাই ইশাক চুণার ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চায় না। সে নাকি একটি মেয়েকে খুঁজছে। আর তুমি খুঁজছ একটি ছেলেকে। এবারে তা'হলে আমাকেও

খুঁজতে হয়।"

"খুঁজুন। যেখানে যত আফগান আছে, খুঁজে নিয়ে এসে কাজ দিন আপনার অধীনে। তাতেও হবে না। আপনার দেশ পেশোয়ার থেকেও আনতে হবে।"

"তারপর ?" সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করে শের খাঁ।

"তারপর শুধু অধিকার আর সম্পদ বাড়ান—" নিজের স্থিরিকৃত মনের অকপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে কথাগুলি বলতে গিয়ে চোখ পড়ে শের খাঁর কৌতুকে ভরা মুখখানির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকি মেরে বলে ওঠে সে, "যান্, আপনি কেবল রহস্য করছেন আমার সঙ্গে।"

তার চিবুক ধরে নেড়ে দিয়ে খুশি খুশি মুখে বলে ওঠে শের খাঁ, "সে দৃষ্টি আমারও আছে বেগম। আর আফগানরাও এসে পৌঁচচ্ছে। আগে দেখি মামুদ লোদী কি বলেন, তারপর আক্রমণ করব—সুরাজগড়।"

"সুরাজগড় !" চম্‌কে ওঠে মালিকা। বলে, "কিন্তু বাংলার সুলতান মামুদ শা খুব শক্তিশালী শুনেছি ?"

"শের খাঁও শক্তি নিয়েই যাবে।" উত্তর দেয় শের খাঁ। তারপরই ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যায় মালিকার মহল থেকে। মেহ্‌মান্ মামুদ লোদীর থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রথম আক্রমণে সোজাট হাতে এসে যেতে আশার প্রদীপটা সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। না, বাজে কথা বলেননি ব্রহ্মচারী। শক্তির অপচয়ও করেননি। তাঁরই উপদেশ মত যে দ্বিমুখী আক্রমণের ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল, তার সামনে পুরো একটি দিনও দাঁড়াতে পারেনি সোজাটের সৈন্যবাহিনী। ফলে রাজ্যের সঙ্গে

প্রচুর ধনসম্পদও এসেছে হাতে। সৈন্যবাহিনীতে নতুন লোকও নেওয়া হয়েছে অনেক। বিরাট ময়দানের বুকে সমবেত হ'য়েছে তারা। দলে দলে বিভক্ত। চলেছে শিক্ষাদান। পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন মলদেও রাঠোর। সঙ্গে ব্রহ্মচারী। তীক্ষ্মদৃষ্টি তাঁর প্রতিটি শিক্ষানবীশের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে আসছে।

"সৈন্য সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে মহারাজ।" অন্যদিকে তাকিয়েই মহারাজকে বলেন ব্রহ্মচারী।

"আরও ?" একটু ইতস্ততঃ করে বলেন মলদেও।

একদিকে আফগান আর একদিকে মোগল। ঐ দুই শক্তি যদি একযোগে আক্রমণ করে তাহ'লে তার ঢেউএই ভেসে যাবে আপনার এই ক্ষুদ্র বল।"

"তাহলে এবার নাগৌর অধিকার করতে হয়।"

"কেবলমাত্র নাগৌর নিলেই হবে না। একদিকে চাই যেমন শক্তিবৃদ্ধি অপরদিকে তেমনি ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে দিল্লীর দিকে।"

ব্রহ্মচারীর মত অত সহজে অতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি দিতে পারেন না মলদেও। রাণা সংগ্রাম সিংহের মত দুর্দান্ত সিংহ যেখানে আহত হ'য়ে সরে গিয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, সেখানে সেই মোগলবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে দিল্লী জয় করবার স্বপ্নখানি দেখতেও সাহস হয় না তাঁর। সন্দেহ ভরা গলায় বলে ওঠেন, "পারবত' ?"

"পারতেই হবে।" জোর দিয়ে বলে ওঠেন ব্রহ্মচারী। "যে ভুল ক'রে গিয়েছিল জয়চাঁদ, হয় তার সংশোধন করব, নয়ত' বুকের রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে যাব তার।"

বলতে বলতে হঠাৎ এগিয়ে যান ব্রহ্মচারী। শিক্ষানবীশদের ভেতরে একজনের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। তীক্ষ্মদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন নবনিযুক্ত এই সৈন্যটির দিকে। সেই দৃষ্টির সামনে

কেমন কুঁকড়ে যায় সৈন্যটি। মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

"কি নাম তোর?" হঠাৎ রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করেন ব্রহ্মচারী।

"হার—" থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি নামটি বলতে গিয়েই থেমে যায় সৈন্যটি। শুধ্‌রে নিয়ে বলে, "হরলাল।"

"বাড়ী কোথায়? বাবার নাম কি?"

উত্তর নেই। ব্রহ্মচারীর দৃষ্টির প্রখরতায় রসশূন্য মাটির মত ফ্যাকাসে দেখায় লোকটির মুখ। আর এক পা এগিয়ে যান ব্রহ্মচারী। খপ্‌ ক'রে চেপে ধরতে যান তার হাত। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একলাফে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে পড়ে লোকটি। তারপরই প্রাণভয়ে পলায়ণপর শশকের মত তীব্র গতিতে ছুটতে থাকে। ঠিক এই রকমই একটা কিছু আন্দাজ করেছিলেন ব্রহ্মচারী। ছুটে গিয়ে নিজের ঘোড়াটির পিঠের ওপরে লাফিয়ে উঠে বসেন। শিক্ষিত জানোয়ার, সওয়ারের ইসারা পেয়ে তীর বেগে ছুটতে থাকে।

নির্বাক, নিশ্চল দাঁড়িয়ে ছিলেন মলদেও রাঠোর। তাঁরই রাজত্বের ভেতরে যে এরকম একটি গুরুতর ঘটনা ঘটতে পারে এ যেন তাঁর স্বপেরও অগোচর ছিল। ওদিকে ততক্ষণে আবার চালু হয়েছে শিক্ষাদানের কাজ। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চীৎকার ক'রে ওঠেন তিনি—"থামাও।"

মহারাজের সেই বিকট চীৎকারে থতমত খেয়ে থেমে যায় সকলে। ফিরে তাকায় তাঁর দিকে। এবারে মলদেও এগিয়ে যান। হুকুম করেন, "এদের প্রত্যেককে মহাদেওজীর মন্দিরে নিয়ে যাও। প্রত্যেকে এরা মন্দির স্পর্শ করে শপথ করবে, দেশের জন্যে প্রাণ দেবে তবু যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করবে না, রাজপুতনার মাটিতে অহিন্দুর আধিপত্য কোনদিনই মেনে নেবে না। এই শপথ যারা করবে তারাই সৈন্যদলে যোগ দিতে পারবে।"

সেদিনকার মত শিক্ষাদানের কাজ শেষ। দলকে দল এগিয়ে

যেতে থাকে মহাদেওজীর মন্দিরের দিকে। মলদেও আর তাঁর পার্শ্বচর কয়েকজন দাঁড়িয়ে সেইদৃশ্য দেখতে থাকেন। এমন সময় পলায়মান লোকটির হাত চেপে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে দাঁড়ান ব্রহ্মচারী। প্রভুভক্ত অশ্বটি আসছে তাঁর পিছন পিছন।

"লোকটির নাম হারুণ। এসেছিল এখানকার সৈন্যদলে যোগ দিয়ে সমস্ত খবরাখবর নিতে।" বলেন ব্রহ্মচারী।

"কেন?" জিজ্ঞাসা করেন মলদেও।

"কেন এসেছিস্ বল?" কড়া স্বরে হুকুম করেন ব্রহ্মচারী।

কিন্তু কোনও উত্তর দেয় না লোকটি। মাথা নীচু করে গুম্ মেরে দাঁড়িয়ে থাকে।

"এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কোনও লাভ হবে না।" ধমক্ দিয়ে ওঠেন ব্রহ্মচারী, "উত্তর আমরা ঠিকই বের করে নেব।"

এবারে মুখ তুলে একবার তাকায় লোকটি। তারপরই আবার মাথা নীচু করে। কিন্তু শব্দ করে না একটিও। লোকটির হাত ছেড়ে এবারে ঘাড় চেপে ধরেন ব্রহ্মচারী, "তোকে বলতেই হবে কেন এসেছিস্ এখানে? কে পাঠিয়েছে তোকে?"

"কেউ পাঠায়নি। আমি নিজের ইচ্ছাতেই এসেছি।" এতক্ষণে মুখ খোলে লোকটি।

"কেন?"

আবার সেই নিরুত্তরতা।

"খবর পাঠাবি বলে? বল্।"

"হ্যাঁ।"

"ওকে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখ," পার্শ্বচরদের একজনকে হুকুম করেন মলদেও, "তারপর ওর বিচার হবে।"

লোকটিকে নিয়ে চলে যায় পার্শ্বচরটি। চলমান দেহদুটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ব্রহ্মচারী। তারপর মহারাজের দিকে

ফিরে বলেন, "এই স্ব-জাতা প্রীতির জোরেই ওরা বিদেশ থেকে এসে আজ হিন্দুস্থানের তিনভাগ দখল করে বসেছে।"

তারপরই চিন্তার অতলে তলিয়ে যান তিনি। মুখ দেখে মনে হয় কিসের যেন হিসাব করছেন মনে মনে। অপেক্ষায় থাকেন মলদেও। এই মানুষটিকে তিনি বুঝে নিয়েছেন। বর্তমান ছেড়ে ভবিষ্যতেরও কয়টি পা পর্যন্ত হিসাব করবার ক্ষমতা রাখেন। যে গুণটি হিন্দুস্থানের রাজন্যবর্গের ভেতরে কারও নেই। যদি তা থাকত, তাহ'লে আলেকজান্দারকে এই হিন্দুস্থানের চৌকাঠে প্রণাম জানিয়ে ফিরে যেতে হ'ত নিজের দেশে। পর্তুগীজ নামে যে বোম্বেটেগুলো এসে নির্বিবাদে লুঠতরাজ চালিয়ে যাচ্ছে গ্রামের পর গ্রামে, তারাও কবে স্থান লাভ করত এই ভারতবর্ষের নদীর তলায়। কিন্তু সে হিসাব আছে এই অকৃতদার মানুষটির কাছে। তাই মনে মনে এঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন মলদেও। তাঁর ঐ চিন্তিত ভাবটি দেখে এর পরের কোন অধ্যায়ের সূচনা বলেই মনে হয় মহারাজার। কিন্তু কোন দিকে?

"আজমীড়।" চিন্তায় ছেদ টেনে দিয়ে বলে ওঠেন ব্রহ্মচারী, "আর বিশেষ দেরী করা বোধহয় উচিত হবে না মহারাজ। এবারে দ্রুতই এগিয়ে যেতে হবে আপনাকে। আজমীড় তার প্রথম ধাপ।"

"তারপর?"

"তারপর মারথা। এই দুটি রাজ্য আপনার হাতে এলে যে শক্তি লাভ করবেন তা জয় করা বড় সহজ হবে না। এরপরই আপনাকে ছুটতে হবে উত্তর দিকে। জয়তারণ, বিলাড়া, ভদ্রার্জ্জুন, মাল্লানী আর শিউয়ানা জয় করে একবারে গিয়ে থামবেন ঝাঝরে।"

"ঝাঝর? সেত' দিল্লীর কাছে!"

"হ্যাঁ, দিল্লীর কাছে। সেখানে গিয়ে একবার বুক ভরে দম নেওয়া শুধু, তারপরই ক্ষুধিত সিংহের মতই আপনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন

ঐ বাদশাহী তক্ত লক্ষ্য করে।"

বলতে বলতে ভাবাবেগে ছ'ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে ব্রহ্মচারীর ছ'গাল বেয়ে। চোখছটি আসে বুজে। কল্পনার দৃষ্টিতে তিনি যেন দেখতে থাকেন সেই দৃশ্যটি, যে দৃশ্যে রাজপুতরাজ মলদেও রাঠোর বসে আছেন দিল্লীর তক্তে।

"ঠিক আছে। এবার তাহ'লে আজমীরই হবে আমাদের লক্ষ্য।" হুকুম জানান যোধপুররাজ।

আলি আজমের মুরুব্বীয়ানায় যেদিন বাদশাহ্ হুমায়ুনের দেহরক্ষীর কাজ পেয়েছিল দবীর সেদিন কেঁদে ভাসিয়েছিল আমিনা। এক বিরাট ঝড়ের ভিতর দিয়ে ওলট পালট খেতে খেতে যদি বা নৌকোটি এসে পৌঁছুল তীরের কাছাকাছি তো সেখানেও এমন ঘূর্ণিপাক? জীবনের পরম পাওয়ার আস্বাদ নেবারও সুযোগ মিলবে না তার? বাদশাহের দেহরক্ষী! অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে ছুটে ছুটেই বেড়াতে হবে সারাটা জীবন। কিন্তু এ জীবনতো চায়নি আমিনা। খুব বেশীও কিছু চায় নি। একটি কাজ, যে কাজ দেবে ক্ষুধার অন্ন। আর কর্মক্লান্ত দেহে যখন ঘরে ফিরে আসবে মানুষটি তখন আপন হাতের সেবায় ঝরিয়ে দেবে তার সেই ক্লমভাব। এই সামান্য দোয়াটুকুও কি আল্লার হ'ল না? যা হ'ল, তাতে শান্তি কোথায়? এ ক্ষুব্ধ ভাব আর তার সহজে যায় না। থেকে থেকেই বলে ওঠে। কখন অস্ফুট, কখনও বা প্রস্ফুট। সেদিনও তেমনি বলেছিল কথাটি। কানে গিয়েছিল দবীরের। উত্তরে বলেছিল সে, "শান্তি নেই আমিনা। যুদ্ধের ঘোড়া হয়ে জন্মেছি, যুদ্ধ করতে করতেই শেষ হ'য়ে যাব।"

"যত অলক্ষুণে কথা!" ঝাঁকিয়ে উঠেছিল আমিনা, "আমি তো আর সে কথা বলিনি। আমি বলছি যে বাদশাহ্ যদি বরাবর দিল্লীতে থাকতেন তাহ'লে তোমাকেও কাছে পাওয়া যেত সব সময়।"

"বাদশাহের দেহরক্ষীর কাজে ইস্তফা দিয়ে?" রহস্য করেছিল দবীর।

"আহা, তাই যেন বলেছি!" দু'চোখে কৃত্রিম শাসন আমিনার। যে শাসন ভয় দেখায় না, উপরন্তু আরও কাছে টানে। টানে দবীরকেও। আমিনাকে সাবধান হওয়ার সুযোগ না দিয়ে আচম্‌কা দু'হাতে বেঁধে ফেলে সে।

"তোমার কোন সময় অসময় নেই না?" বাহুমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে আমিনা, "ছাড়! সংসারে অনেক কাজ রয়েছে যে।"

"আমিও রয়েছি। তোমার কৃপাপ্রার্থী।"

"তুমি এমন কর," বলে মুখখানি তুলে ধরে আমিনা।

কিন্তু পাওনা গণ্ডা বুঝে নেবার আর অবসর মেলে না দবীরের। ছুটে ঘবে ঢুকতে গিয়েই জিব কেটে পালিয়ে যায় বাঁদী। ছিট্‌কে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ায় আমিনা। "অসভ্য!" বলে দবীরের দিকে একটি বিশেষণ নিক্ষেপ করেই বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

যেমন যায় তিমনি ফিরেও আসে একটু পরেই। কিন্তু পূর্বের সে আমিনা আর নেই। গম্ভীর মুখভাব। ঘরে ঢুকেই বলে ওঠে, "দরবারে ডাক পড়েছে।"

আমিনার অসন্তুষ্টির ওপরে নোকরী নির্ভর করে না। অতএব দরবার অভিমুখে ছুটতে হয় দবীরকে।

এ ছোটা যে শুধু দরবার পর্যন্ত নয়, গড়িয়ে চলবে আরও বহুদূর, তা তখন বুঝতে পারেনি দবীর। বুঝতে পারল যখন তখন কিছুক্ষণের জন্যে মুখ দিয়ে কথা সরেনি তার। পিছনে পড়ে থাকবে অসুস্থ আম্মাজান আর আব্বাস খাঁ। আর তাদের দেখাশোনার ভার

থাকবে দুইটি স্ত্রীলোক, আসরাফন বিবি ও আমিনার ওপরে। সক্ষম পুরুষ বলতে কেউ থাকবে না বাড়ীতে। একমাত্র ভরসা আলি আজম। কিন্তু উপায় কি? নসীবের খুঁটি যেখানে গাড়া সেইখানেই চরে খেতে হবে তাকে। অতএব প্রথম ধাক্কাতেই যেতে হয় বুন্দেলখণ্ড। এব পাষাণ দুর্গ কালিঞ্জর াাকি দখল করতেই হবে বাদশাহ্‌কে।

কিন্তু কালিঞ্জর জয় করা আর শেষ পর্যন্ত হ'য়ে ওঠে না হুমায়ুনেব। খবর আসে মামুদ লোদীর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পাবেনি শের খাঁ। আফগান প্রধানেরা, মামুদ লোদী ও শেরখাঁ, এই ত্রিশক্তি মিলিত হয়েছে মোগল বাদশাহের সঙ্গে পাঞ্জা কষবার জন্যে। আর তারই প্রথম ধাপ হিসাবে জয় করে চলেছে বারাণসী, জৌনপুর, লক্ষ্ণৌ। খবর শুনে চঞ্চল হ'য়ে উঠে হুমায়ুন। এইভাবে যদি এগিয়ে চলতে থাকে ওরা, তাহলে আগ্রার পতন অনিবার্য। ফলে দিল্লী প্রবেশের সবকয়টি পথই রোধ করে দাঁড়াবার সুযোগ পাবে। অতএব কালিঞ্জর জয় স্থগিত রেখে মোগলবাহিনীকে কুচ্‌ করবার হুকুম দিতে হয়।

দৌরুয়ার সে যুদ্ধ আর যার মনেই রেখাপাত করুক, দবীর প্রশংসা করতে পারেনি তার শেষ মীমাংসাকে। মামুদ লোদী পলাতক, আফগান প্রধানদেব কেউ পালিয়েছে, কেউবা পেয়েছে তার প্রাপ্য শাস্তি। কিন্তু শের খাঁএর বেলাতেই বাদশাহের বিচার হ'য়েছে অন্যরকম। হয়ত' আফগান যুদ্ধে বাদশাহ্‌ বাবরের হ'য়ে যে বীরত্ব দেখিয়েছিল সে, সেই কথাই মনে করে কি অন্য কোন প্রকার দুর্বলতাই থাক, হুমায়ুনের বিচারে প্রকৃত পক্ষে কোন শাস্তিই

পায়নি শের খাঁ। দেখে মনে হয়েছিল দবীরের, এত পরিশ্রম করে শুধু আগাছাই মারা হল; আসল যে বিষবৃক্ষটি, তাকে বাঁচিয়ে রাখা হ'ল জাত ফলের গাছ হিসাবে। সুযোগ বুঝে সে কথা বলেছিলও সে, "শের খাঁর দৃষ্টি দিল্লীর মসনদের দিকে, জাঁহাপনা। মাথা তুলবার আগেই সে মাথা দাবিয়ে দেওয়া ভাল।"

"থাম বেওকুফ। সামান্য একটু শক্তি দেখলেই যদি ভয়ে কেঁপে উঠতে হয়, তাহলে আর—" বলতে বলতে কি ভেবে থেমে গিয়েছিল হুমায়ুন। দবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন একটা চিন্তা করতে করতে জিজ্ঞাসা করেছিল, "চুণারগড় এখন শের খাঁর হাতে, না?"

"জী।"

"কোন গড় শেরের হাতে রাখতে দেওয়া ঠিক হবে না।"

বাদশাহের কথা শুনে বুকের ভেতরটা বুঝি লাফিয়ে উঠেছিল দবীরের। কতদিন, কতদিন পরে আবার চুণারের মাটিতে পা দেবে সে। ঐখানেই ঘুমিয়ে আছে নকীব। তার বড় আদরের ছোট ভাই। আর ঐ দুর্গের ভেতরে আছে এক বিষধরী। মোগল শক্তিকে উচ্ছেদ করবার জন্যেই যেন সুদূর মর্দিন সহর থেকে ছুটে এসেছে সে।

"চুণার দখল করলে ভালই হবে জাঁহাপনা," বাদশাহের মনে লোভের ইন্ধন জোগাতে চেষ্টা করে দবীর, "ঐ গড়ের ভেতরে ইব্রাহিম লোদীর গচ্ছিত প্রচুর ধনবস্তু আছে।"

"ঠিক জানিস?" তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বক্তার মুখের দিকে তাকায় হুমায়ুন।

"আমার আব্বাজান ছিলেন এই চুণারের জায়গীরদার আর ঐ সব ধনবস্তুর জিম্মাদার।"

"ঠিক আছে। চল চুণার।" বাদশাহী হুকুম জানায় হুমায়ুন।

সেই গঙ্গা। গড়ের পশ্চিম দিক দিয়ে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে। বারাণসীর বিশ্বনাথের পায়ের নীচে দিয়ে এসে ক্রমে পূর্বমুখী হ'য়েছে তার আস্পদ সাগরে মিলিয়ে যেতে। গড়ের পূর্বেও সেই নদী। দেহাতী লোকে যার নাম রেখেছে 'সোনে'। গঙ্গা থেকে উৎপত্তি আবার গঙ্গায় বিলীন। শুধু গ্রামের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে জল সেচএর কাজটুকু করে যায়। সোনা ফলায় ক্ষেতে ক্ষেতে। তাই তার নাম সোনে। আর করেছে চুণার গড়ের তিন দিক ঘিরে এক প্রাকৃতিক পরিখার সৃষ্টি। দক্ষিণে যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি সাঁকো ছিল। যথেষ্ট মজবুত। দশটি হাতীর দেহভার একসঙ্গে নিতে পারে, এমন ভাবেই তৈরী। কিন্তু সেটা আর নেই। ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে শের খাঁএর সিপাহেরা। হুমায়ুনের হুকুমে নতুন সাঁকো তৈরী হয়েছে সেখানে। তাজ খাঁএর সিপাহ্-মহল্লাতেই আশ্রয় নিয়েছে মোগলবাহিনী। স্থান সঙ্কুলান হয়নি তাতে। শিবিরের পর শিবির পড়েছে বাইরে। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হ'য়ে ঘিরে রেখেছে দুর্গটিকে। গঙ্গার বুকেও প্রহরারত সিপাহ্দল। ঘুরে ঘুরে এধার থেকে ওধার দেখে দবীর। চন্‌মনিয়ে ওঠে মনের ভেতরটা। একবার ঐ দুর্গটির ভেতরে ঢোকা যায় না? কিছু নয়, শুধু একটিবার নকীবের কবরটির পাশে গিয়ে যদি বসতে পারত। যে ভাইএর জন্যে দু'ফোটা চোখের জল ফেলবারও অবকাশ মেলেনি তার, সেই ভাইএর কবরের ওপরে এই হতভাগ্য ভাইজানএর ভালবাসার চিহ্ন-স্বরূপ যদি একটি ফুলও রেখে আসতে পারত সে! অদূরেই দুর্গ চুণার। তার ঐ উত্তুঙ্গ দেহটির দিকে তাকিয়ে একটি টানা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দবীর।

"ছোট মালিক!"

চম্‌কে ওঠে দবীর অমন পরিচিত ডাক শুনে। সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ায়। কান্‌হাইয়া! হাজাম কান্‌হাইয়া। বড় ভালবাসত

ওদের দু'ভাইকে। বিশেষ করে নকীবকে। বড় চঞ্চল ছিল সে। স্থির হয়ে দু'দণ্ড বসতে পারত না কোথাও। আর চুল ছাঁটবার কথা উঠলেত' তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ত। অতক্ষণ ধরে একটা মানুষ চুপ করে বসে থাকতে পারে কখনও ? বাস, আরম্ভ হ'য়ে যেত হাজাম আর নকীবের লুকোচুরি খেলা। এই একটা দুর্গের কোথায় গিয়ে সে লুকোত', খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হ'য়ে যেত কান্হাইয়া। শেষে একদিন কিন্তু এই কান্হাইয়াই অবাক ক'রে দিল সকলকে। দুর্গের সকলেত' বটেই এমনকি তাজ খাঁ পর্যন্ত সাশ্চর্যে দেখল, নিশ্চল হয়ে বসে চুল ছাঁটছে নকীব আর থেকে থেকে ধমক্ দিয়ে উঠছে, তারপর ? কান্হাইয়াও তার হাতের কাজের সঙ্গে মুখের বানানো আদি অন্তহীন গল্প শুনিয়ে চলেছে। এই ছোট্ট বালকটিকে বশে আনবার রাস্তার হদিস্ পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল সকলে সেদিন।

সেই কান্হাইয়াকে আজ এতদিন পরে দেখতে পেয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে দবীর। কিছুক্ষণ আর কোন কথাই বলতে পারে না সে। বুকের ভেতরে কান্নার বেগ ঠেলে উঠছে। স্মৃতি হ'য়ে থাকা বুকের আঘাতগুলিতে আবার ব্যথা অনুভব করছে।

"চুণার দখল করতে এসেছেন ছোট মালিক ?" দবীরের পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অন্য কথা পাড়ে কান্হাইয়া।

ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত ক'রে নেয় দবীর। বলে, "হ্যাঁ।"

"কিন্তু পারবেন বলে মনে হয়না।"

"কেন ?"

"এক বরিষের রসদ নিয়ে রেখেছে এ গড়ের ভিত্‌রে। আর ওর ভিত্‌রে আছে শের খাঁর লেড়কা কুতব খাঁ আর মালিকা বেগমের ভাই ইশাক। ওরা দু'জনেই জবরদস্ত্। গড় ছাড়বে বলে মনে হয় না।"

"শের খাঁ কোথায় ?"

"ও কুথায় গা ঢাকা দিয়ে আছে। লেকিন ইখানে নাই। আর মালিকা বেগমভি নাই।"

এতক্ষণে আবার কর্তব্যের সুরটি যেন টিং টিং ক'রে বাজতে থাকে দবীরের মনের ভেতরে। খবরটি বাদশাহ্‌কে দেওয়া দরকার। কান্‌হাইয়ার কাছ থেকে কোন রকমে বিদায় নিয়ে ছুটে চলতে থাকে সে হুমায়ুনের শিবিরের দিকে।

হ'তে পারে দেহরক্ষী। কিন্তু সে শিবিরের ভেতরে নয়, বাইরে। অতএব অপেক্ষায় থাকতে হয় কখন মিলবে বাদশাহের সঙ্গে দুটি কথা বলবার সুযোগ। কিন্তু সে অবসর মুহূর্ত্ত আর সহজে মেলে না। দুর্গ অবরোধ করা হ'য়েছে অর্থাৎ কর্তব্য সমাপ্ত। এখন যতক্ষণ পর্যন্ত না ওধার থেকে সাড়া পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত করবার আর কিছুই নেই। বরঞ্চ এই নিরস নিশ্চেষ্ট জীবনকে যতটুকু রসাপ্লুত করে তোলা যায় ততটুকুই লাভ। সেই রসোপভোগের মাধ্যমেই দিন কাটে হুমায়ুনের। দিনের পর দিন পার হয়ে যায় এই একইভাবে। মনে মনে হিসাব করে দবীর, আজ প্রায় সাতদিন ধরে বাদশাহের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করছে সে কিন্তু খোদ জাঁহাপনার দেহরক্ষী হ'য়েও সে সুযোগটুকু মিলছে না তার। বিরক্তই হয়ে উঠেছিল সে। এমন সময় খবর আসে গুজরাটের বাহাদুর শা গা নাড়া দিয়ে উঠেছে। তার প্রতিটি কার্যকলাপে শত্রুতার লক্ষণ স্পষ্ট। শুধু তাই নয়। মেবারের রাজমাতা, রাণা সঙ্গের পত্নী রাখী পাঠিয়ে দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন হুমায়ুনের। বাহাদুর শা চিতোর অবরোধ করেছে। এবারে আর

বিলাস ঘরে বসে থাকা সম্ভব হয়না হুমায়ুনের পক্ষে। চুণারত' হাতের কাছে, পরে অধিকার করলেও চলবে। কিন্তু গুজরাট গেলে যে অনেক কিছুই যাবে। তাই শিবির তোলবার মুহূর্ত্তে নামমাত্র সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠায় হুমায়ুন যে শের খাঁর পুত্র কুতব খাঁ নিজস্ব পাঁচশত সিপাহ্ নিয়ে মোগলবাহিনীতে যোগ দেবে। তারপরই গুজরাটের দিকে ছুটে চলে। দবীর মনে মনে ভাবে— এ সন্ধি নয়, সর্ত্ত নয়, শের খাঁকে তার নসীব গড়ে তুলবার আর এক পরম সুযোগ দিয়ে গেল বাদশাহ্ হুমায়ুন।

শের খাঁও সুযোগ সন্ধানী। সময়ের অপচয় করে না হুমায়ুন চলে যেতেই দক্ষিণ বিহারের অন্তিম প্রদেশ থেকে ফিরে আসে সাসারামে। সঙ্গে মালিকা ও অন্যান্য বেগমেরা। সাসারামে ফিরেই ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে সে। লক্ষ্য করে মালিকা। বলেও ফেলে, "জনাব তাহ'লে সত্যিই সুরাজগড় আক্রমণ কববেন ?"

প্রশ্নের উত্তরে মালিকার মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির-প্রতিজ্ঞের মত ধীরে ধীরে চাপ দিয়ে দিয়ে বলে শের খাঁ, "আক্রমণ নয় শুধু, অধিকার করব।"

আর সে অধিকার করলও শের খাঁ। সাসারামে বসেই সে কাহিনী শুনেছিল মালিকা। তুচ্ছ আফগান বাহিনীকে ধর্তব্যের ভেতরেই আনেনি মামুদ শা। তাই আপন সৈন্যদল নিয়ে নিজেই শের খাঁকে বাধা দিতে এগিয়ে এসেছিল। বুদ্ধির দাবা খেলায় সেইখানেই বল হারিয়ে গেল তার। সুরাজগড়ের কাছেই এক বনের ভেতরে দেখা গেল আফগান সিপাহ্দের। মামুদ শাও আর কালবিলম্ব না করে স-বাহিনী প্রবেশ করে সেই বনের গভীর

প্রদেশে। কিন্তু কোথায় গেল শের খার সিপাহেরা? খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে তারা ফিরে আসতে থাকে। পথ পায়না। যেদিকেই যায়, দেখে আফগান সিপাহ্। সমস্ত বনটিকে ঘিরে রয়েছে। ক্রমে এগিয়ে আসতে থাকে শের খাঁর সিপাহেরা। আর পিছিয়ে যায় মামুদ শা। কিন্তু পশ্চাদপসরণেরও একটা সীমা আছে। বন যে শেষ হ'য়ে এল! এবারে মরিয়া হ'য়ে ওঠে বাংলার সুলতান। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে আফগান ব্যূহ ভেদ করবার চেষ্টা করে সে। করেও। কিন্তু পরাজয়কে স্বীকার করে নিতেই হয় তাকে। পশ্চাতে পড়ে থাকে তার বিনষ্ট বাহিনী। মামুদ শা পালিয়ে যায় বাংলার রাজধানী গৌড়ের দিকে।

এ জয় শুধুমাত্র শক্তির পরীক্ষা নয়। শের খাঁ যেন তরোয়ালের আঘাত দিয়ে তার নসীবের দরজাটা খুলে দিয়েছিল। প্রত্যাশার অধিক ধনরাশি, বিপুল সংখ্যক হাতী আর কয়েক সহস্র সিপাহ্, শক্তি যেন রূপ ধরে এসে দাঁড়ায় শের খাঁর দরজায়।

শুনে খুশিতে দুলে দুলে উঠেছিল মালিকা। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিল আফগান-নায়ককে তসলিম জানাবার জন্যে।

কিন্তু সেই শুভ মুহূর্তটি যখন এল তখন মুখখানি কেমন আপনিই ভার হ'য়ে উঠেছিল তার। বিজয়ীর হাসির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিছুতেই হাসতে পারেনি সে।

"কি হ'ল? তোমাকে এমন মন-মরা দেখাচ্ছে কেন?" জিজ্ঞাসা করেছিল শের খাঁ।

"আমি আপনার কাছে একটিমাত্র প্রার্থনাই করেছি।"

"দেব, দেব," বেগমের নারাজ হওয়ার কারণটি জানতে পেরে আরও উচ্ছল হ'য়ে উঠেছিল শের, "তোমার ঐ দুষমণকে ঠিক নিয়ে এসে ফেলব তোমার পায়ের কাছে। কেবল কয়েকটি দিন সময় দাও। রোটাস্‌গড় জয় করতেই হবে আমাকে।"

"সেটা আবার কোথায় ?"

"শোন দরিয়ার পারে। পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা। হিন্দুরা বলে যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্ব এই গড় তৈরী করিয়েছিলেন। এ এমন গড় যে এক বৎসর অবরোধ করে রেখেও কেউ জয় করতে পারবে না।"

"মালিক কে ?"

"একজন হিন্দু রাজা। তাছাড়া আর একটা কাজেও হাত দিয়েছি।"

"আবার কি ?"

"সমস্ত বিহার যখন হাতে এল তখন এখান থেকে বাঙ্গলাদেশ পর্যন্ত সোজা সড়ক তৈরী করতে বলে দিয়েছি।"

"তাহ'লে আমার আর্জি আর্জি হ'য়েই থাকবে, মঞ্জুর আর হবে না।" অভিমানে মুখভার করে উঠে দাঁড়াতে যায় মালিকা। পারে না। একখানা হাত বাঁধা পড়েছে শের খাঁর হাতে। মুখ ঘুরিয়ে তাকায় সে। দেখে ইতিমধ্যেই কামনা ঘনিয়ে এসেছে যুদ্ধোন্মাদ মানুষটির চোখে।

"আমি কিন্তু রোটাসগড়ে আর সব বেগমদেব মাঝে গিয়ে বাস করতে পারব না।" আব্দার তুলে কাছে সরে আসে মালিকা তার যৌবনেভরা দেহকাণ্ডটিকে দুলিয়ে দিয়ে।

"কোথায় থাকবে ? চুণারে ?"

"হ্যাঁ। আপনি অনুমতি দিন। সেখানেই হয় আপনার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। সেখানে বসেই দেখেছি আপনার বড় হওয়ার খোয়াব। সে খোয়াব সত্য হতেও চলেছে। এখন সেখান থেকে সরে এলে সে খোয়াব যদি ভেঙে যায় ?"

যেন ভয়ের আশঙ্কাতেই দু'হাতে শের খাঁকে জড়িয়ে ধরে মালিকা। তার নধর দেহের উত্তাপ উত্তপ্ত করে তোলে পুরুষ

দেহকে।

"বেশ, তাই থেকো।"

পুরুষের অনুমতি দিয়ে পুরুষ ক্রয় করে নারীত্বকে।

চুণারগড়ে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছে মালিকা, কিন্তু যাওয়া আর হয় না। রাজকার্যের নানারকম ঝামেলায় আটকে পড়ে কেবলই দিন পিছিয়ে দিচ্ছে শের খাঁ। দেখে শুনে মনে মনে হাসে মালিকা। তার নারী-মনটি দিয়ে এর অন্তর্নিহিত কারণটিও বুঝে নেয়। অন্যান্য বেগমেরা আজ যৌবনের রোশনাই হারিয়ে বার্দ্ধক্যের কোঠায় পা দিয়েছে। অপরের সেবা করা দূরে থাক্, তাদের নিজেদেরই আজ সেবার প্রয়োজন। তাই অবসরের মুহূর্ত্ত যখন আসে তখন ও মহলে আর যেতে মন সরেনা শের খাঁর। এসে-উপস্থিত হয় মালিকার ঘরে। পরম আয়েশে গা এলিয়ে দিয়ে কয়েকটি মুহূর্ত্তের জন্যে যেন ভুলে যেতে চায় তার সমস্ত অহঙ্কারকে। শিশু হ'য়ে সেবা খেতে চায়। মালিকাও বোঝে তা। তাই এই মানুষটি ঘরে এলে সে সরিয়ে দেয় বাঁদীকে। আপন হাতের পরিচর্যা দিয়ে তাকে করে তোলে বিগতক্লম। আর এই সর্বকনিষ্ঠা বেগমটির মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে শের খাঁ। পরিচয় দেবার মত বিশেষ কিছুই নেই, তবুও আপন শক্তিতে সে আজ তার মনের অনেকখানি জুড়ে বসেছে। বাঁদীর সেবা, বিবির কোমল সাহচর্য, মন্ত্রীর বুদ্ধি আর সিপাহ্‌শালারের সাহস—একটি আওরতের ভেতরে এতগুলি গুণের সমাবেশ বড় একটা দেখা যায় না। তার নসীবের গুণেই এসে জুটেছে। সঙ্গে এনেছে নসীবের দরজাটি খুলবার সোনার চাবি। তাই এই বেগমটির প্রতি রয়েছে তার স্নেহপূর্ণ দুর্বলতা। দু'হাত

পেতে যখন কোন অনুমতি চায়, না বলতে পারে না শের খাঁ। আর চায়ও না বিশেষ কিছু। আজ পর্যন্ত দুটি মাত্র অনুরোধই জানিয়েছে সে। প্রথম, দবীর খানকে ওর সামনে এনে দেওয়া; দ্বিতীয়, চুণারগড়ে থাকবার অনুমতি। প্রথম অনুরোধটি রাখবার সুযোগ এখনও আসেনি। দ্বিতীয় অনুরোধের অনুমতি সে দিয়েছে বটে কিন্তু ব্যস্ততার অজুহাত দিয়ে নিজেই কালহরণ করে চলেছে। অবশ্য সম্পূর্ণটাই যে ইচ্ছা করে, তাও নয়। সত্যিই ব্যস্ত শের খাঁ। সুরাজগড়ে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া গিয়েছে তাই থেকেই ধারণা হয়েছে তার যে মামুদ শাএর রাজধানী গৌড় অধিকার করলে নিশ্চয়ই এর বহুগুণ পাওয়া যাবে। অতএব গৌড় অধিকার করতেই হবে। আর তারই প্রস্তুতি হিসাবে মুঙ্গের থেকে গৌড়ের পথে জয়ের নিশান গাড়তে গাড়তে এগিয়ে চলেছে তার আফগান বাহিনী। আকসারী তাদের নেতা। এই নেতা নির্বাচন সম্বন্ধেও একবার মালিকার মতটি জিজ্ঞাসা করেছিল শের খাঁ। বলেছিল, "বিরাট একটা কিছু নয় যখন তখন মীর আহ্‌মদকেই একাজের ভারটি দেওয়া যাক্, কি বল?"

"না।" বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলে উঠেছিল মালিকা, "ছোট কি বড়, কোন সংগ্রামেই আপনার হারলে চলবেনা। আপনার ভাই সুদক্ষ কিন্তু আমার ভাইজান এখনও সিপাহ্ পরিচালনায় দক্ষ হ'য়ে ওঠেনি।"

এরপরেও অনেক যুক্তিতর্ক থাকে। কিন্তু সে জন্যে কথাটি বলেনি শের খাঁ। বলেছিল এই বেগমের ইচ্ছাটি জানতে। এখন জানা নয় শুধু, খুশিই হয়েছে সে। মালিকা সাত্যিই তাকে অপরাজেয় হিসাবেই দেখতে চায়।

অন্যান্য দিনের মত সেদিনও মালিকার কক্ষে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল শের খাঁ, এমন সময় খবর আসে চূড়ামণ নামে এক ব্রাহ্মণ দেখা

করতে এসেছে। খবরটি শোনবার সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্লভাবে বলে ওঠে শের, "খোদা মেহেরবান্ !"

কথাটি কানে যেতে চম্‌কে শেরের মুখের দিকে তাকায় মালিকা, "কি রকম হ'ল ?"

"যা, আসছি," বলে বাঁদীটিকে সরিয়ে দিয়ে বেগমের কথার জবাব দেয় শের, "হ'ল ভালই। রোটাস্‌গড়ের মন্ত্রীকে গোপন আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। সে এসেছে দেখা করতে।"

"তাহ'লে রোটাসগড়ও জয় হল ?" খুশিখুশি মুখে বলে মালিকা।

"বেগম বড্ড এগিয়ে আশা কর।"

"কেননা থেমে থাকা কি পিছিয়ে যাওয়ার কথা আমি চিন্তা করতে পারিনা। আমার জীবনে কেবলমাত্র একটাই খোয়াব আছে। সেটি হচ্ছে, এই হিন্দুস্থানের একজনই মাত্র থাকবে মালিক। আর সে মালিক হচ্ছেন আপনি।"

আশ্চর্য ! নেকার প্রথম রাতে যে কথা বলেছিল এই আওরৎটি, আজও সেই একই কথা বলছে ! সেদিনকার সেই বাদশাহী তক্তে বসবার কথা শুনে মনে মনে হেসেছিল শের খাঁ। ভেবেছিল—লোভের ইন্ধন জোগাচ্ছে। যে লোভ সমূলে উৎপাটিত করে ফেলতে পারে তাকে। তাই অতি ধীরে ধীরে, গোপনে গোপনে সিপাহ্‌শক্তি বাড়াতে হ'য়েছে তাকে। এখন আর সে ভয় নেই। শক্তির পাল্লায় হয়ত' তাকে আর পিছিয়ে যেতে হবে না। তবুও বাদশাহ্ হওয়ার খোয়াব এখনও তার মনের গোপন কুঠুরীতেই ধরা আছে। ব্যক্ত করে ব্যঙ্গের কারণ হতে চায় না সে। কিন্তু মালিকা অত হিসাব বোঝেনা। মনের দাবীর কথা স্পষ্ট দরাজ গলাতেই বলে দেয়। কথাটা শুনে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শের খাঁ। হাত বাড়িয়ে এই প্রেরণাদাত্রীটির হাতখানি ধরে কাছে টেনে নিয়ে আসে। একটি

সপ্রেম সশব্দ চুম্বন বখ্‌সিস দিয়ে বলে, "আমারও একটি খোয়াব আছে।"

"সেটা কি জনাব ?"

জনাবের কাঁধের ওপরেই মাথাখানি রেখে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করে মালিকা।

"তক্তে যদি কোনদিন সত্যিই বসতে পারি, তোমাকে পাশে নিয়ে একদিন দরবারে বসব।" বলেই ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে শের খাঁ। বলে, "চলি। মন্ত্রী চূড়ামণ নানান্‌ কাজের মানুষ। ওকে আটকে রাখা উচিত হবেনা।"

বেরিয়ে যায় শের খাঁ। শূন্য ঘরের মাঝখানে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে মালিকা। মাথার ভেতরটা কেমন ফাঁকা বলে মনে হচ্ছে। উঠতে চেয়েছিল সে। অনেক ওপরে। যেখান থেকে দবীরকে সানুদেশ থেকে দেখা পর্বত-নিম্নের মানুষের মতই অতি ক্ষুদ্র বলে মনে হবে। যদি সম্ভব হয়, তাকে নিয়ে এসে দেবে এক ক্ষুদ্র কারকুন্‌ কি মুন্সীর কাজ। অভাব যার হবে নিত্যসঙ্গী। দেখবে সে তাকিয়ে তাকিয়ে যে অপমানের হাজার কুর্ণিশ জানানো আওরৎটি আজ হাজার সিঁড়ি ওপরে উঠে এসেছে। যেখানে ওঠা কোনদিনই সম্ভব হবে না তার পক্ষে। চিন্তা করতে করতে অন্যমনস্ক-ভাবে কখন তার পহ্‌রাণের আস্তিনটি গুটিয়ে ফেলেছে সে। খেয়াল হ'তেই মুখটা নামিয়ে নিয়ে তাকায় তার হাতের দিকে। ক্ষত নেই, আছে তার রেখে যাওয়া চিহ্ন। একটি মৃত আগ্নেয়গিরির মুখ। উদ্‌গার নেই বটে কিন্তু গলিত লাভায় তার উদরদেশ পূর্ণ। নিজের অন্তর দিয়েই তা বুঝতে পারে মালিকা। খোদা একবার মিলিয়ে দেয়না মানুষটিকে! ভাবতে ভাবতে গিয়ে শয্যার ওপরে বসে পড়ে মালিকা। ক্রমে শুয়ে পড়ে। গির্দার ওপরে দুটি হাত। তার ওপরে চিবুকটি রেখে একদৃষ্টে

চেয়ে থাকে বাইরের দিকে।

কতক্ষণ, খেয়াল নেই। এমন সময়ে শেরখাঁকে আবার এইদিকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসে সে। কি এমন ঘটনা ঘটল যা এই মানুষটিকে আবার বেগম মহলের দিকে আসতে বাধ্য করেছে? দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় মালিকা। তাকিয়ে থাকে ক্রমাগ্রসরমান দেহটির দিকে। না, অন্য কোথাও নয়, তারই কাছে আসছে। একটু যেন চিন্তিত মনে হয়। বোধহয় বিশেষ কোনও সমস্যার উদ্ভব হ'য়েছে। তাই তার কাছে ছুটে আসছে? মনে মনে হাসে মালিকা। সমস্যার সমাধান করবে এমন কোন ক্ষমতা আছে তার? আবার অহঙ্কারে বুকখানি ফুলেও ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। উন্নত-শির ঐ মানুষটির মনে সে তাহ'লে নিজের জন্যে একটি পৃথক আসন সৃষ্টি করে নিতে পেরেছে?

"আসুন জনাব।"

শের খাঁকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে আহ্বান জানিয়ে ক'পা পিছনে সরে গিয়ে দাঁড়ায় মালিকা। তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে শের খাঁ। তারপরই আবার তলিয়ে যায় চিন্তার অতলে। মাথা নীচু করে ভাবতে ভাবতেই ঘরের ভেতরে গিয়ে শয্যার ওপরে বসে পড়ে।

"কি এত ভাবছেন জনাব?"

পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে মালিকা।

"হুঁ?" বলে আবার একবার মুখ তুলে তাকায় শের খাঁ। মালিকার মুখের ওপরে স্থির দৃষ্টি রেখে বলে, "ভাবছি উচিত হবে, কি হবে না।"

"কি উচিত হবেনা? চূড়ামণকে ক্রয় করা?"

প্রশ্নের ধাক্কায় মুহূর্তের জন্যে মুখখানি হাঁ হ'য়ে যায় শেরখাঁর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুশির ঔজ্জ্বল্যে চিক্ চিক্ করে ওঠে তার চোখদুটি।

আর তারপরই বিরাট শব্দ ক'রে হেসে ওঠে। হাসির ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে তার দেহকাণ্ড। একটু ভয়ই পেয়ে যায় মালিকা। তাড়াতড়ি তার একখানি হাত চেপে ধরে ঝাঁকি দেয়, "জনাব, বিষম খেয়ে যাবেন যে ?"

শব্দ থামে। কিন্তু তার প্রলেপটি লেগেই থাকে শের খাঁর মুখাবয়বে।

"হিন্দুরা আওরৎকে বলে শক্তির আধার। আজ আমি সে কথা মেনে নিলাম।"

হাসি হাসি মুখে বলে শের খাঁ। কথাটি ঠিক বুঝতে পারেনা মালিকা। জিজ্ঞাসা করে, "কেন ?"

"শক্তি শুধু দেহেই হয় না, মনেও হয়। আমার মনে হয় মানসিক শক্তিই দেহকে দিয়ে কাজ করায়।" বলেই দু'হাতে মালিকার গলাটি জড়িয়ে ধরে শের খাঁ, "তুমি আমার সেই মানসিক শক্তি। আমার চিন্তার উত্তর।"

"বলেন কি ? অহঙ্কারে যে আমার মাটিতে পা পড়বে না !"

"তোমার সেই ছেলেটিকে এনে দেব। তার পিঠে পা রেখো, চাওত' তাকে তোমার ক্রীতদাসও করে দিতে পারি।"

"আচ্ছা, সে হবেখন।" প্রসঙ্গ বদলায় মালিকা, "চূড়ামণের সঙ্গে কি আলাপ হ'ল, বললেন না ?"

"আলাপ হ'ল। কিন্তু পাকা কথা হয়নি এখনও।"

"বুঝেছি। দু'জনেই বুঝে পাচ্ছেন না রোটাসগড়ের দাম কত হবে।"

"ঠিক তাই।" বেগমের কথায় উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে শের খাঁ। বলে, "দুর্গের মন্ত্রীও হিসাব করে উঠতে পারছে না এতবড় বিশ্বাস-ঘাতকতার কি দাম সে নেবে।"

"তার পূর্বে আপনাকেই চিন্তা করতে হবে," বলে মালিকা।

"কি ? রোটাসগড় নেওয়া প্রয়োজন কি না ?"

"জনাব পূবে মামুদ শার গায়ে আঘাত করেছেন, আবার উত্তরের বাদশাহের এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠেছেন—"

"অতএব একটি গড়ের মত গড় হাতে থাকা প্রয়োজন," হাসতে হাসতে বলে শের খাঁ, "নইলে আবার যদি চুণাড়গড় অবরোধ হয় কখনও তাহ'লে বেগমকেও এই খাঁ সাহেবের সঙ্গে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে।"

"বলেছি কি কখনও যে আপনার সঙ্গে সেই চারমাস ধরে পালিয়ে বেড়াতে কষ্ট হয়েছিল আমার ?" অভিমানে স্বরটা বোঁজা বোঁজা শোনায় মালিকার।

রহস্যের হাসিটা আর একটু স্পষ্ট হয় শের খাঁর। বলে, "তাহ'লে চূড়ামণকে আর একবার আমন্ত্রণ জানাতে হয়! প্রযোজনের দাম একটু বেশী হবে বৈকি।" বলতে বলতেই হঠাৎ চেহারাটা কেমন বদলিয়ে যায় তার। মূহূর্ত্তপূর্বের সেই পরিহাসোচ্ছলতা আর নেই। পরিবর্তে প্রকাশ পায় এক ঘৃণার ভাব। কঠোর স্বরে বলে, "কিন্তু এই চূড়ামণকেও আমি জিন্দা রাখব না।"

"কেন ?" চমকে ওঠে মালিকা।

"এরাই হচ্ছে দেশের পরম শত্রু। অর্থের জন্যে এরা না পারে এমন কাজ নেই। তাই আমার বিচার হচ্ছে দেশরক্ষা করতে হ'লে আগে শেষ করতে হবে এইসব শত্রুদের। যাক্," বলে উঠে দাঁড়ায় শের খাঁ, "একেই বলে রাজনীতি, বুঝলে বেগম, যাকে দিয়ে কার্যোদ্ধার করব, কাজের শেষে তাকেই নিঃশেষে শেষ করে দিয়ে এগিয়ে যাব।"

শের খাঁ রোটাসগড় অধিকার করেছে শুনে সশব্দে হেসে উঠেছিল

হুমায়ুন। আর অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠেছিল দবীর। রাজনীতির যেটুকু সে শিখেছে তার সবটুকুই আব্বাস খাঁএর দান। অবসর মুহূর্ত্ত পেলেই তার পাশে গিয়ে বসে। আঘাত সেরে গিয়েছে। কিন্তু হরণ করে নিয়েছে তার একটি পায়ের শক্তি। টেনে টেনে চলতে হয়। লাঠিতে ভর দিয়ে। এ অবস্থাতেও কাজের চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু তা করতে দেয়নি দবীর। যুক্তিতর্কে যখন কাজ হয়নি তখন অভিমান দিয়ে হার মানিয়েছে তাকে। কয়েকটি দিন আর কথাই বলেনি তার সঙ্গে। বাড়ীটা যেন দবীরের কাছে হ'য়ে গিয়েছিল এক মুশাফিরখানা। রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যেত আর ফিরে আসত গভীর রাতে, নিঃশব্দে। আমিনা বুঝে নিয়েছিল এই মানুষটির ব্যথার কথা। তাই দবীরের সঙ্গে তারও ছিল এক নিঃশব্দ সহযোগ। রাত জেগে বসে থাকত তার অভিমানী শওহরের আগমন অপেক্ষায়। ডাকতে হ'ত না। যেন নিজের মন দিয়েই বুঝতে পারত দবীরের উপস্থিতি। তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিত। এইভাবে কয়েকটা দিন কেটে যাবার পর শেষে হার মানতে বাধ্য হয়েছিল আব্বাস খাঁ। আবার হাসি ফুটে উঠেছিল সেদিন এই সংসারটির মুখে।

সেই আব্বাস খাঁই একদিন বলেছিল দবীরকে, "আমার যদি কোন বুদ্ধি থাকে দবীর, তাহ'লে এই কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি যে শের খাঁর কাছ থেকেই চরম আঘাত পাবে বাদশাহ্।"

"কেন?" তখনও হুমায়ুনের শক্তি সম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাস রয়েছে দবীরের, তাই আব্বাস খাঁএর এই ধরণের বিপরীত মন্তব্যের কারণটি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছিল সে।

"শের খাঁএর প্রতিটি কাজের দিকে লক্ষ্য করে দেখ।" উত্তর দিয়েছিল আব্বাস খাঁ, "চুণারগড় নিল, সুরাজগড় জয় করল অর্থাৎ দুটি মোক্ষমগড় আজ তার হাতে। সে মানুষের সঙ্গে পেরে

ওঠা খুবই কষ্টকর।"

রোটাস্‌গড় জয়ের সংবাদ শুনে আব্বাস খাঁর সেই কথাটিই আবার মনে পড়ে দবীরের। দুই ছিল, তিন হ'ল। এখন? ভাগ্য তাকে কোন দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে? মাথার ভেতরে চিন্তার কুণ্ডলী নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করতেই চেপে ধরে আমিনা, "আবার আষাঢ়ের মেঘ কেন মুখের ওপরে?"

"গড়।"

এক কথার জবাব বোঝা মুশকিল হ'য়ে পড়ে আমিনার পক্ষে। দু'চোখের তারায় শাসনের ভঙ্গিমা, গলার স্বরেও শাসনের সুর এনে বলে, "দেখ বাপু, তোমার ঐ এক কথার জবাবগুলো আব্বাজানের কাছে দিও। আমার কাছে গড়গড় করে সব বলে যাও দিকি, বুঝে নিই কারণটা কি ঘটল।"

"শের খাঁ রোটাসগড় অধিকার করেছে।"

দবীরের উত্তর শুনে স্বস্তি যেমন পায় তেমনি বিস্ময়ও বোধ করে আমিনা।

"একজনের গড় আর একজন নিল, মাঝখান থেকে মন খারাপ হ'ল তোমার?"

কথা শুনে আমিনার মুখের দিকে তাকায় দবীর। হদিস্ করতে চেষ্টা করে, সরল মনেই এ প্রশ্ন করছে সে, না রহস্য করছে।

"কি দেখছ?" দবীরের তাকান দেখে মুখ টিপে হেসে জিজ্ঞাসা করে আমিনা।

"তুমি বোধহয় চিন্তা না করেই জিজ্ঞাসা করে বসেছ কথাটা।" উত্তর দেয় দবীর।

"আমার চিন্তাত' তোমাকে ঘিরে। সেই তুমিই যখন আমার সামনে রয়েছ তখন আবার মিছি মিছি ভাবতে যাব কেন?"

মেয়েদের মন নিয়েই বলেছিল আমিনা। ভাবতে চায় না

তারা। স্বপ্ন-গভীরা স্রোতস্বিণীর মত কল কল হাসির শব্দ-তরঙ্গ তুলে তর্ তরিয়ে বয়ে যেতে চায়। ভাবনার বোঝাটা থাক্ না পুরুষের মাথায়। দেহে, মনে যারা বহন-শক্তি নিয়ে জন্মেছে তাদের শ্রান্তি অপনোদনের জন্যেইতো নারীর জন্ম। কোথাও তার স্রোতস্বিণী-রূপ, কোথাও বা ধারা-রূপ। আসলে কাজ একই। পুরুষের ক্লমভাব মুছে দিয়ে আবার সতেজ করে তোলা। আমিনাও তাদেরই একজন। ভাবনা তার এই ক্ষুদ্র সংসারটিকে ঘিরে। দুনিয়ার কোথায় কি ঘটল তা নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা নেই তার। কিন্তু তখনও জানত না সে যে এই স্বল্প-গভীরাকেই আবার মাঝে মাঝে এসে পড়তে হয় গভীরতার মাঝখানে। মুক্তির চিন্তায় পাক খেয়ে খেয়ে ফিরতে হয়।

সেই অবস্থাই হ'ল আমিনার যখন বর্তমান অবস্থাটি বুঝিয়ে বলল দবীর। শের খাঁএর শক্তিবৃদ্ধি অর্থেই মালিকার ক্ষমতার বিস্তার। তার সেই বিস্তৃত হাতের মাঝখানে যদি কোনদিন গিয়ে পড়ে দবীর—

"থাম দিকি।"

দবীরের মুখখানা সবলে চেপে ধরেছিল আমিনা। পরের কথাটি শুনবার মত আর সাহসও ছিল না তার। তারপরই হঠাৎ হাত সরিয়ে নিয়ে ছুটে গিয়েছিল তার আব্বাজানের কাছে। কেঁদে পড়েছিল, যাহ'ক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

"আমি কি ব্যবস্থা করব?" অসহায়ের হাসি দিয়ে মনের কষ্টটাকে ঢাকবার চেষ্টা করেছিল আব্বাস খাঁ।

"তুমি কেন করবে? চাচাসাহেবকে দিয়ে বাদশাহ্‌কে বলাও।" যুক্তিটা যেন আপনিই এসে উপস্থিত হয়েছিল আমিনার মাথায়।

"তার কথা কি আর মানবেন বাদশাহ্?" চিন্তান্বিত ভাবেই

বলেছিল আব্বাস খাঁ, "দেখি, দবীরকে একবার পাঠাই আজম আলি সাহেবের কাছে।"

"হ্যাঁ, পাঠাও। আজই পাঠাবে কিন্তু।" অঙ্গজার দাবা জানিয়েছিল আমিনা। তারপরই বিরাট ঔৎসুক্য নিয়ে ঝুঁকে পড়েছিল আব্বাজানের মুখের ওপরে, "আচ্ছা, বাদশাহের সঙ্গে শের খাঁর যুদ্ধ হলে নিশ্চয়ই বাদশাহ্ জিৎবেন, তাই না?"

"জেতা তো উচিত।"

"উচিত নয়, ঠিকই জিতবেন। বাদশাহের কামান আছে।"

মানুষ নয়, ঐ যন্ত্রই যেন তার সমস্ত ভরসার মূল এমনভাবে বলে গিয়েছিল আমিনা।

এরকম একটা কিছু যে ঘটবে তা বুঝি হিসাবের ভেতরই ছিল শের খাঁর। তাই সাসারাম থেকে চুণারগড় যাওয়া আর হয়না মালিকার। যেতে হয় রোটাসগড়ে। গড়ে প্রবেশের মুখে বোরখার ভেতর দিয়ে একবার চারদিকটা তাকিয়ে দেখে সে। দুর্জয় গড়। বৎসরাধিক কাল এ গড়কে অবরোধ করে রাখলেও জয় করা সম্ভব নয়। আর সেই জায়গায় একরাত্রে একে জয় করেছিল শের খাঁ। চূড়ামণের উপদেশ মত বোরখা পরিহিতা একদল উদ্বাস্তু মুসলমান রমণীর বেশে সদলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল শের খাঁ। প্রথমে আশ্রয় দিতে রাজী হননি রাজা। বরঞ্চ রেগেই উঠেছিলেন মন্ত্রীর উপরে। কেন সে হঠকারীর মত আশ্রয়ের আশ্বাস দিয়েছিল ওদের। তারপরই আবার তাঁর ভেতরে দেখা গিয়েছিল সেই সনাতন হিন্দুর আতিথেয়তা। বোরখাপরা মানুষ কয়টিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আর সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিল শের খাঁ। একটি রাত্রির ভেতরেই অধিকার করে নিয়েছিল এই রোটাসগড়।

সেই রোটাসগড়ের একটী বিশিষ্ট কক্ষই মিলেছে মালিকার। শের খাঁর আপন পছন্দ মত। এর জানালার ধারে দাঁড়ালে দূরে দেখা যায় শোন-নদীকে। তির্ তির করে বয়ে চলেছে সরু রূপালী সূতোর মত। বর্ষায় নাকি এরই চেহারা হয় ভয়ঙ্কর। দু'কূলপ্লাবী। দেখে দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় তার। ঝির ঝিরে বাতাসে চোখ দুটি বুঁজে আসে। বাঁদীকে ডেকে বলে একটা কুর্শি এনে দিতে। তারই ওপরে গা এলিয়ে দেয় এক অপার নিশ্চিন্ততায়। স্বপ্ন দেখে দবীর এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। মুখে মদির হাসি। কেমন অবাক হ'য়ে যায় মালিকা। এমনভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কোন দিনত' হাসেনি দবীর! তাহ'লে কি সত্যিই আজ ওর মনের কোনে এতটুকু ঠাঁই পেয়েছে মালিকা? তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ করতে যায় দবীরকে। পারেনা। কার একখানি হাত এসে মালিকার কাঁধে পড়ে। ছিট্‌কে যায় ঘুমের ঘোর। চম্‌কে চোখ মেলে তাকায় মালিকা। দেখে হাসি হাসি মুখে তারই মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে শের খাঁ।

"জনাব কখন এলেন?" প্রশ্নের আড়ালে থেকে সহজ হওয়ার চেষ্টা করে মালিকা। দবীরের মূর্ত্তিখানি এখনও একেবারে মিলিয়ে যায়নি তার মনের পর্দার ওপর থেকে।

"কাকে কুর্ণিশ করতে যাচ্ছিলে?"

"ঝিরঝিরে বাতাসে ঘুম এসে গিয়েছিল।" বলেই সচকিত হ'য়ে ওঠে মালিকা। "আপনি বসুন," বলে ছুটে গিয়ে একটি সুন্দর আসন এনে পেতে দেয় কুর্শির ওপরে। বসে শের খাঁ। পাশে প্রায় তার গা ঘেঁষে দাঁড়ায় মালিকা। এতক্ষণে শের খাঁর পূর্বপ্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত করে মনটিকে তৈরী করে নিতে পেরেছে সে। বলে, "খোয়াব দেখছিলাম জনাব, বাদশাহ্ হুমায়ুনের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে এসে দাঁড়িয়েছেন আমার সম্মুখে। তাই আনন্দে লাফিয়ে উঠে

তসলিম জানাতে যাচ্ছিলাম জনাবকে !”

“জয় তো হয়নি। বরঞ্চ পরাজয়ই হ'য়েছে আমার।” হাসতে হাসতে বলে শের খাঁ।

কথাটি কেমন অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় মালিকার। পরাজয়ের কথা এমন হাসি হাসি মুখে বলতে পারে কেউ ?

“বিশ্বাস হচ্ছে না, না ?” বেগমের মুখের দিকে না তাকিয়েও তার মনের কথাটি শের খাঁ বুঝতে পারে, আর সেইমতই বলে, “কিন্তু সত্যিই পরাজয় হয়েছে আমার। চুণারগড় অধিকার করেছে হুমায়ুন।”

“তাহ'লে ?” হতাশার সুর ফুটে ওঠে মালিকার কণ্ঠস্বরে। এই চুণারগড়ের জন্যেই না সে শের খাঁকে নেকা করতে রাজী হয়েছিল ! সেখানকার সমস্ত ধনরত্ন তুলে দিয়েছিল এই মানুষটির হাতে। এখন যে আর কিছুই থাকল না তার ! কান্নার একটা বেগ দল পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে আসতে চাইছে বাইরের দিকে।

“তাহ'লে আবার হবে। আমি যখন গড় দিই তখন তা সুদে আসলে ওয়াসিল ক'রে নেবার জন্যেই দিই। বাদশাহ্‌কে গড়ের দিকে ব্যস্ত রেখে মুঙ্গের থেকে গৌড় পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল আজ আমার অধিকারে এনেছি। এবারে গৌড়।”

“চুণার তাহ'লে আর আসবে না ?”

“হুমায়ুন ওখান থেকে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার গড় দখল করবার জন্যে আদেশ দিয়েছি ইশাককে। তোমার গড় তোমার হাতে তুলে দিয়ে তবে আমার গৌড় যাত্রা। তবে এবার আর নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ দেবনা হুমায়ুনকে।” যেন মালিকাকে নয়, নিজের মনে প্রতিজ্ঞা নিচ্ছে এমনভাবে কথাগুলি বলে উঠে দাঁড়ায় শের খাঁ।

তবুও নিঃশ্বাস ফেলে হুমায়ুন। একের পর এক রাজ্য বা

রাজ্যাংশ জয় করতে করতে এগিয়ে চলতে দেখেছে শের খাঁকে। তখন কিছু বলেনি। ব্যস্ত ছিল চুণারগড় দখলের কাজে। দখল হল চুণার। আনন্দিত বাদশাহ্ ফিরে চলে আগ্রার দিকে। শেব খাঁও যেন এই মুহূর্ত্তটির জন্যে অপেক্ষা করে ছিল। বাদশাহী ঠাট নিয়ে চলা সেত' হাতীর ওঠা বসা। সময়ের প্রয়োজন। তাই হুমায়ুন আগ্রায় গিয়ে বসতেই গা-নাড়া দিয়ে ওঠে সে। প্রথমেই চুণার দখল কবতে হবে। তারপর গৌড়।

সে খবরও পায় হুমায়ুন। কিন্তু একই দুর্গের পেছনে কতবাব ছোটাছুটি করা যায়। তার চাইতে সন্ধির মাধ্যমে যদি বিরোধ মীমাংসা হ'য়ে যায়, তাহ'লে অযথা আর যাযাবরের মত স্থান থেকে স্থানান্তরে তাঁবু গেড়ে বেড়াতে হয়না। তাই করে হুমায়ুন। সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। দবীরও শোনে সে প্রস্তাবের কথা। জানে, শের খাঁব জ্বলন্ত উচ্চাশার মুখে পড়ে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে এই প্রস্তাব। কিন্তু বলেনা কিছুই। বলা তার সাজেনা। তার ওপরে বাদশাহের এখানেই কিছুকাল বাস কববার আভিপ্রায় আছে জানতে পেরে দিল্লী থেকে সকলকে নিয়ে এসেছে। নতুন পাতা সংসার। কাজ অনেক। এ সময়ে যদি গা তোলে বাদশাহ্ তাহ'লে বিপদেই পড়ে যাবে সে। তাই চোখ খোলা থাকলেও মুখটি বন্ধ করে রাখে। আর সেই খোলা চোখেই দেখতে পায় শের খাঁর উচ্চাশাব পাষাণ দরজায় ঠোক্কব খেয়ে ফিরে আসে বাদশাহের প্রস্তাব। এক নয়, একের পর এক। দেখে নিজের মনেই এক অপমানের জ্বালা অনুভব করে দবীর যে জ্বালা অনুভব করা উচিত ছিল হুমায়ুনের। তাকায় বাদশাহের মুখের দিকে। সেই আয়েসী মানুষের আলস্যে ভবা দৃষ্টি। বিভব আর বিলাস, এই যার একান্ত কাম্য।

কিন্তু সেই আয়েসী জীবনকেও একদিন ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াতে

হয় হুমায়ুনকে। শের খাঁএর সঙ্গে যুদ্ধে আহত মামুদ শা তার গৌড়রাজ্য হারিয়ে এসে আশ্রয় চায়, সাহায্য চায় বাদশাহের কাছে। বাদশাহী অভিমান। 'না' বলা যায় না। অতএব আবার উঠে দাঁড়াতে হয় হুমায়ুনকে। আদেশ দিতে হয়, "গৌড় চল।"

কিন্তু সে হুকুমের তেজ আর থাকে না শেষ পর্যন্ত। গৌড় পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই কখন মুছে যায় তা মনের কোমল পর্দাটির ওপর থেকে। এই রাজ্যটি বড় মনে ধরেছে তার। একটু আফশোষও বুঝি হয় মামুদের জন্যে। পথিমধ্যেই ইন্তকাল হ'য়ে গেল বেচারী। কিন্তু সে আফশোষও মুহূর্তে তলিয়ে গিয়ে রক্ত নেচে উঠে সুন্দরী নর্তকীর নাচের রিম্ ঝিম্ শব্দে।

দবীর শুধু দেখে যায়। করুণা হয় এই পরম বিলাসী বাদশাহের জন্যে। একবার নয়, বারবার সুযোগ এসেছে আর সে সুযোগকে এই মানুষটি অবহেলায় অগ্রাহ্য করেছে। এইবার, এই গৌড়ে আসবার পথেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তেলিয়া-গারহীতে এসে পথ আটকে দাঁড়াল জালাল খাঁ। আর সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল বাদশাহের অগ্রগতি। সহ্য করতে পারেনি সেদিন দবীর। বাদশাহ্, সিপাহ্শালার প্রভৃতির সামনেই চীৎকার করে উঠেছিল সে, "সর্বনাশ হ'য়ে যাবে জাঁহাপনা। শের খাঁকে আর বেড়ে উঠতে দেওয়া উচিত হবে না। আপনি অনুমতি দিন, আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে তছ্‌নছ্ করে দিচ্ছি জালাল খাঁর—"

"থাম," বাধা দিয়ে ধম্‌কে উঠেছিল হুমায়ুন, "লড়াই খামখেয়ালের কাজ নয়। এতগুলি আদমীর জানের দায়িত্ব আমার ওপর, অমনি খেয়াল মাফিক হুকুম দেওয়া যায় না।"

অতএব হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাও একদিন দু'দিন নয়, মাসাধিক কাল। তারপর হঠাৎ একদিন ফজরে সিপাহ্‌দের চীৎকার শুনে ছুটে বাইরে গিয়ে দেখে এল দবীর যে

রাত্রির অন্ধকারে সমস্ত ফৌজ নিয়ে কখন নিঃশব্দে সরে পড়েছে জালাল খাঁ।

বাদশাহ্ বলল, "দেখলেত' বেওকুফ, ওরা কেমন আপনিই সরে গেল। এর জন্যে হাজারো আদমীর জান খোয়াবার কোন প্রয়োজন ছিল?"

প্রয়োজন ছিল কি না, জানা গেল তা গৌড়ে এসে। নিঃশেষিত ধনভাণ্ডার। হুমায়ুনকে তেলিয়াগারহীতে আটকে রেখে অন্যপথে গৌড়ের ভাণ্ডার খালি করে নিয়ে গিয়ে রোটাসগড়ে তুলেছে শের খাঁ। দবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে একটুখানি লজ্জার হাসি হেসে ওঠে বাদশাহ্। তারপরই বলে ওঠে, "নাঃ, মেজাজটা শরিফ করে নিতে হবে। গৌড়ের নর্ত্তকীরা নাকি নৃত্যকুশলা আর বেহেস্তের হুরীর মত খুবসুরৎ। ডাক তাদের।"

মেজাজী মানুষের মেজাজ অত সহজে শরিফ হয় না। দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে কেটে যায় আটমাস সময়। চিন্তার অস্থিরতা মুখে ছাপ ফেলে দবীরের। এখানে আসবার পূর্বে যে একবৎসর কাল আগ্রায় কাটিয়েছিল বাদশাহ্, সেই একটি বৎসরই যা সুখের দিন কেটেছিল তার। খুশীর ভাব ফুটে উঠেছিল আব্বাস খাঁর চোখে মুখেও। একদিনত' স্পষ্টই বলেছিল, "দবীর, যেভাবে তোমাদের নেকা দিয়েছি সেভাবে নেকা হয় না কারও। মজলিস বসেনি, ইশাদী থাকেনি কেউ, খোৎবা-এ-নেকাও পড়া হয়নি। তবুও তোমার জবান যেভাবে তুমি রেখেছ তা মরদের পক্ষেই সম্ভব। আল্লা এর পুরস্কার দেবে।"

ঘরে ঢুকতে গিয়ে আব্বাজানের কথার দু'একটি শব্দ বুঝি কানে গিয়েছিল আমিনার। চির কুতুহলী স্ত্রী-মন। ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় আব্বাজানের চোখ এড়িয়ে দবীরের গায়ে একটি খোঁচা দিয়ে 'কথা আছে'র ইসারা জানিয়ে এসেছিল

সে। তারপর নিজের কোঠায় পেতেই চেপে ধরেছিল দবীরকে, বলতেই হবে কি বলছিল তার আব্বাজান। রহস্যে পেয়ে বসে দবীরকে। গম্ভীরভাবে বলে, "তিরস্কারের বাণীগুলি আমার মত মরদের ওপরে আওড়াচ্ছিলেন আরকি। আমি নাকি তোমাকে সুখে রাখতে পারিনি। চেষ্টা থাকলে আরও উঁচুতে উঠতে পারতাম, ইত্যাদি।"

"আরও উঁচুতে, কোথায়? ছাদের ওপরে?"

অত সহজে আওরৎ ভোলে না। আমিনাও তাদেরই একজন।

"ছাদে নয়, হাওদায়।" নির্বিকারভাবে দবীর বলে।

"আচ্ছা, ঢের হয়েছে!" দু'চোখে ধম্‌কানি আমিনার, "অসুস্থ মানুষকে হাওদায় তুলে নেব না, বলব এক্কায় উঠে ট্যাং ট্যাং ক'রে যেতে, না?"

"না, তা নয়। বলছিলাম কি, তোমার আব্বাজান আমার চাইতে বেশী অসুস্থ ছিলেন।"

"পারি না বাপু, যাও।"

লজ্জার ঝলকানিতে চোখ মুখ রাঙা হ'য়ে ওঠে আমিনার, আর সেই লজ্জা ঢাকতে দবীরেরই বুকে মুখ ঢাকে।

"খুব লজ্জা হচ্ছে, না?" আমিনার পিঠে হাত বোলায় দবীর, "সব সময়ইতো ব্যস্ত থাকতে হয়, তারই মধ্যে ঐ স্মৃতিটুকু নিয়ে নাড়াচাড়া করাই আমাদের বিলাস। তোমার সেই ওড়না ছুঁড়ে দেওয়া, হাত ধরে আমাকে হাওদায় তুলে নেওয়া—তুমি বিশ্বাস করবে না আমিনা, অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে সেদিন আমি চোখের জল ফেলেছিলাম।"

"কেন?" চম্‌কে সরে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকায় আমিনা।

"তুমি যে এতটা ভালবাস আমাকে তা সেদিনের পূর্বে এমন করে জানতে পারিনি আমি। তার ওপরে যেভাবে ঠেলে সরিয়ে

দিয়েছিলে আমাকে—"

"থাক সে কথা।"

বাধা দিয়ে বলে ওঠে আমিনা। শোনবার প্রয়োজন মিটে গিয়েছে তার অনেক দিন। প্রথম আবেগের ধাক্কায় সে দবীরকে সরিয়ে দিয়েছিল বটে কিন্তু তারপর যত দিন গিয়েছে ততই অনুশোচনার জ্বালা তার বেড়েই গিয়েছে। কিছুই না জেনে একি এক কাজ করে বসল সে! তাই প্রথম সুযোগেই সে দবীরের অমন নৃশংস হওয়ার কারণটি জানতে চেয়েছিল। সে কারণও জানা হ'লনা, আব্বাজানের আদেশ মাথায় করে নিতে হ'ল। তখন থেকে এই মানুষটিকে যতই ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখেছে সে ততই দৃঢ় ধারণা হয়েছে তার, এ মানুষের দ্বারা এমন অন্যায় কাজ অসম্ভব। যদি ঘটেও থাকে, তাহ'লে তার এমন কোন কারণ ছিল যা এড়িয়ে যেতে পারেনি। সেইদিন থেকে আর সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই তোলেনি আমিনা। বরঞ্চ মনে হয়েছে তার, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে গেলে দবীরকে আঘাতই দেওয়া হবে। সেদিনও তাই দবীরের কথায় বাধা দিয়ে ওঠে।

কিন্তু থামেনা দবীর। বলব বলব করেও যে কথা বলা হয়নি এতদিন সেই কথাই সে বলে যেতে থাকে। শুনতে শুনতে চোখে জল এসে পড়ে আমিনার। একান্ত করে পাওয়া এই মানুষটিকে যেন আবার নতুন ক'রে ভালবাসে সে। মহব্বতের এত দাম কেউ যে দিতে পারে তা সে ভাবতেই পারে নি। খসমের বুকে মুখ লুকিয়ে আবার কাঁদে আমিনা। কাঁদতে কাঁদতেই কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে প্রকাশ করে ফেলে তার গোপন কথাটি, "আমার ছেলে যেন তোমারই মত মানুষ হয়।"

এযে নতুন কথা! আমিনার কাঁধদুটি ধরে সামনে দাঁড় করিয়ে এক হাতে তার মুখখানি তুলে ধরে দবীর।

"হবে নাকি, এঁ্যা ?"

"যাও!" মুখখানি লজ্জায় নুয়ে পড়ে আমিনার। বলে, "আমি আম্মার কাছে যাই। অনেকক্ষণ একলা রয়েছেন তিনি।"

একরকম ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল আমিনা।

গৌড়ে বসে সেই কথাগুলিই আবার নতুন ক'রে মনে পড়ে দবীরের। সেখানেও ছিল বিশ্রাম, এখানেও তাই। কিন্তু এ দু'য়ের ভেতরে কি আসমান জমিন তফাৎ! এতদিনে নিশ্চয়ই বেটা জন্মেছে তার। কিন্তু তার কোন খবরই পাওয়ার উপায় নেই। আগ্রার কেন, কোন জায়গা থেকেই কোন খবর আসছে না। বারাণসী, জৌনপুর, কলপি, কনৌজ সব চুপ। এমনটা হ'ল কেন? চারপাশ থেকে কাল মেঘ এসে জড়ো হচ্ছে। ঝড়ো বাতাসের সোঁদা গন্ধ এসে নাকে লাগে। কিন্তু চেতনাহীন গৃহস্থ বাহ্যজ্ঞান হারা হয়ে মেতে রয়েছে গান আর নাচে। এই নাচেই শেষ করবে বাদশাহ্‌কে। সঙ্গে সঙ্গে সারা হিন্দুস্থান চলে যাবে শের খাঁর হাতে। ভাবতে ভাবতে নাচঘরের দিকেই এগিয়ে চলতে থাকে দবীর। দেখে হুমায়ুন হন্‌হন্‌ করে নাচঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। মুখের ওপরে আষাঢ়ের মেঘের ছায়া। তাড়াতাড়ি কুর্ণিশ করে একপাশে সরে দাঁড়ায় দবীর।

"সিপাহ্‌শালারকে খবর দাও।" হুকুম জানিয়ে চলে যায় হুমায়ুন।

দবীরও ছুটে চলতে থাকে সিপাহ্‌শালারের খোঁজে।

শেষ পর্যন্ত জানতে পারা গেল সবই। সংবাদ আদান-প্রদানের সমস্ত রাস্তাই বন্ধ করে দিয়েছে শের খাঁ। বারাণসী থেকে কনৌজ

পর্যন্ত অধিকার করে নিয়েছে। কোন শাসনকর্তাকে হত্যা করেছে, কেউ বা পলাতক। মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে হুমায়ুনের। এতদিনে বুঝি আপোষ স্পৃহা মিটে যায় তার। ভাই আসকারীকে বলে একদল সিপাহ্ নিয়ে এগিয়ে যেতে। পিছনে অপর দল নিয়ে নিজে চলে সে। সঙ্গে বেগমের দল। বাদশাহের হাতীর পাশে পাশে চলেছে দবীর। কেন যেন মন তার বারে বারেই বিষণ্ণতায় ভরে উঠছে। নিজেই আশ্চর্য হ'য়ে যায় সে, এরকমত' কখনও হয়নি! মনে পড়ে, আগ্রা ছেড়ে আসবার সময় আমিনাও কেঁদে ভাসিয়েছিল। মুখে যদিও কোনও কথা বলেনি তবুও অমঙ্গল আশঙ্কা যে তার বুকে পাষাণের চাপ নিয়ে বসেছিল, সে কথা বেশ বুঝতে পেরেছিল দবীর। তবুও উপায় নেই, যেতেই হবে। মাসিক কয়টি মুদ্রার শেকলে যে তার জীবনটি বাঁধা।

মুঙ্গেরে গঙ্গার তীরে এসে মিলিত হয় আসকারী আর হুমায়ুন। গঙ্গা পার হ'য়ে তার দক্ষিণ তীরে এসে ওঠে। শের খাঁর রাজত্বের ভেতর দিয়ে তারই গড়া সড়ক ধরে এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু নসীব বুঝি আবার ভুল পথে চালিত করে তাকে। ভোজপুরের বিহিয়াতে এসে পুনরায় গঙ্গা পেরিয়ে তার উত্তর ভাগে গিয়ে উঠতে হয় হুমায়ুনকে। সে ভুলের সুযোগ নেয় শের খাঁ। তার ছোট ছোট সিপাহের দল নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত বিপর্যস্থ করে তুলতে থাকে বাদশাহী ফৌজকে। অনভ্যস্থ বাদশাহী ফৌজ, দরিয়ার বুকে লড়াইএর রীতি তাদের জানা নেই। অপরদিকে শের খাঁ নিয়োগ করেছে গ্রামীণ মানুষকে। জীবনের সঙ্গে যাদের ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই নদী। আঘাতে ব্যাঘাতে নৌকার অপ্রতুলতায় চোখে অন্ধকার দেখে আসকারী আর হুমায়ুন। প্রতি মুহূর্তেই আক্রমণের আশঙ্কা করে তারা। কিন্তু না, আক্রমণ করে না শের খাঁ। শুধু দূরে দাঁড়িয়ে উপভোগ করতে থাকে বাদশাহের

এই বিপর্যস্থ অবস্থাটি।

ক্রমে গঙ্গা পার হয় বাদশাহী ফৌজ। ছুটতে থাকে চৌসার দিকে। তাতেও শান্তি নেই। কর্মনাশা নদী থেকে কিছু দূরে অবস্থিত চৌসায় পৌঁছে আবার গঙ্গা পার হ'য়ে তার দক্ষিণ তীরে এসে উঠতে হয়। ওদিকে আফগান বাহিনীও ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় মুখোমুখি হ'য়ে। শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিশ্র'মের জন্যে উন্মুখ। তাদের সে অবস্থার খবর এসে পৌঁছুতে দবীরের হাতখানা যেন আপনিই গিয়ে কোটিবদ্ধ তরোয়ালের মুষ্টিটা চেপে ধরে। এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। বাদশাহী ফৌজ বিশ্রাম পেয়েছে একটি পূর্ণ দিন আর শের খাঁর ফৌজ পথশ্রান্ত। এর ওপরে যুদ্ধের আঘাত আর সহ্য হবে না তাদের। বাদশাহের মুখের দিকে তাকায় দবীর। না, আক্রমণের কোন লক্ষণই নেই সে মুখে। সেই চির আয়েসী মানুষ, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ, সন্ধির জন্যে অধীর আগ্রহী। বিপদ গোণে দবীর ভয়ে তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

কর্মনাশা আর গঙ্গার মধ্যবর্তী নিম্নভূমি এই চৌসা। তারই উন্মুক্ত প্রান্তরের বুকে শিবির পড়েছে বাদশাহের। তার একপার্শ্বে বেগমদের অপর পার্শ্বে বাদশাহের দরবার শিবির। আর এই মূল তিনটি শিবিরকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য শিবির। যথানিয়মে প্রস্তুত সকলে। যে কোন মুহূর্ত্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আফগান ফৌজের ওপরে। কিন্তু সে হুকুম আর আসে না। শের খাঁও যেন শেরের মতই থাবা গেড়ে বসে রয়েছে। সামান্য অন্যমনস্কতার সুযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে বন্যার বেগবতী নদীর মত। ভাসিয়ে নিয়ে যাবে মোগল ফৌজকে।

দিন যায়। শক্তি বাড়ে শের খাঁর। আরও আফগান সিপাহ্ তার পতাকার নীচে এসে দাঁড়ায়। তবুও নির্বিকার সে। অপেক্ষা করতে থাকে বর্ষার।

অদূরদর্শী হুমায়ুন সে কথা বোঝে না। বোঝে না এই নিম্ন-ভূমিতে কি অসুবিধার সম্মুখীন তাকে হ'তে হবে বর্ষার আগমনে। তার ওপরে দু'ধারে দুইটি নদী। তাদের কূল ছাপান জল যখন এসে পৌঁছবে এই জমির ওপর তখন আত্মরক্ষা করাও ভার হ'য়ে উঠবে মোগলবাহিনীর পক্ষে। আর বৃশ্চিকের জ্বালা নিয়ে ছটফট্ করতে থাকে দবীর। সমস্ত অন্তর তার হায় হায় ক'রে উঠতে থাকে। চোখের ওপরে ভেসে ওঠে একটি দৃশ্য—দিল্লীর রাজপ্রাসাদ থেকে টেনে ছিঁড়ে নামিয়ে ফেলা হয়েছে মোগল পতাকা, আর সেই জায়গায় বুক ফুলিয়ে পত্ পত্ ক'রে উড়ছে আফগান নেতা শের খাঁর বিজয় নিশান।

শেষ পর্যন্ত দবীরের সেই আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হ'য়ে গেল। দুই নদী যেন পরম আক্রোশে ফুলে ফেঁপে উঠছে। বন্যার জল এসে কলকল ক'রে ঢুকছে শিবিরের ভেতরে। সিপাহ্দের ভেতরে বিশৃঙ্খলা। যে যেখানে পেরেছে, টিলা বা উঁচু ঢিবির ওপরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। সামনে এগিয়ে যাবে সে উপায়ও নেই। ওঁৎ পেতে রয়েছে শের খাঁ। কলরব ওঠে বেগমদের শিবির থেকে। নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে চায় তারা। উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে নেতৃস্থানীয়েরা। ঠিক সেই সময়েই খবর আসে শের খাঁ তার বাহিনী নিয়ে সাহাবাদের আদিবাসী-প্রধান মহারথ চেরোর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছে। প্রকৃতপক্ষে করেছেও তাই। খবরের সত্যতা অনুসন্ধানও করে আসে কয়েকজন। নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে মোগলবাহিনী। অলস আবেশে দেহ এলিয়ে দেয় তারা। পুরোভাগের রক্ষীদলও এতদিনের একটানা মানসিক উত্তেজনার

পর সেদিন পরম নির্ভয়ে নিদ্রাকে যেন দু'হাতে জড়িয়ে ধরে।

বর্ষার রাত। সন্ধ্যা থেকে কয়েক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছে। সিক্ত বাতাস শীতের কাঁপন ধরায় দেহে। সিপাহ্‌রা সব কুকুর-কুণ্ডলী হ'য়ে নাক ডাকাচ্ছে শিবিরের ভেতরে। নিস্তব্ধ প্রান্তর। শুধু শোনা যায় গাছের পাতা থেকে পাতায় ঝরে পড়া জলের টিপ্‌টাপ্‌ শব্দ আর ঝিঁঝিঁর একটানা গলাচেরা ডাক।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ প্রান্তর আর্ত-চীৎকার আর রণ-হুঙ্কারে কেঁপে ওঠে। শ্লথ, সুষুপ্ত মোগল সিপাহ্‌ চমকে উঠে হাতিয়ার খুঁজতে থাকে। অন্ধকারে দিকভুল হয়। ধাক্কা খায় শিবিরের কাপড়ের গায়ে। আর পিছন থেকে আসে তরোয়ালের আঘাত। এধার থেকে ওধার, ছুটে পালাবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে তারা। পারেনা। সামনে পিছনে আফগান সৈন্য, দু'পাশে মুখব্যাদন করা দুই নদী। এতক্ষণে বোঝে তারা যে শের খাঁ কোন মহারথের বিরুদ্ধেই যুদ্ধযাত্রা করেনি। আসলে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে রাত্রির মধ্যযামে আবার নিঃশব্দে ফিরে এসেছে। ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিদ্রামগ্ন অপ্রস্তুত বাদশাহী-ফৌজের ওপরে।

এতদিনে নিজের প্রকৃত বিপদটি বুঝতে পারে হুমায়ুন। শিবির থেকে বেরিয়েই ছুটে গিয়ে লাফিয়ে উঠে বসে নিজের ঘোড়ার পিঠে। প্রস্তুতই ছিল দবীর। বাদশাহের দেহরক্ষী, তাকে রক্ষা করবার দায়িত্ব তার। অন্যান্য কয়েকজন দেহরক্ষীর সঙ্গে সেও অশ্বারূঢ় হয়। ছুটে চলতে থাকে বাদশাহের পাশে পাশে।

সমস্ত প্রান্তর ছুটে চেষ্টা করে হুমায়ুন যাতে আবার সুসংবদ্ধ করতে পারে মোগল সৈন্যকে। কিন্তু পারেনা। অধিকাংশই মৃত। যারা জীবিত তাদের ভেতরে একটি বিরাট অংশ পালিয়েছে প্রাণ নিয়ে। যারা পারেনি পালাতে, তারাও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কিছু এসে যোগ দেয় বাদশাহের সঙ্গে, কিছু বা তাও পারেনা। মরবার

আগে মরণ কামড় দেবার জন্যে মরিয়া হ'য়ে অস্ত্র চালাতে থাকে।

এত করেও কিছু করতে পারে না হুমায়ুন। এমনকি নিজের শিবিরে ফিরে আসাও তার সাধ্যের অতীত হ'য়ে যায়। অনন্যোপায় হ'য়ে গঙ্গার দিকে মুখ ঘোরায় সে। পালাতে হবে। প্রাণপণে লড়াই করতে করতে এগিয়ে চলে ক্ষুদ্র দলটি। কিন্তু হঠাৎ যেন ঝড়ের গতিতে একদল আফগান সিপাহ্ নিয়ে এসে উপস্থিত হয় মীর আহ্মদ। সে আক্রমণকে রুখতে গিয়ে নিজেই রুখে যায় দবীর। বাদশাহ্ দাঁড়াতে পারেনা সামান্য একজন দেহরক্ষীর জন্যে। মোড় ঘুরে অন্যদিকে পথ করতে করতে বেরিয়ে যায়। পিছনে পড়ে থাকে বন্দী আহত দবীর আর শিবিরে বাদশাহের বেগমদল। এমনকি প্রধানা বেগা বেগম পর্যন্ত।

আহত দবীরকে নিয়ে গিয়ে শের খাঁর সম্মুখে হাজির করে মীর আহ্মদ।

"এ কে?" জিজ্ঞাসা করে শের খাঁ।

"দবীর খাঁ, জনাব," উত্তর দেয় মীর আহ্মদ, সঙ্গে পরিচয়ও দেয় "চুণারগড়ের জিম্মাদার ইস্ত্কাল তাজ খানের লেড়কা।"

"ও, তুমিই দবীর?" তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকায় শের খাঁ। মশালের আলোয় চোখদুটি তার জ্বল জ্বল করে জ্বলতে থাকে। এমন খুবসুরৎ চেহারা না হ'লে মালিকা অমন পাগল হ'য়ে উঠবে কেন এর জন্যে। ঠিক আছে, সে দাওয়াইও হবে, ভাবে শের খাঁ। মুখে বলে, "একে হেকিম দিয়ে দেখাও। তারপর চুণার পাঠিয়ে দাও।"

"আমার লাস নিয়ে যেতে পারেন, জিন্দা পারবেন না।" দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠে দবীর।

"কি রকম ?"

"আমি চুণার যাব না।"

হাসি ফুটে ওঠে শের খাঁর মুখে।

"বেশ, না হয় আমার সঙ্গেই থাকবে।"

"তাও নয়। বাদশাহ্‌র বেগমদের যদি বাদশাহ্‌র কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন তাহ'লেই আমি যাব।"

"তাই দেব। তাহলেত' যাবে ?" আপনিই কোমল হ'য়ে আসে শের খাঁর কণ্ঠস্বর।

"জী জনাব।"

দবীরও শ্রদ্ধা জানায়।

রোটাসগড়ে বন্দী দবীর। দিনরাত্রের সঙ্গী একমাত্র চিন্তা। চিন্তা পলাতক বাদশাহ্‌ হুমায়ুনের জন্যে, চিন্তা তার সংসারের জন্যে। অন্তর্বত্নী আমিনাকে ফেলে সেই যে চলে এসেছে সে তারপর থেকে আর কোন খোঁজই জানে না তার। কেমন আছে সে, আম্মাজান আর আমিনার বাবা ? ভাবতে ভাবতেই দিন কেটে যায় তার। আসে রাত্রি। আকাঙ্খিত রাত। অন্ততঃ এই সময়টুকু সকল চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পায় সে।

এরই ভেতরে একদিন শোনে বিলগ্রামে আবার বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধ হ'য়েছিল শের শাহের। শের খাঁ নয় এখন আর। মসনদ-ই-আলি ইশাখানের প্রস্তাব ও আজম হুমায়ুন সারওয়ানি প্রভৃতির সমর্থনে রাজ উপাধি ধারণ করে শের শাহ্‌ হ'য়েছে শের খাঁ। তার প্রচলিত মুদ্রাতেও সেই নামই অঙ্কিত হ'য়েছে। সেই বিলগ্রামের যুদ্ধ থেকেও পালাতে হ'য়েছে বাদশাহ্‌কে। পালিয়েছে আগ্রার দিকে। তবুও নিস্তার নেই। ব্রহ্মদেও গৌড় বিরাট এক ফৌজ নিয়ে

পিছু ধাওয়া করেছে বাদশাহের। আর এদিকে চুণার থেকে প্রায় এক সহস্র সিপাহ্ নিয়ে রওনা হ'য়েছে ইশাক।

সংবাদ শুনে বুক শুকিয়ে যায় দবীরের। এই ইশাকই এলাহাবাদ পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিল আমিনাকে ছিনিয়ে আনতে। এবারে আর তাকে রক্ষা করবার কেউ নেই। রাজ-দরবারে দবীর অপরিচিত নয়। তার গৃহও চেনে অনেকেই। কি করবে সে এখন ? কি করা উচিত ? মাথা দিয়ে যেন আগুন ছুটছে। বন্দী বাঘের মত অস্থির পদক্ষেপে ঘরের এধার থেকে ওধার করতে থাকে। অন্তরে গলিত লাভা, কিন্তু ফুটে বেরুবার রাস্তা নেই কোথাও।

মলদেও রাঠোরের ভেতরে যে আগুন ছিল, ব্রহ্মচারী বাতাস দিয়ে দিয়ে আরও ভালভাবে জ্বালিয়ে দিয়েছেন তা। শুধু বাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি। সর্বক্ষণের সহায়করূপে সাহায্যও করেছেন। ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধিত হ'য়েছে মলদেওএর রাজ্যের সীমানা। দিদওয়ানা, পাঁচভদ্রা, বালি এসেছে হাতে। বিকানীরের প্রায় অর্দ্ধাংশ বিজিত।

"এবারে ?" ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন মলদেও।

ব্রহ্মচারী বুঝেছিলেন মলদেওএর অকথিত ইচ্ছাটি।

"এবারে একটু একটু করে দিল্লীর দিকে মুখ ঘোরাতে হবে।" সেই অকথিত ইচ্ছাটির উত্তর দিয়েছিলেন ব্রহ্মচারী।

"ব্যবস্থা করুন।"

করাই ছিল ব্যবস্থা। শুধু যাত্রা করা বাকী। তাও হ'ল। আবার যুক্ত হ'ল জলগোর, টঙ্ক, মালপুব। ক্রমে এগুতে এগুতে ঝাঝর পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন মলদেও। দিল্লী মাত্র আর একদিনের পথ। যোধপুর রাজ্যের সীমা যেমন বেড়েছে তেমনিই বর্দ্ধিত

হ'য়েছে তার ধনসম্পদ আর সৈন্যসংখ্যা। এবারে তাঁর আসল প্রস্তাবটি নিয়ে এসে মলদেওএর সামনে দাঁড়ান ব্রহ্মচারী।

"মহারাজ! একা যদি শের শাকে আঘাত করতে যান, পারবেন না। তার যুদ্ধের রীতি আলাদা। যতগুলি যুদ্ধ সে জয় করেছে, হিসাব করে দেখুন, তার ভেতরে শঠতার সংখ্যাই বেশী। তাই আমার মনে হয় তাকে চারিধার থেকে আঘাত করে বিপর্যস্থ করে তুলতে হবে। তবে যদি তার পতন সম্ভব করে তোলা যায়।"

"কি করতে চান আপনি?" ব্রহ্মচারীর কথার অন্তর্নিহিত অর্থটি ঠিক করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেন মলদেও।

"রাইসিন, রেওয়া আর বুন্দেলখণ্ড, এই তিনটি শক্তিকে এক করে যদি বিহারের রোটাসগড় আর চুণারগড় ছিনিয়ে নিতে পারা যায় তাহ'লে আফগান শক্তি এতটা হীনবল হ'য়ে পড়বে যে আপনার এক আঘাতেই চুরমার হয়ে যাবে শের শাহ্‌র মসনদ।" বলে মহারাজার মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ব্রহ্মচারী, তারপর ধীরে ধীরে বলেন, "তাই এবারে আমি রাইসিন যাব। আপনার অনুমতি চাই।"

হাত জোড় করে দাঁড়ান ব্রহ্মচারী।

তিলমাত্র স্বার্থ না রেখে যে মানুষটি এতগুলি বৎসর ধরে বুদ্ধি দিয়ে, সহায়তা দিয়ে রাজ্য ও সম্পদ বাড়িয়েছেন তাঁর, তাঁকে বিদায় দিতে গিয়ে চোখদুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে মলদেও-এর। তবুও দিতেই হয় বিদায়। বৃহৎ স্বার্থের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র স্বার্থকে ত্যাগ করতে এই ব্রহ্মাচারীই যে শিখিয়েছেন তাঁকে।

"বেশ। তাই যান।" ধরাগলায় বলেন মলদেও।

"কিন্তু যাওয়ার পূর্বে একটি কথা আপনাকে বলে যাই মহারাজ। ওদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধেই শুধু রাজী হবেন। কুটনীতিতে যাবেন

না, পারবেনা।”

“কেন ?” সাশ্চর্যে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বলদেও।

“তার কারণ আপনারা বিবেক সঙ্গে করে যুদ্ধক্ষেত্রে যান আর ওরা সেটাকে আবর্জনার মতই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আসে।” বলে নমস্কার জানিয়ে নিজের যাত্রার ব্যবস্থা করতে চলে যান ব্রহ্মচারী।

দুইটি ফনিণী যেন মুখোমুখি ফণা বিস্তার করে দাঁড়িয়েছে। মালিকা আর আমিনা। বহুচেষ্টায় আগ্রা থেকে আমিনাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল ইশাক। নিজেদের মিলনের মাঝখানে বিঘ্নসৃষ্টিকারী কাউকে রাখবেনা বলে আমিনার শিশুপুত্রটিকেও নিয়ে আসেনি। ফেলে এসেছে আসরাফন বিবির কোলে। কিন্তু চুণারে এসে দেখে তার পাকা ঘুঁটি কেঁচে যেতে বসেছে। মালিকা যেন এই শিকারটির জন্যেই থাবা গেড়ে বসেছিল এতকাল। ইশাকের সঙ্গে আমিনা দুর্গে এসে প্রবেশ করতেই সে হুকুম করে বসে ঐ অপহৃতাকে তার মহলে পৌঁছে দিতে হবে। হুকুম শুনে কেমন হতভম্ব হ'য়ে যায় ইশাক। জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে বটে কিন্তু নেকা করা ভিন্ন অন্য কোন রকম অভিপ্রায় তার ছিল না। এখন মালিকার হুকুম শুনেই বুঝতে পারে যে এই নিরীহ আওরৎটির ওপরে আঘাত হেনে দবীরের ওপরে প্রতিশোধ নেবে সে। জান থাকতেও তা হ'তে দেবে না ইশাক। স্থিরপ্রতিজ্ঞ মনে আমিনাকে সঙ্গে নিয়েই সে গিয়ে দাঁড়ায় মালিকার কাছে।

“তুমি আবার এলে কেন ?” ইশাককে দেখেই বলে উঠে

মালিকা।

"আমার একটা অনুরোধ আছে।" বলে ইশাক।

"বল।"

"দবীরের ওপরে প্রতিশোধ নিতে পার, নাও, কিন্তু এর ওপরে কোনরকম অত্যাচার কর না তুমি।"

"আমার গায়ে হাত তুলতে সাহস করে যে তাকে সবংশে শেষ করতে চাই আমি। দবীরের কোন ছেলে নেই?"

"আছে। একটি।"

"তাকে আমার কাছে এনে দেবে।"

হুকুম শুনে ডুকরে কেঁদে ওঠে আমিনা, "না, না. আমার ওপরে যত পার অত্যাচার কর, কিন্তু আমার ছেলেকে কোন শাস্তি দিও না। ও শিশু, কোন পাপ করেনি।"

"পাপ-পুণ্য কিছুই আমি বুঝি না। আমার কাছে কেঁদে কোন লাভও হবে না।" বলেই ইশাকের দিকে তাকায় মালিকা, "যা বললাম তাই কর।"

মালিকার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ইশাক। এই তার ছোট বোন, যাকে বাপের মত করে আগলে নিয়ে এসেছিল সেই মদিন থেকে। জীবনে যাতে কষ্ট না পায় তারই জন্যে নেকা দিয়েছিল তাজ খাঁর সঙ্গে। তাজ খাঁর পরে শের খাঁ। তার জন্যে একবার নয়, কয়েকবারই বিহারে ছুটতে হ'য়েছে তাকে। আর আজ সে ই কিনা হুকুম করে তার বড় ভাইজানকে। কিন্তু কিছু বলবারও উপায় নেই। শের শাহ্‌র পেয়ারা বেগম। যার ইচ্ছায় এখানেই বরাবর থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে শের শাহ্‌। সে ছোটবোন হলেও তার হুকুম আজ মানতে হবে বৈকি। ইশাকের নোকরি থাকা আর যাওয়া যে আজ এই মালিকারই মুখের একটি কথার ওয়াস্তা।

"যো ফরমায়েস বেগম সাহেবা।" অভিমান ক্ষুব্ধস্বরে কথা কয়টি বলে যা কোনদিন করেনি তাই করে বসে ইশাক। মালিকাকে কুর্ণিশ জানিয়ে হুকুম তামিল করতে চলে যায়।

কিন্তু সেদিকে নজর দেবার মত অবসরও বুঝি নেই মালিকার। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আমিনার মুখের দিকে। আমিনাও প্রথম দর্শণেই চিনে নিয়েছে এই ভূমিস্ফোট আওরৎটিকে। এর কাছে ইনশানিয়াৎ কিছু নয়। আশার অতীত কিছু মিলে যাওয়ার অন্ধ আবেগে সমস্ত পৃথিবীটাই নিজের হাতের মুঠোয় বলে ভাবছে ও। মনের ভেতরে কেমন একটা বিরূপতা বোধ করে আমিনা। ঘৃণা হয় এই আওরৎটির কাছে কিছু প্রার্থনা করতে। সঙ্গে সঙ্গে আপনি যেন রুদ্ধ হ'য়ে যায় তার চোখের জলের উৎস। পরিবর্ত্তে আগুন দেখা যায় সেখানে। কঠিন দৃষ্টিতে তাকায় মালিকার মুখের দিকে। উভয়ের দৃষ্টি উভয়ের প্রতি। হিসাব নিচ্ছে বুঝি একে অপরের শক্তির।

"আজ থেকে আমার বাঁদীর কাজ করবে তুমি।" হুকুম জানায় মালিকা।

"না।" ছোট্ট অথচ কঠিন উত্তর দেয় আমিনা।

"না!" চম্‌কে ওঠে যেন মালিকা।

"না।"

"এতবড় সাহস তোমার?" বলেই চীৎকার করে উঠে মালিকা, "ওয়াহিদা—"

ওয়াহিদা এসে দাঁড়াতেই হুকুম দেয় সে, "একে নিয়ে যা। তোর কাজগুলি শিখিয়ে দিবি। আর ইশাকের সঙ্গে দেখা করে বলবি, যত তাড়াতাড়ি পারে এর ছেলেকে যেন আগ্রা থেকে নিয়ে আসে।"

"জী মালিকান্" বলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ায় ওয়াহিদা।

"আর শোন্, রোটাসগড়ে যাচ্ছে কেউ?" জিজ্ঞাসা করে মালিকা।

"জানিনাত' মালিকান।"

"খোঁজ নে। আমার একখানা চিঠি নিয়ে যাবে।"

"জী।" বলে যেতে যেতে আবার দাঁড়িয়ে যায় ওয়াহিদা। ফিরে এসে আমিনার হাত চেপে ধরে, "চল্।"

মুহূর্ত্তে কি যে হ'য়ে যায় আমিনার, সজোরে একটি চড় মেরে বসে ওয়াহিদার গালে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়'য় মালিকার দিকে মুখ করে। সদর্পে জানিয়ে দেয়, "আমাকে মেরে ফেলতে পারেন কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাজ আমাকে দিয়ে করাতে পারবেন না।"

"ওয়াহিদা," চীৎকার ক'রে ওঠে মালিকা, "একে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বন্ধ ক'রে রাখ। তারপর আমি দেখে নিচ্ছি আমার হুকুম ও মানে কিনা!"

এবারে শক্তমুঠিতে আমিনার হাত চেপে ধরে ওয়াহিদা, জবরদস্তি টেনে নিয়ে যেতে থাকে।

ব্যস্ত শের শা। দৃষ্টি পড়েছে তার রাজপুতনার দিকে। দু' চোখের সজাগ দৃষ্টি মেলেই সে দেখেছে সংগ্রাম সিংহের যুদ্ধ। দুর্দ্ধর্ষ এই জাতটিকে যদি নুইয়ে রাখতে না পারে তাহলে তার আসনও একদিন টলে উঠবে। তাই পূর্বাহ্নেই সে সড়ক তৈরী করে রাখতে চায় আগ্রা থেকে যোধপুর, চিতোর অবধি। যেমন সড়ক টেনেছে সে সাসারাম থেকে কাশী, কাশী থেকে আগ্রা পর্যন্ত। ইচ্ছা আছে এই সড়ককেই সে করবে হিন্দুস্থানের দীর্ঘতম রাস্তা। যে রাস্তায় শুধু তার ফৌজ নয় দেশবাসীও চলাচল করবে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে।

সেই সড়ক নির্মাণ সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল জরিপদার, ঠিকাদারএর সঙ্গে, এমন সময় ইশাক গিয়ে তসলিম জানায়।

তুমি আবার এখানে কেন ?” ভ্রূকুটি করে ওঠে শের শাহ্‌।

“আজ্ঞে, হুকুম হ'য়েছে দবীর খাঁর ছেলেকে এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে।” সসম্মানে উত্তর দেয় ইশাক।

“তার মার কাছ থেকে কেড়ে ?”

“আজ্ঞে না। তার মা এখন চুণারগড়েই আছে।”

“কে নিয়ে গেল ?”

এ কথার আর উত্তর নেই। ইশাককে মাথা নীচু ক'রে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আসল ঘটনাটি বুঝে নেয় শের শাহ্‌। কিন্তু সে সম্বন্ধে আর কোন কথা না বলে ঘুরে আবার সড়ক সম্বন্ধে আলোচনায় ফিরে আসে।

“দেখ বাপু, এই ঠিকাদাররা বড্ড চুরি করে। লাগাবে একশ মজুরদার তো হিসাব দেবে দেড়শ'র।”

“আজ্ঞে না জনাব।” লজ্জিতভাবে ঠিকাদারটি বলে ওঠে।

“তুমি থাম। বিহার থেকে এই আগ্রা পর্যন্ত সড়ক তৈরী করালাম, আর আমি কিছু জানিনা বলতে চাও ? সমস্ত অর্থ যদি তোমরাই খাও, তাহ'লে দেশের উন্নতি হবে কি দিয়ে ?” বলেই ইশাকের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, “কেবল চুরি, বুঝলে ইশাক, একদল লোক আছে যারা চুরির অর্থের ওপরে ইমারৎ তৈরী করে। ওরাই হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু। এবারে ওদের ওপরেই নজর রাখতে হবে আমাকে।” কথার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মনস্থির ক'রে ফেলেছে এমনিভাবে বলে ওঠে সে, “ইশাক, তুমি এই ঠিকাদারের সঙ্গে থেকে সড়ক তৈরীর তদারক কর।”

হুকুমের অন্তর্নিহিত অর্থটি ঠিকই ধরতে পারে ইশাক। কিন্তু হুকুম হুকুমই। মানতেই হবে তা। তাই ‘আচ্ছা’ বলে সঙ্গে সঙ্গেই মেনে নেয় সে আদেশ, তারপর বলে, “তাহ'লে চুণারে একটা খবর—”

“সে আমি দেখব। আচ্ছা, তোমরা তাহ'লে কাজ আরম্ভ করে

দাও।" বলে সকলকে বিদায় দেয় শের শাহ্।

একে একে সবাই তসলিম জানিয়ে বিদায় নেয়। ঘরের ভেতরে একা শের শাহ্ নিশ্চুপ বসে থাকে। মাথার ভেতরে মালিকার চিন্তা। অতিক্রান্ত যৌবনে আওরৎ এখন আর আগুন ধরায় না রক্তে। ভাল লাগে তাদের সেবাটুকু। কিন্তু মালিকার কাছ থেকে সেই সেবা পাওয়ার সৌভাগ্য তার খুব কমই হ'য়েছে। কি খেয়াল তার, চুণারগড় ছেড়ে থাকতে চায় না। জোর করতে গেলে কেঁদে ফেলে। শের শাহ্র নিজেরও কেমন একটা দুর্বলতা আছে তার প্রতি। জোর করতে চায় না মন। সমতলভূমি থেকে এতটা উঁচুতে উঠে আসবার প্রথম ধাপটি যে সেই সৃষ্টি করে দিয়েছিল। ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ বাঁকা পথ ধরে চিন্তা। তাই বা কেন হবে? বেগম যখন :তখন বেগমের মতই থাকতে হবে। তাদের আবার স্ব-ইচ্ছা কি? স্বাধীনতা যতটুকু পেয়েছে তাই যথেষ্ট। আর নয়। এবার থেকে তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে হবে মালিকাকে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। তখুনি আবার ইশাককে ডেকে পাঠায় শের শাহ্। ইতিমধ্যে যথাযথ আদেশ দিয়ে একটি পত্রও লিখে রাখে। ইশাক আসতেই তাকে আদেশ-পত্র দিয়ে বলে, "চুণারে যাও। দবীর খাঁর বিবি সেখানেই থাকবে। কোন রকম অত্যাচার যেন না হয়। আর মালিকা বেগমকে এখানে নিয়ে আসবে। যাও।"

বলবার কিছু নেই ইশাকের। হুকুমের নোকর, হুকুম তামিল করাই তার কাজ।

১৫৪৩ খৃষ্টাব্দের সেই যুদ্ধকে বিশেষ ভাবেই উপভোগ করেছিল মালিকা। কিন্তু সেও শেষাংশে গিয়ে। প্রথম দিকে হতাশই হ'য়ে

গিয়েছিল সে যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে। মুহূর্তে মুহূর্তে খবর নিয়েছিল। কিন্তু কেউ-ই আশাপ্রদ কোন খবর দিতে পারেনি। পুরাণমলের দিক থেকে আসছে না কোন সাড়া, তেমনি আফগান ফৌজও নিঃশব্দে অপেক্ষা করে চলেছে। যুদ্ধ নয়, এ যেন এক নীরব ধৈর্য পরীক্ষা করা হচ্ছে শুধু। এদিকে ক্রমেই অধৈর্য্য হ'য়ে উঠছে শের শাহ্। এমন বিপাকের সম্মুখীন সে হয়নি কখনও। যতদিন যাচ্ছে ততই রসদে টান ধরছে। সিপাহ্‌দের দৈনিক বরাদ্দ দিতে হ'য়েছে কমিয়ে। এইভাবে যদি আর কিছুদিন চলে তাহ'লে ফেরুপালের মতই পালিয়ে যেতে হবে তাকে। দরবারে বসতে পারে না শের শাহ্। ছট্‌ফট্ ক'রে উঠে আসে। বিশ্রাম কক্ষ পেরিয়ে সোজা চলে আসে মালিকার কাছে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বাদশাহ্‌কে আহ্বান জানায় মালিকা। বেশ কোমল সুরে জিজ্ঞাসা করে, "এবার আমরা জয়ের নিশান উড়িয়ে যেতে পারবত' ?"

"বোধ হয় না।" গম্ভীর ভাবে উত্তর দেয় শের শাহ্।

"কেন ? ওপক্ষ কি এখনও চুপ করে রয়েছে ? তাহ'লে কথা বলাতে হবে ওদের দিয়ে।" জোর দিয়ে বলে মালিকা।

"সেই কথাই ভাবছি। শেষ পর্যন্ত অন্ততঃ এবারের মত পুরাণ-মলের সঙ্গে সন্ধি করে রাইসিন থেকে বিদায় নিতে হবে আমাকে।"

"কি সর্ত করবেন ?"

"দেখি কি করা যায়।" বলে উঠে গিয়েছিল শের শাহ্।

আর তার পরদিনই কোরাণ স্পর্শ করে পুরাণমলের প্রতিভূর সামনে প্রতিজ্ঞা করে শের শাহ্ যে রাজপুত-প্রধান, তার অনুগামী দল এবং তাদের সংসারের পক্ষে অপমানজনক কিছুই করা হবেনা।

এতবড় একরারের পর শের শাহ্‌কে সম্পূর্ণভাবেই বিশ্বাস করেছিল পুরাণমল। স-সংসার অনুগামী এবং সৈন্যদের নিয়ে

বাদশাহের শিবিরের সামনেই শিবির স্থাপন করেছিল। নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে। কেবলমাত্র ব্রহ্মচারী কোন দাম দিতে পারেননি এই শপথের। বারবার করে পুরাণমলকে নিষেধ করেছিলেন দুর্গ ছেড়ে যেতে। বলেছিলেন, "এ সন্ধি নয়, এ শাঠ্য। এ প্রতিজ্ঞায় ভুললে সর্বনাশ হ'য়ে যাবে।"

শুনে অসন্তুষ্টই হ'য়েছিল পুরাণমল। ব্রহ্মচারী নিঃস্বার্থভাবে তাকে অনেক সাহায্য করেছেন সন্দেহ নেই কিন্তু এই রাজকীয় ব্যাপারে কোনও উপদেশ তার সহ্য হয় না। তাছাড়া কোরাণ স্পর্শ ক'রে অতবড় শপথ করাকে অবিশ্বাস করলে শের শাহ্‌কে আরও অসন্তুষ্ট করা হবে। ফল হয়ত' হিতে বিপরীত হ'য়ে দাঁড়াবে। তাই ব্রহ্মচারীর কোন কথাই শোনেনি রাইশিনরাজ।

আর অসন্তুষ্ট হ'য়েছিল মালিকা বেগম। কি প্রয়োজন ছিল অমন একটা একরার করবার? একদিনের আক্রমণে যারা ধুলো-মুঠির মত উড়ে যাবে তাদের কাছে আবার একরার কিসের? এত' শুধু উঁচু মাথাকে স্ব-ইচ্ছায় হেঁট করা।

বাদশাহের সঙ্গে দেখা হ'তে সেই কথাই সে বলেছিল। আরও বলেছিল, "যে শপথ নেওয়া উচিত নয় সে শপথ রাখার কোনও বাধ্যবাধকতাও নেই। আপনি অনায়াসে পুরাণমলকে আক্রমণ করতে পারেন। এতে বাদশাহের এতটুকুও বদনাম হবে না।"

কথা নয়, শের শাহের গোপন ইচ্ছায় যেন ইন্ধনই জুগিয়েছিল মালিকা। যে কাজ সে করতে চায় তারই এক প্রশ্রয়-বাণী।

তবুও কাজীদের ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল শের শাহ্‌। সেখান থেকেও ঐ একই উত্তর আসাতে আর অপেক্ষা করেনি সে। গোপন নির্দেশ তার পৌঁছে গিয়েছিল যথাস্থানে।

হাতী তৈরী। আফগান ফৌজ মধ্যরাত্রেই ঘিরে ফেলেছে সুষুপ্ত রাজপুতদের শিবির। অধীর আগ্রহে মালিকারও ঘুম আসছে না

চোখে। কখন ফজর হবে আর রাজপুতদের মরণ চীৎকার ভেসে আসবে তার কানে, তারই জন্যে সে উন্মুখ হ'য়ে রয়েছে। অপেক্ষার রাত্রি বড় দীর্ঘ মনে হয় তার কাছে।

কিন্তু কোন রাত্রিই অসীম নয়। মালিকার অধীর অপেক্ষার রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে পুরাণমলের অপার নিশ্চিন্ততার রাতও শেষ হয়। ভোরের পাখীর ডাকের সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায় তার। নিশ্চিন্ত মনে শিবিরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েই চমকে ওঠে সে। আবার অবরোধ! এই মুক্ত এলাকায়! মনে পড়ে ব্রহ্মচারীর কথা—এ সন্ধি নয়, এ শাঠ্য। ছুটে শিবিরের ভেতরে এসে প্রবেশ করে পুরাণমল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিবির মধ্যস্থ সব কয়টি প্রাণীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে। উন্মত্ত সে চোখের দৃষ্টি। কেউ ঘুম ভেঙ্গে উঠেছে, কেউ ওঠেনি। ঘুম ভাঙা চোখে পুরাণমলের দিকে তাকিয়েই আতঙ্কে কেঁপে ওঠে তারা। পুরাণমলও আর তিলবিলম্ব না করে টেনে নেয় তার তরোয়াল। ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপরে। রাজপুত প্রাণ দেয়, কিন্তু মান দেয় না—সেই কথাই আবার নতুন করে সপ্রমাণ করে চলে সে। তার এক একটি আঘাতে শেষ হ'য়ে যেতে থাকে এক একটি রমণী। কি জাগ্রত, কি ঘুমন্ত, নারী বলতে যখন তার একজনও জীবিত থাকে না তখন বাইরে এসে দাঁড়ায় পুরাণমল। প্রধানদের ডেকে বলে তাদের পরিবারের সকলকে নিরাপদ স্থানে রেখে ফিরে আসতে।

যায়নি তারা। পাঠিয়েছিল ব্রহ্মচারীকে। নিজেদের পরিবার-বর্গের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে সেই ব্যূহ ভেদ করে যেতে সাহায্য করেছিল। তবুও সমস্ত নারী ও শিশুকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে ব্রহ্মচারী সক্ষম হননি। মাত্র কয়েকজনকে নিয়ে তিনি ব্যূহ ভেদ করে যেতেই শের শাহ্‌র হুকুম এসেছিল পুরাণমলের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

সেই বেইমানী লড়াইএর খবর রাখে মালিকা। কিছু শুনেছে, কিছু বা নিজেও প্রত্যক্ষ করেছে। আর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে বাদশাহ্‌কে সাদর সম্ভাষণ জানাবার জন্যে। আজ তার বড় আনন্দের দিন। যেখানেই থাকুক দবীর সেখানে থেকেই জানুক মালিকার আসন আর এক ধাপ উঁচুতে উঠল।

বিরাট দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চলতে থাকেন ব্রহ্মচারী। ঝড়ের দাপটে দুমড়ে ভেঙে পড়া গাছের মত তাঁর মনটিও ভেঙে পড়েছে। বার বার নিষেধ করেছিলেন তিনি পুরাণমলকে। বলেছিলেন, "আর কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরে থাকুন। খবর পেয়েছি, রসদের ঘাটতি পড়েছে আফগান ফৌজের। অসন্তুষ্ট সিপাহ্‌। আর কয়েকদিনের ভেতরেই ওদের অনাহার সুরু হবে। ঠিক সেই সময় আক্রমণ করে সমূলে ধ্বংস করতে হবে শের শাহ্‌কে।" তবুও পুরাণমাল বিশ্বাস করে ফেলেছিল শের শাহের কোরাণ শরিফ স্পর্শ করে উচ্চারণ করা একরারকে। আর সেই একটি প্রবঞ্চনার মাধ্যমেই নিজের জয় টেনে আনল আফগান-প্রধান।

পাহাড়ী বন্ধুর রাস্তা ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে চলতে থাকে দলটি। খাদ্য নেই, পানীয় নেই। শিশুরা কাঁদতে থাকে। স্বামীকে মৃত্যুর মুখে রেখে আসা স্ত্রীলোকদের শিশুর কান্নায় সাড়া দেবার মত মনের অবস্থাও নেই। যেতে হবে, তাই যান্ত্রিক ভাবে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে তারা।

বহুপথ পাড়ি দিয়ে শেষে একসময়ে নর্মদার তীরে এসে দাঁড়ায় তারা। এই পবিত্র নর্মদাই আজ তাদের প্রাণদাত্রী। শুধু শীতল পানীয় দিয়েই নয়, এর ওপারে যেতে পারলেই আফগান ফৌজের কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবে তারা।

নর্মদার অপর পারে যখন এসে পৌঁছয় সকলে তখন আবার সূর্য উঠেছে। রাত কেটেছে তাদের ওপারে, তীরে শুয়ে। ভোর হ'তেই তরিত্রের আশ্রয় নিয়ে এপারে এসে উঠেছে। এবারে গ্রাম্য পথ ধরেন ব্রহ্মচারী। আহার্য চেয়ে নেন দেহাতী মানুষের কাছ থেকে। কিন্তু দাঁড়াবার সময় নেই। খেতে খেতেই পথ চলে সকলে।

এই একইভাবে পথ চলার ভিতর দিয়ে আরও দুটি দিন পার করে দিয়ে তবে গড়মণ্ডলে এসে পৌঁছান ব্রহ্মচারী। শুনেছেন রেওয়ার রাজা বীরভন বাঘেলারই এক আত্মীয় এই গড়মণ্ডলের রাজা। তাঁরই আশ্রয়ে ভাগ্য বিড়ম্বিত এই ক্ষুদ্র দলটিকে রেখে দিয়ে আবার পথে নামেন ব্রহ্মচারী। দৃষ্টি তাঁর রেওয়ার দিকে।

মালিকার কি ভুল হ'য়ে যাচ্ছে সব? বুকের ভেতরে কে যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে। নকীব কি? ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছে? তাড়াতাড়ি বাঁদীকে ডেকে বলে, "দেখত' কে যেন কাঁদছে।"

"আজ্ঞে না, কেউ কাঁদছে না," উত্তর দেয় বাঁদী, "লড়াইএর ওখানে অত কান্না শুনে এসেছেনত' তাই সব সময় মনে হচ্ছে কে যেন কাঁদছে।"

"তা হবে।" বলে গির্দা হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকে মালিকা। বন্ধ চোখের পর্দার ওপরে ভেসে ওঠে পুরাণমল আর মলদেও রাঠোরের পতনের দৃশ্য। কখন পাশাপাশি, কখন একটার পর একটা। শের শাহের হুকুম অমান্য করে হুমায়ুনকে সাহায্য করতে সাহসী হননি মলদেও। কিন্তু তাঁর আতিথেয়তা হুমায়ুনকে বন্দী করে শের শাহের হাতে সমর্পণ করতেও দেয়নি। হুমায়ুন যোধপুর থেকে প্রায় দু'দিনের পথ দূরে ফালোদি পৌঁছুতেই

অতিথিবৎসল মলদেও কিছু ফল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাকে। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেননি। হুমায়ুন বুঝতে পেরেছিল এর অন্তর্নিহিত কারণটি। তাই আর সোজা না এগিয়ে সিন্ধ্-এর দিকে চলে গিয়েছিল।

তবুও মলদেও শের শাহের ক্রোধ থেকে নিষ্কৃতি পাননি। আজমীর থেকে প্রায় একদিনের পথ দক্ষিণ পশ্চিমে সুমেল গ্রামে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল দুই বিরাট বাহিনী। মাস কেটে যায়। আবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন শের শাহ্। এই বিরাট ফৌজ আর ৮০,০০০ হাজার ঘোড়ার খাদ্যের ব্যবস্থা করতেই তার প্রাণান্ত। এমন বিরাট বাহিনী নিয়ে সংগ্রাম করতে আসা শের শাহের জীবনে এই প্রথম। মালিকা অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকে সপ্ততিতম বয়সের এই বৃদ্ধ মানুষটির দিকে। যুদ্ধজয়ের কি প্রবল আকাঙ্খা! ক্লান্তিহীন ছেদ-হীন কর্মব্যস্ততার মাঝ দিয়েই কেটে যায় তার দিন। শিবিরে বসেই যুদ্ধ এবং রাজ্য পরিচালনার কাজ সারা হ'য়ে যায়। দেখে দেখে নিজেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে মালিকা। চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে।

এমনিই চোখ বন্ধ করে পড়েছিল সেদিন। বোধহয় এই মরু-ভূমির দেশ থেকে ফিরে যাওয়ার কথাই ভাবছিল। কয়েকদিন পূর্বেই বলেছিল শের শাহ, "এবার বোধহয় সত্যিই আমাকে সন্ধি করেই ফিরে যেতে হবে।"

"কেন?" সাশ্চর্যে জিজ্ঞাসা করেছিল মালিকা।

"খাদ্য আর পানীয়ের অভাবে ঘোড়াগুলো পাগলের মত হ'য়ে উঠেছে।"

"তাহ'লে সন্ধিই করুন। লোকে বলুক যে সামান্য একজন রাজপুত রাজাকে বশে আনবার ক্ষমতাও নেই বাদশাহের।" উত্তেজিত ভাবে বলে উঠেছিল মালিকা।

কথাটা শের শাহের গায়ে বড় বিঁধেছিল। চিন্তার অতলে

তলিয়ে গিয়েছিল সে। আর তার একটি কথায় অনেকখানি কাজ হয়েছে দেখে মনে মনে খুশি হয়েছিল মালিকা। জিজ্ঞাসা করেছিল, "কি ভাবছেন ?"

"একটা চিঠি লিখতে হবে," বলেই বেরিয়ে গিয়েছিল শের শাহ্।

তারপর আর যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেনি শের শাহ্। লক্ষ্য করেছে মালিকা কি যেন একটা বিশেষ খবরের জন্য অধীর আগ্রহে কাল কাটে বাদশাহের। কিন্তু নিজে থেকে কোনও কথা না বললে জানবার উপায় নেই। তাই চুপ করে থাকে সে। সেদিনও সেই কথাটি ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমন সময়ে শিবিরে শিবিরে ওঠে উল্লাসধ্বনি। চম্‌কে উঠে বসে মালিকা। কিসের উল্লাস ? বাঁদীকে ডাকতেই সে এসে দাঁড়ায়।

"কিসের এত উল্লাসরে ?" জিজ্ঞাসা করেছিল মালিকা।

"বাদশাহের একচালেই মলদেও রাজা কুপোকাৎ।" হেসে হেসে বলেছিল বাঁদী, "এইমাত্র শুনলাম সব। বাদশাহ্ মলদেও রাজার প্রধানদের নাম দিয়ে নিজেই নিজের নামে এক খত লিখেছিলেন যে প্রধানরা রাঠোর রাজাকে বন্দী করে বাদশাহের হাতে সমর্পণ করতে রাজী। তারপর সেই খৎকে একটা খারিতার (সিল্কের থলে) ভেতরে পুরে রাঠোর রাজার শিবিরের সামনে ফেলে আসবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপর যা হয় তাই। রাজা সেই খৎ পড়ে অবিশ্বাস করলেন তাঁর প্রধানদের। প্রধানরা সে খবর জানতে পেরে নিজেদের বার হাজার সিপাহ্ পৃথক করে নিয়ে আমাদের ফৌজ আক্রমণ করেছে।"

শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল মালিকা।

"কি বললি তুই ? বার হাজার সিপাহ্ আমাদের ফৌজ আক্রমণ করেছে ? বকরী তাড়া করেছে শেরকে, এ্যাঁ ?"

কিন্তু সে হাসি তার মুখে বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'তে পারেনি। সামান্য

সংখ্যক রাঠোর সৈন্যই যখন মত্ত মাতঙ্গের মত বাদশাহী ফৌজকে ছিন্নভিন্ন করতে করতে শের শাহের শিবিরের অত্যন্ত কাছে এসে পৌঁছেছিল, মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গিয়েছিল মালিকার। ঘনঘন চীৎকার উঠছে "হরহর মহাদেও" আর বাদশাহী ফৌজের আর্ত্তস্বর। ভয়ে কেঁপে উঠেছিল সে। উঠে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও নেই। আচ্ছন্নের মত পড়েছিল বিছানায়।

কতক্ষণ সে খেয়ালও নেই। বাঁদীর ডাকে সাড়া ফিরে আসে তার। চম্‌কে উঠে বসেই জিজ্ঞাসা করে, "কি হ'ল রে?"

"তা কি আর পারে? শেষ লোকটা পর্যন্ত খতম্‌। রাঠোর রাজা পালিয়েছে।"

"বলিস্‌ কি? সত্যি?" খুশীর আবেগে হাত থেকে একটা অলঙ্কার খুলে বাঁদীকে বখসিস করেছিল মালিকা।

কিন্তু শের শাহ্‌ আপন ক্ষতির কথা চিন্তা করে সখেদে বলেছিল, "সামান্য একমুঠো বাজরার জন্যে আমি আমার সাম্রাজ্য হারাতে বসেছিলাম।"

চোখ খুলে হঠাৎ টান টান হ'য়ে বসে মালিকা। সত্যিই তো, একমুঠো বাজরার জন্যে সেও যে হারাতে বসেছিল তার এই বাদশাহের বেগমপদ। দবীরকেই যদি পেত তাহ'লেত' তার অবস্থাও হ'ত ঐ আমিনার মত। প্রতিহিংসায় চোখদুটি জ্বলে ওঠে তার। দবীরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে কার অঙ্গে হাত তুলেছিল সে। সে শাস্তি যতদিন সে না পায় ততদিন পর্যন্ত বাদশাহের বেগম হ'য়েও সে একটি অতি সাধারণ আওরৎ। অতএব অপেক্ষায় থাকে সে কখন বাদশাহ্‌ পা দেবে তার কক্ষে।

যৌবন যখন টানেনা বার্দ্ধক্য তখন লোভ দেখায় বিশ্রামের।

তারই প্রয়োজনে মাঝে মাঝে মালিকার কক্ষে এসে বসে শের শাহ্। সেদিনও তেমনি সিকদার, ফতাদারের সঙ্গে কাজের কথাবার্তা বলে বিশ্রামের জন্যে উঠতে যাবে এমন সময় ডাক-চৌকির গাড়ি এসে থামে। ওঠা হয় না। একটু অপেক্ষা করে শের শাহ্। রাজ্যের খবর আগে নিতে হবে বৈকি। যে সব সংবাদ এসেছে এই ডাকে তার ভেতরে দুটি খবর দৃষ্টি আকর্ষণ করে শের শাহের। একটি রাজনৈতিক। রেওয়া আর কালিঞ্জরের দুই রাজা মিলিত হ'য়েছে। তারা আরও বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করেছে এবং তাদের বিশেষ ভাবে শিক্ষাদান করে চলেছে ব্রহ্মচারী নামে একজন প্রৌঢ়। দ্বিতীয় সংবাদটি দবীর সম্বন্ধে। সে নাকি দিনরাত চীৎকার করে চলেছে, "হয় আমাকে খতম কর, নয় ছেড়ে দাও। বিনা বিচারে এইভাবে বৎসরের পর বৎসর আটক ক'রে রাখা চলবে না।"

পত্রপাঠের শেষে ঠোঁটের কোনে একটুকরো হাসির রেখা ফুটে ওঠে শের শাহের। আটক রাখা না রাখা যেন দবীরের ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করে। ঠিক আছে, বিচারের ব্যবস্থাই করা হবে। কিন্তু তার আগে রেওয়া সম্বন্ধে একটা আদেশনামা লিখতে হয়। ঘরের পাশের শত্রুকে এভাবে বাড়তে দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। মুন্সীকে ডেকে আদেশ-পত্র রচনা করতে বলে। পত্ররচনা শেষ হ'লে তাতে সই করে দিয়ে উঠে পড়ে।

"এটা এখুনি রেওয়ার রাজা বীরভন বাঘেলার কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।"

আদেশ দিয়ে ধীরে ধীরে মালিকার মহলের দিকে যেতে থাকে শের শাহ। যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়, কে যেন তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার করছে। ফিরে দাঁড়ায় সে। একজন সিপাহ্‌কে ডাকে হাতের ইসারায়। ছুটে এসে কুর্নিশ করে সিপাহ্‌টি।

"কে চীৎকার করছে ?"

"আজ্ঞে জাঁহাপনা, ও দবীর খাঁর জরু।"

"চাৎকার করছে কেন ?"

"আজ্ঞে আটক করে রাখা হ'য়েছে তাই। আর—"

"আর কি ? বল্ উল্লু।" ধম্‌কে উঠে শের শাহ্।

থতমত খেয়ে হড়হড় করে বলে যায় সিপাহ্‌টি, "ওয়াহিদা ঐ আওরৎটির দেখভাল্ করে জনাব আর রোজ মারে। তাই চাৎকার করে।"

"তুই ঐ ওয়াহিদাকে নেকা করবি আর রোজ পিটাবি।"

"জী জাঁহাপনা।" আবার কুর্নিশ করে সিপাহ্‌টি।

শের শাহ্ চলে যায় মালিকার ঘরের দিকে। আর ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে সিপাহ্‌টি। ঘরে একটি জরু আছে তার। সে-ই ওকে ধরে ধরে পিটোয়। তার ওপরে যদি ওয়াহিদা ঘাড়ে চাপে তাহলে আর হাড় মাংস একসঙ্গে থাকবে না। কিন্তু বাদশাহের হুকুম, সে কেন, তার মরহুম হওয়া বাপেরও অবহেলা করবার ক্ষমতা নেই।

মালিকার কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করতে এগিয়ে এসে আহ্বান জানায় মালিকা। ছুটে গিয়ে দু'হাতে ভাল করে ঝেড়ে দেয় গদী।

"বসুন। আমি ফর্শী নিয়ে আসি।" বলে মালিকা।

"তুমি কেন ?"

"যেখানে আপনি আর আমি আছি, সেখানে বাঁদীই বা কেন ?" বহুদিন পরে আবার যেন লাস্যময়ী হ'য়ে উঠে মালিকা। বলে, "আপনার সেবা করবার সুযোগ খুব কমই মিলেছে আমার। আজ যখন মিলেছে তখন আমাকে বাধা দেবেন না।"

"বেশ।"

অনুমতি পেয়ে ছুটে গিয়ে তাম্রকূটের ব্যবস্থা করে মালিকা। ফর্শী এনে রাখে পালঙ্কের পাশে। নলটা ধরে দেয় হাতে। পা থেকে পয়জার খুলে নিয়ে রাখে।

"গির্দায় হেলান দিয়ে আরাম করে বসুন।"

তাই বসে শের শাহ্। তার বাম হাতখানি নিজের হাতে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে টিপে দিতে থাকে মালিকা। কোমল হাতের সেই স্পর্শ, একটি নধর অঙ্গের সেই সান্নিধ্য বৃদ্ধ বাদশাহের মনেও একটু একটু করে একটি ইচ্ছার জন্ম দিতে থাকে। ক্রমে স্পষ্ট আকার ধারণ করে ইচ্ছাটি। হাত বাড়িয়ে মালিকাকে নিজের কাছে টেনে নেয় শের শাহ্। বাধা দেয় না মালিকাও। নিজেকে এলিয়ে দেয় বাদশাহের দেহের ওপরে। চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে রক্ত-কণিকা। স্নায়ুতে স্নায়ুতে তার উত্তেজনা।

"একবার হেকিমকে ডাকতে হবে।" আপনমনেই যেন বিড়বিড় করে বলে শের শাহ্।

ফিক্ করে হেসে ফেলে মালিকা।

"হেকিম সাহেবত' চাঁদে চাঁদে আসছেই," বলে সে।

'তাহ'ক, আজ না হয় একটু বেনিয়মেই চলা হবে। বাঁদীকে বল ইমামবক্সকে একবার হেকিমের কাছে যেতে বলে আসুক।"

উঠে যায় মালিকা। অর্ধনিম্নস্বরে ওয়াহিদাকে ডাকতেই সে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বসে শের শাহ্। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার বাঁদীটিকে দেখে।

"দবীর খানের জরুকে মারিস কেন?"

"জী!" চম্‌কে উঠে ওয়াহিদা। মারে বটে সে, কিন্তু সে খবরত' এমহল পর্য্যন্ত পৌঁছয়নি কোনদিন। তাহ'লে? বাদশাহ্ কি নিজে শুনেছেন? মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে সে। ভয়ে

মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। কি শাস্তির আদেশ যে বেরুবে বাদশাহের মুখ থেকে, কে জানে।

"একটি সিপাহ্‌কে বলেছি তোকে নেকা করতে আর প্রত্যেকদিন ধরে ধরে মারতে। যা, নেকা করবি তাকে।"

য়্যাক্ বাবা, বাঁচা গেল। যৌবন যাচ্ছিল বাঁদীগিরি করে, এখন একটা মরদ তবু পাওয়া যাবে। তারপর ক কাকে মারে সে দেখা যাবে পরে। ভাবতে ভাবতেই তসলিম জা নিয়ে ইমামবক্সের কাছে ছোটে ওয়াহিদা।

বাঁদি চলে যেতেই মালিকার দিকে ফিরে বসে শের শাহ্‌। "বেকসুর একটা জেনানার ওপরে এরকম জুলুম করা উচিত হয়নি তোমার।"

"আমি তো মারতে বলিনি ওয়াহিদাকে। শুধু আটক রাখতে বলেছিলাম।" বলেই একটু তেজের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, "আব মারেই যদি, জাঁহাপনা কি আমার আঘাতের চাইতে এ আঘাতকে বেশী বলে মনে করেন?"

"তা করি না।" একটু গম্ভীর হয়ে উত্তর দেয় শেব শাহ্‌, "কিন্তু আমার বিচার হচ্ছে যে আঘাত করেছে তাকে শাস্তি দাও। তুমিত' জান আগ্রায় আমার ভাই-বেটা এক স্বর্ণকারের স্ত্রীর ওপরে অত্যাচার করেছিল বলে তাকেও আমি ক্ষমা কবিনি।"

"জানি জাঁহাপনা।"

"আমি রোটাসগড় থেকে দবীর খানকে এখানে পাঠিয়ে দিতে বলছি।"

"দবীর খাঁ রোটাসগড়ে?" সাশ্চর্যে জিজ্ঞাসা করে মালিকা। খবরটা নতুন তার কাছে।

"হ্যাঁ। তোমাকে জানাতে আমিই বারণ করেছিলাম।" একটু হেসে কথাটি বলেই আবার গম্ভীর হ'য়ে যায় শের শাহ্‌। বলে,

"তাকে যে শাস্তি তুমি দেবে তাই আমি মেনে নেব। কিন্তু ওর জরুর ওপরে কোন অত্যাচার করনা। আর ওর ছেলে, আম্মা, নাকি আছে আগ্রায়, সেখানেও একবার খবর নিয়ে আমাকে জানাবে কেমন আছে তারা।"

মাথাটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানায় মালিকা।

৷

কিন্তু সে খবর জানবার আব সুযোগ মেলে না শের শাহের। রেওয়ার রাজা বীরভন বাঘেলা বাদশাহের দরবারে উপস্থিত না হ'য়ে কালিঞ্জরের রাজা কিরাত সিংএর আশ্রয় নিয়েছে। এবং বাদশাহ্ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হওয়া সত্বেও কালিঞ্জর-রাজ তার আশ্রিতকে বাদশাহের হাতে সঁপে দিতে অস্বীকৃত হ'য়েছে। অতএব কিরাত সিংকে শিক্ষা দেবার জন্যে ১৫৪৪ এর নভেম্বরে বুন্দেলখণ্ড যাত্রা করতে হয় শের শাহ্কে।

যাত্রা করে। কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধও করে। কিন্তু জয় করা আর যায় না। ব্রহ্মচারী জানতেন ধৈর্যের প্রতিযোগিতায় যে হারবে তারই পতন এবং আরও জানতেন শের শাহের কূট-কৌশলকে। তাই রাজা বীরভন বাঘেলার সঙ্গে আরও বহু সৈন্য এবং বৎসরাধিক কালের মত রসদ এনে জমা করেছিলেন কালিঞ্জরে। এ ব্যবস্থায় হেসে ফেলেছিল কালিঞ্জর-রাজ। বলেছিল, "এতদিন ধরে যুদ্ধ চলে না।"

"চলবে।" দৃঢ়স্বরে বলেছিলেন ব্রহ্মচারী, "শের খাঁর জেদের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই তাই ওকথা বলছেন। আর একটা কথা, শের খাঁর কোন সন্ধি প্রস্তাবেই রাজী হবেন না দয়া করে।"

"ঠিকই বলেছেন উনি," ব্রহ্মচারীর কথা সমর্থন করে বীরভন বাঘেলা, "পুরাণমল ওর কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করাকে বিশ্বাস

করে শেষ হ'য়ে গেলেন। মলদেও রাঠোরের মত সিংহও ওর কূট-কৌশলে আজ পলাতক।"

অতএব ব্রহ্মচারীর উপদেশ মতই ব্যবস্থা করে কিরাত সিং।

আর সেই ব্যবস্থাপনার ফল হিসাবে নিজেকে দুর্গ-প্রাকারের বাইরে মাসের পর মাস বসিয়ে রাখে শের শাহ্।

কোন পক্ষই কোন প্রস্তাব পাঠায় না। নীরব, উত্তেজনাহীন দিনগুলি কেটে যেতে থাকে। একমাত্র শের শাহের বুকেই যেটুকু অস্থিরতা। দিল্লীর মসনদে সমাসীন বাদশাহ্কে কি আজ এই সামান্য দুর্গের পাষাণ প্রাকারে মাথা ঠুকে ফিরে যেতে হবে?

না। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায় শের শাহ্। শিবিরের বাইরে এসে দাঁড়ায়। ডাকে সিপাহ্শালারকে।

"এখানে একটা গম্বুজ তৈরী কর।" স্থান নির্দেশ করে দেয় শের শাহ্, "খুব উঁচু। যেন দুর্গের ভেতর পর্যন্ত দেখা যায়। ওপরে কামান বসান যায় এমন জায়গা রাখবে। আর এখান থেকে দুর্গ পর্যন্ত গর্ত্ত খুঁড়ে গলিপথ তৈরী কর। এক মানুষ সমান গর্ত্ত। মাথার ওপরটা ঢাকা থাকবে। যাকে সাবিত্ বলে। বুঝতে পেরেছ?"

"জী জাঁহাপনা।" উত্তর দিয়েই কাজে লেগে যায় সিপাহ্-শালার।

একদিকে গম্বুজ আর একদিকে সাবিত্। কাজ করে চলেছে মিস্ত্রী, মজুরদার, সিপাহ্।

দুর্গের ওপর থেকে লক্ষ্য করেন ব্রহ্মচারী। সঙ্গে রাজা কিরাত সিং ও বীরভন বাঘেলা।

"ঐ গম্বুজই আমাদের সর্বনাশ করবে। ওর ওপর থেকে কামান দাগলে দুর্গের ভেতরে বসেই শেষ হ'তে হবে আমাদের।" শুকিয়ে

যাওয়া গলায় কোন রকমে বলে বীরভন বাঘেলা।

"তাই ভাবছি।" চিন্তিতভাবে বলেন ব্রহ্মচারী, "দুর্গ থেকে লুকিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার একটি মাত্র রাস্তা আছে।"

"কোথায়? কোন রাস্তাই তো নেই।" বলে কিরাত সিং।

"আছে। ময়লা জল বেরিয়ে যাওয়ার একটি নর্দমা আছে। একজনের বেশী একবারে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে পারে না। সেখানেও আমি পাহারা রেখেছি।"

"কি হবে সে রাস্তা দিয়ে?"

"প্রয়োজনবোধে কাজে লাগাতে হবে। আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট নর্দমা তৈরী করতে বলুন। সেইপথেই ময়লা জল বেরিয়ে যাবে।"

"তারপর?"

"তারপর ওদের কাজের ওপর নির্ভর করছে।"

উত্তর দিয়ে সেখান থেকে সরে যান ব্রহ্মচারী। মুখের ওপরে একাধারে চিন্তা এবং প্রতিজ্ঞার ছাপ।

২১শে মে, ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দের রাত। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিঃশব্দে নর্দমা গলিয়ে বেরিয়ে আসেন ব্রহ্মচারী। একবার চারিদিক তাকিয়ে দেখেন। মশাল জ্বালিয়ে গম্বুজের ওপরে কামান তুলছে সিপাহ্‌রা। অদূরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ শের শাহ্‌। মশালের আলোয় তার শ্বেত শ্মশ্রু-গুম্ফমণ্ডিত মুখখানি দেখা যায়। সিপাহ্‌দের শিবির পাহারা দিয়ে চলেছে রাতের প্রহরী। ঘুরে যান ব্রহ্মচারী। যেদিকে গম্বুজ তৈরী হ'য়েছে তার বিপরীত দিকে। একটুখানি এগিয়ে যান। সামান্য শব্দ ক'রে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন একজন সিপাহের। থমকে দাঁড়ায় সিপাহ্‌টি। তারপরই উন্মুক্ত কৃপাণ

হাতে ছুটে আসে ব্রহ্মচারীর দিকে। তিনিও তাই চাইছিলেন অপেক্ষা করেন। কাছে আসতে দেন সিপাহ্‌টিকে। তারপর ছুটতে থাকেন নর্দমার দিকে। নর্দমার মুখের কাছে এসে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ান ব্রহ্মচারী। হাতের তরোয়ালটিকে শুধু দৃঢ়ভাবে এগিয়ে ধরেন। এমনটা যে হবে ভাবতে পারেনি সিপাহ্‌টি। ঝোঁক সামলাতে না পেরে সবেগে এসে পড়ে ব্রহ্মচারীর তরোয়ালের মুখে। গপ্‌ ক'রে একটা শব্দ বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে। তাবপর আছড়ে পড়ে মাটির বুকে।

প্রথম কিস্তি শেষ ক'রেই দ্বিতীয় কাজে হাত দেন ব্রহ্মচারী। অতি দ্রুত দু'জনের পোষাক বদল ক'রে নেন। রক্তের ক্ষার গন্ধ এসে লাগে নাকে। ভিজে সপ্‌ সপ্‌ করছে। তা করুক। মৃত্যুর জন্যে যে প্রস্তুত তার কাছে শুক্‌নো আর ভিজে সব সমান। গাল-পাট্টা বেঁধে নিয়ে তরোয়াল বদল ক'রে নেন। তারপর মৃতদেহের গায়ে চড়ান নিজের কামিজের ভেতর থেকে বের করে নেন চক্‌মকি দুটো। সে দুটিকে মাজায় বাঁধা পট্টির ভেতরে লুকিয়ে বেখে এগিয়ে যেতে থাকেন আফগান শিবিরের দিকে।

"কোথায় গিয়েছিলি ?" জিজ্ঞাসা করে একটি প্রহরী।

"একটা দুষমণ, কি ক'রে বেরিয়ে এসেছিল দুর্গ থেকে। খতম্‌ ক'রে দিয়ে এলাম। ঐত' পড়ে রয়েছে ওখানে।" উত্তর দেন ব্রহ্মচারী।

ক্রমে এগিয়ে যান তিনি। গম্বুজের দিকে। তারপর এক সময়ে গিয়ে ভিড়ে যান কালিঞ্জরের ধ্বংসের প্রস্তুতির কাজে রত সিপাহ্‌দের মধ্যে।

ভোর তখনও হয়নি। গম্বুজের ওপরে উঠে এসেছে শের শাহ্‌। কামানের ভেতরে গোলা পুরে বারুদ ঠেসে দেওয়া হ'য়েছে। আরও গোলা, আরও বারুদ নিয়ে এসে রাখছে সিপাহ্‌রা। ব্রহ্মচারীও

আনছেন তাদের সঙ্গে। গম্বুজের নীচেও স্তূপীকৃত বিস্ফোরক।

দুম্। বিরাট একটি ঝাঁকি খায় গম্বুজটি। গোলা নিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে থম্‌কে দাঁড়িয়ে যান ব্রহ্মচারী। চোখ দুটি মুহূর্তের জন্যে জ্বলে ওঠে। তারপরই আবার মুখের ওপরে এক নির্বিকার ভাব টেনে এনে ওপরে উঠতে থাকেন।

"দুর্গের ভেতরে পড়েনি। কামানের মুখ ঠিক কর," আদেশ দেয় শের শাহ্।

গোলাটি যথাস্থানে রেখে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন ব্রহ্মচারী।

কামানের মুখ ঠিক করে আবার পোরা হয় গোলা। বারুদ ঠাসা হয়। একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে মশাল দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বারুদ। দুম্। আবার ছুটে যায় একটি গোলা। পড়ে দুর্গের অভ্যন্তরে।

হা হা। হেসে ওঠে শের শাহ্। আর মুচড়ে ওঠে ব্রহ্মচারীর বুকখানি। ঠায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন তাঁরই চোখের সামনে ঘটছে কালিঞ্জরের ধ্বংস-সাধন।

আরও কয়েকটি গোলা ছুটে গেল। দুর্গের ভেতর থেকে চীৎকার শোনা যায়। ধৈর্য বুঝি আর থাকে না ব্রহ্মচারীর। কিন্তু এতগুলি চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে কিছু করবারও উপায় নেই। অন্তরের জ্বালায় নিজেই পুড়তে থাকেন। এমন সময় একটি গোলা দুর্গের গায়ে লেগে ছিটকে এসে পড়ে গম্বুজের নীচে রাখা বারুদের স্তূপে। বিরাট এক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে ওঠে গম্বুজটি। 'কি হল, কি হল' রব। সবাই অন্যমনস্ক। ঠিক সেই সময়ে ঠুক্ ক'রে একটি শব্দ হতেই চম্‌কে ফিরে তাকায় শের শাহ্। কিন্তু সাবধান হওয়ার আর সময় নেই তখন। বিরাট বিস্ফোরণের সঙ্গে ব্রহ্মচারীর ছিন্নভিন্ন দেহ কোথায় ছিট্‌কে যায়। যারা ছিল কাছে তারা সকলেই দগ্ধ। একপাশে পড়ে কাতরাতে থাকে শের শাহ্। ছুটে ওপরে আসে

কয়েকজন সিপাহ্। ধরাধরি করে তাকে নিচে নামিয়ে নিয়ে যায়। দেহের স্থানে স্থানে হাড দেখা যাচ্ছে। ঝলসান মুখখানি বীভৎস হয়েছে দেখতে। তবুও কালিঞ্জরের খবরের জন্যে উন্মুখ সে। বারে বারেই জিজ্ঞাসা কবতে থাকে—"এখনও পতন হল না কালিঞ্জরের?"

অবশেষে ২২শে মে ১৫৪৫এর অপরাহ্ণ বেলায় এল সেই শুভ সংবাদ। পতন হয়েছে কালিঞ্জরের।

এতক্ষণে হাসি ফুটে উঠল শের শাহের মুখে। তারপরই ধীরে ধীরে সেই মুখের ওপরে নেমে এল মৃত্যুর ছায়া।

খবর শুনে কেমন নিঝুম হ'য়ে যায় মালিকা। কয়েকটি দিন কোন কথাই বলেনি সে। রোটাসগড় থেকে দবীরকে আনা হয়েছিল তার প্রাপ্য শাস্তি দেবার জন্যে। শুধু অপেক্ষায় ছিল মালিকা যে বাদশাহ্ কালিঞ্জর জয় করে ফিরে এলে বসবে সেই বিচার সভা। কিন্তু কিছুই হ'লনা। জিন্দ্গীর সাধ আহ্লাদ তাব কালিঞ্জরের বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল।

ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে বসে আমিনা। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। একবার মুখ তুলে তাকায় মালিকা। তারপরই আবার মুখ নামিয়ে নেয়।

"উঠুন। স্নান করে নিন, শরীরটা অনেক সুস্থ মনে হবে।" বলে আমিনা।

তবুও কোন কথা বলে না মালিকা। কি যেন ভাবে। গভীর সে চিন্তা। আত্মসমাহিত ভাব। নিজের অন্তরকেই বুঝি বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করে চলেছে।

"কৈ উঠুন," তাগাদা দেয় আমিনা, "চলুন, আমি স্নান কবিয়ে

দিচ্ছি।”

আবার একবার আমিনার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে মালিকা। কৃশ। প্রথম যখন ওকে ধরে নিয়ে এসেছিল ইশাক তার চাইতে অনেক কৃশ হ'য়ে গিয়েছে। আর তার জন্যে মালিকাই দায়ী। হঠাৎ আমিনাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খায় মালিকা।

“তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছি, না? এবার সুখ দেব।”

“সে হবে। আপনি আগে উঠুন। শরীর সুস্থ হ'লে তারপর যা করবার করবেন।” বলে আমিনা।

“না। আগে কাজ।” দৃঢ়স্বরে বলে ওঠে মালিকা, “আমি বাদশাহের কাছে তাই শিখেছি যে।” বলেই বাঁদীকে ডেকে মুন্সীকে খবর দিতে বলে।

একটু পরেই এসে দাঁড়ায় মুন্সী।

“দবীরকে আমার কাছে আনতে বল। আর তুমি কাগজ কলম নিয়ে এস। আদেশ আছে।”

চলে যায় মুন্সী। একটু পরেই একজন সিপাহের সঙ্গে এসে দাঁড়ায় দবীর। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মালিকা। সেই নিম্ন-দৃষ্টি। শরীর বলতে একটি হাড়ের কাঠামোর ওপর চামড়া জড়ান শুধু। তবুও মুখের চেহারায় সেই দৃপ্তভাব। এগিয়ে যায় মালিকা। সিপাহ্‌কে বিদায় দিয়ে দবীরের হাত ধরে ঘরে নিয়ে আসে।

“বস দবীর।”

তবুও বসেনা দবীর। দাঁড়িয়েই থাকে।

“এইত' আমার শেষ অনুরোধ, এটুকুও রাখবে না?” কাতর দুটি চোখে দবীরের মুখের দিকে তাকায় মালিকা।

এবারে আর অমান্য করতে পারে না দবীর। বসে।

“বস আমিনা।”

বসতে গিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে আমিনা।

"ছিঃ, কাঁদে না। স্নেহের সুরে ধমক দেয় মালিকা, "আজ যে আমার বড় আনন্দের দিন। তোমাদের দু'জনকে মিলিয়ে দিতে পেরেছি, একি কম কথা? কৈ, মুন্সী এল না এখনও?"

"জী, এসেছি মালিকান।" দরজার কাছ থেকে বলে ওঠে মুন্সী।

"হ্যাঁ, লেখ। দরজা ছেড়ে ভেতরে এসে বসে লেখ।"

ভেতরে আসে মুন্সী। লিখতে বসে। আদেশ দিয়ে যেতে থাকে মালিকা। সে আদেশের প্রতিটি কথা যেন তার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। অবাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দবীর ও আমিনা। একি আদেশ, না দলিল? চুণার ও মির্জাপুরেব বর্তমান মালিকান মালিকা বেগমের ইন্তেকালের পরে সেই জায়গীর দুইটি পাবে তাজ খাঁর ছেলে দবীর খাঁ। আর মালিকার গহনা ইত্যাদি যত অস্থাবর সম্পত্তি আছে তাও পাবে দবীর।

"না।" উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায় দবীর।

"বস।" দৃপ্তস্বরে বলে ওঠে মালিকা, "ভুলে যেও না বাদশাহ্‌র পরে এখনও নতুন বাদশাহ্‌ কেউ হয়নি। এখনও আমি মালিকা বেগম।" তারপরই কোমল হয়ে আসে তার কণ্ঠস্বর, "হয়ত' এই চুণারগড় তোমার থাকবে না। কিন্তু নতুন করে আবার জীবনকে গড়ে নেবার সুযোগ পাবে তুমি। দাও, কাগজ দাও।"

মুন্সীর কাছ থেকে আদেশ পত্রটি চেয়ে নিয়ে তার ওপরে নিজের হাতের ছাপ দিয়ে দেয় মালিকা। ইশাদী থাকে মুন্সী নিজে।

"যাও, ফতাদারকে দিয়েও একটা সই করিয়ে নিয়ে এস।"

দানপত্রখানি নিয়ে মুন্সী চলে যেতেই আমিনা বলে ওঠে, "আপনার?"

"কি বোকা মেয়ে!" হেসে ফেলে মালিকা, "আমার ইন্তেকাল

হ'লে তবে তো তোমরা পাবে ওসব। শুধু গহনাগুলো আমি এখুনি দিচ্ছি তোমাদের। ও সবতো আর পরে পাবে না। সাত শকুনে ছিনিয়ে নেবে।"

উঠে দাঁড়ায় মালিকা। পাশের ঘরে গিয়ে গহনার পেটরাটা এনে দবীরের সামনে এগিয়ে ধরে, "নাও।"

মালিকার মুখের দিকে একবাব তাকিয়েই মাথা নীচু ক'রে পেটবাটি ধরে দবীর।

"এবারে আমি নিশ্চিন্ত।" একটা টানা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মালিকা, "আমিই বোধহয় তোমাদের জিন্দ্‌গীর দুষ্টগ্রহ ছিলাম।"

একটু থামে সে। আবার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস তার বুকখানি খালি করে ঝরে পড়ে। বলে, "এবারে এস। মুন্সীর কাছ থেকে দানপত্রটা চেয়ে নিও। ভুলো না যেন।"

মুখের দিকে না চাইলেও মালিকার গলার স্বরে আর কাজের মাধ্যমেই তার অন্তরটিকে দেখতে পাচ্ছিল দবীর। উঠে দাঁড়িয়ে তাকে তসলিম জানায় সে। পা বাড়ায় ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে।

"আর শোন দবীর," পিছন থেকে বাধা দেয় মালিকা।

ঘুরে দাঁড়ায় দবীর।

"তোমার ছেলে, আম্মা আর সকলে আগ্রাতেই আছে। কষ্টে থাকলেও বেঁচে আছে।" বলে একটু থেমে যায় মালিকা। একদৃষ্টে দবীরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কি কথা যেন বলবার জন্যে কেঁপে ওঠে তার ঠোঁটদুটি। স্বর ফোটে না। গতিরোধ করে রেখেছে কান্নার আবেগ। বার দুই ব্যর্থ চেষ্টা করে সে। তারপর দ্রুত উঠে প্রকোষ্ঠান্তরে চলে যায়।

মালিকার সে না বলা কথাটি হয়ত' বুঝতে পেরেছিল দবীর। কিন্তু সে দিন যে এত শীঘ্রই আসবে তা ভাবতে পারেনি সে।

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে চিরে ফেড়ে তছনছ করে দেয় কার চীৎকার। চম্‌কে জেগে ওঠে চুণারগড়ের সমস্ত অধিবাসী। ছুটে যায় দুর্গের উত্তর দিকের প্রাচীরের ধারে। বুক চাপড়িয়ে কাঁদছে একজন বাঁদী। জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা সকলের। কিন্তু গুছিয়ে কোন কথাই বলতে পারে না সে। এলোমেলোভাবে কোন রকমে প্রকাশ করে—এই প্রাচীরের ওপরে উঠে দরিয়ায় ঝাঁপ দিয়েছে মালিকা বেগম। সে দূর থেকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে ধরতে গিয়েছিল, পারেনি। শুনে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে আমিনা। দবীরের বুক থেকে ঝরে পড়ে একটা টানা দীর্ঘশ্বাস। নিজের বুকের জ্বালা নেভাতে ঐ এক দরিয়া পানিই কি প্রয়োজন হ'ল মালিকার?